তারীখে ইসলাম

সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান

তারীখে ইসলাম

www.amarboi.org

তারীখে ইসলাম

(ইসলামের ইতিহাস)

হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মাদ
আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বারকাতী

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুজাম্মেল হক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২১৫

২য় প্রকাশ

শাবান	১৪৩২
আষাঢ়	১৪১৮
জুলাই	২০১১

বিনিময় ঃ ৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

TARIKHE ISLAM by Hajrat Maulana Mofti Sayyed Mohammad Amimul Ehsan Mojaddedi Barkati. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

অনুবাদকের কথা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর সর্বশেষ নবী। মানব সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত আল্লাহর নির্দেশের আলোকে একদল লোক তৈরী করে তাঁদের প্রচেষ্টায় একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। নিখাদ তাওহীদের ভিত্তিতে জনকল্যাণমূলক একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কর্মে তাঁকে নানা রকম প্রতিবন্ধক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ, তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল জাহেলী সমাজ তাঁর এ প্রচেষ্টার মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাবের অপমৃত্যুর কাল ছায়া দেখতে পেয়েছে। তারা সর্বপ্রযত্নে সৃষ্টি করেছে বাধার—এসেছে সংঘাত, হয়েছে যুদ্ধ। অবশেষে সত্য জয়লাভ করেছে। মিথ্যা অপসারিত হয়েছে। ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানব কল্যাণমূলক সুখী ও সুন্দর সমাজ তথা ইসলামী রাষ্ট্র।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর তাওহীদ ভিত্তিক এই সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন একের পর এক তাঁরই যোগ্যতম চার সাহাবা যথাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর ফারুক (রা), হযরত উসমান যিন নূরাইন (রা) এবং হযরত আলী (রা)। তাঁদের সম্মিলিত শাসনকাল ত্রিশ বছর। তাঁদের ত্রিশ বছরের এই শাসনকাল ইসলামের ইতিহাসে খিলাফতে রাশেদা বা সুপথপ্রাপ্ত খলিফাদের শাসন হিসেবে স্বীকৃত। এই যুগে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছিল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। কিন্তু ন্যায় ও সত্যের পাশাপাশি বাতিল চিরদিনই সক্রিয় ও তৎপর। সাবায়ীদের ইসলাম দুশমনী, কিছু মানুষের অপরিণামদর্শিতা ও বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠার মোহ খিলাফতে রাশেদার অনুপম সুশাসনকে ধ্বংস করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে খিলাফতে রাশেদার স্থান দখল করে রাজতন্ত্র তথা বনী উমাইয়াদের বংশীয় শাসন।

যেসব চড়াই উৎরাই ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে খিলাফতে রাশেদার স্থান রাজতন্ত্র দখল করে তারই বিস্তারিত ও বিশ্বস্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে সুবিজ্ঞ আলেমে দীন, বিদগ্ধ পন্ডিত ও মনীষী, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুফতী উপমহাদেশের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী ও বারাকাতির সুলিখিত এই ইতিহাস গ্রন্থে। গ্রন্থখানি ষাটের দশকে পূর্ব

www.amarboi.org

পাকিস্তানের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম শ্রেণীর পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে লিখিত হলেও এতে খিলাফতে রাশেদার ধ্বংস ও তদস্থলে উমাইয়া বংশীয় রাজতন্ত্র জেঁকে বসার—যার বিষময় ফল আজও মুসলিম বিশ্ব ভোগ করছে—যে ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে তা অধ্যয়ন করলে একজন মুসলমান খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে এবং বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজের কর্তব্যও স্থির করে নিতে পারবেন। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই গ্রন্থখানির অনুবাদে উৎসাহিত হয়েছি। এ উদ্দেশ্য কিছুটা ফলবতী হলেও আমার এ শ্রম সার্থক মনে করবো।

পরিশেষে আল্লাহর এক গোনাহগার বান্দা হিসেবে তাঁর মহান দরবারে ফরিয়াদ করছি তিনি যেন মূল লেখককে তাঁর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন এবং সেই সাথে এই নগণ্য অনুবাদকের ও তার প্রিয়জনদের নাজাতের ব্যবস্থা করেন। আমীন।

অনুবাদক
৬-৩-৯৫ ইং

www.amarboi.org

সূচীপত্র

খিলাফত	১৭
খিলাফতে রাশেদা	১৮
প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)	২০
ব্যক্তিগত জীবন	২০
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত	২৩
হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী	২৫
উসামার সেনাবাহিনী	২৫
যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	২৬
নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারদের উৎখাত	২৭
মুরতাদদের মূলোৎপাটন	২৮
কুরআন মজীদের সংকলন	২৮
বিজয়সমূহ	২৯
ইরাক	৩০
সিরিয়া (শাম)	৩১
অসুস্থতা ও মৃত্যুবরণ	৩৩
খিলাফত ব্যবস্থা	৩৪
অভ্যাস চরিত্র ও গুণাবলী	৩৯
দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারূক (রা)	৪১
ব্যক্তিগত জীবন	৪১
খিলাফতে ফারূকী	৪৫
হযরত উমরের (রা) বিজয়সমূহ	৪৫
সিরিয়া	৪৫
মিসর (আফ্রিকা)	৪৮
ইরাক ও ইরান	৪৯
শাহাদাত	৫০
হযরত উমরের (রা) খিলাফত ব্যবস্থা, কৃতিত্ব ও সংস্কার	৫৭
অভ্যাস, চরিত্র ও মর্যাদা	৬৪
তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান যিন নূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু	৬৯
ব্যক্তিগত জীবন	৭০
হযরত উসমানের (রা) খিলাফত	৭৩

www.amarboi.org

বিজয়সমূহ	৭৪
ইসলামে প্রথম ফিতনা ও হযরত উসমানের (রা) শাহাদাত	৭৫
খিলাফত ব্যবস্থা, কৃতিত্ব ও সংস্কার কার্যাবলী	৮৪
অভ্যাস, চরিত্র ও মর্যাদা	৮৭
চতুর্থ খলিফা হযরত আলী মুর্তাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু	৮৯
ব্যক্তিগত জীবন	৯০
হযরত আলীর (রা) খিলাফত	৯৫
গৃহযুদ্ধ	৯৭
জামাল যুদ্ধ	৯৮
সিফ্ফীনের যুদ্ধ	১০২
সালিশী	১০৯
সালিশী সিদ্ধান্তের সমালোচনা (টীকা-১)	১১২
খারেজী	১১৩
সাবায়ী (সংঘাত)	১১৬
বিজয়সমূহ	১১৭
শাহাদাত	১১৮
খিলাফত ব্যবস্থা, কৃতিত্ব ও সংস্কার	১২০
অভ্যাস, চরিত্র ও মর্যাদা	১২৪
খিলাফতে রাশেদার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	১২৭
খলিফা রাশেদার খিলাফত ব্যবস্থা (টীকা-১)	১২৭
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা (রা)	১৩৪
বনী উমাইয়া	১৩৭
বনী উমাইয়া শাসন	১৩৯
মুয়াবিয়া বংশের শাসন	১৪১
মারওয়ান বংশের শাসন	১৪২
বনী উমাইয়া শাসকদের তালিকা	১৪৫
আমীর মুয়াবিয়া (রা)	১৪৬
বক্তিগত জীবন	১৪৬
শাসনকাল	১৪৮
যিয়াদ ইবনে সুমাইয়া	১৪৯
হাজার ইবনে আদী (রা)-এর হত্যাকান্ড	১৫০
উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ	১৫২

www.amarboi.org

বিজয়সমূহ ১৫৩
ভাবী শাসক হিসেবে ইয়াযীদের অভিষেক ১৫৪
আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর ওফাত ১৫৬
মুয়াবিয়া (রা)-এর চরিত্র ১৫৭
সংস্কার ও কৃতিত্ব ১৫৯

ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা) ১৬২
কারবালার ঘটনা ও হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত ১৬৫
শাহাদাতের সকাল ১৬৮
সামরিক অভিযান ১৭৬
হাররার ঘটনা ও রাসূলের হারাম মদীনায় হত্যা ও লুটপাট ১৭৭
ইয়াযীদের মৃত্যু ১৭৯
ইয়াযীদের কুকীর্তি ১৮০
মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদ ১৮১
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) ১৮৪
মারওয়ান বংশের শাসন—মারওয়ান ইবনে হাকাম ১৮৬
আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ১৮৮
তাওয়াবীন ১৮৮
মুখতার সাকাফী ১৮৯
আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর শাহাদাত ১৯০
খারেজী ১৯২
আবদুর রহমান ইবনে আশ'আস ১৯২
বিজয়সমূহ ১৯৩
সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ১৯৩
আবদুল মালেকের মৃত্যু ১৯৩
আবদুল মালেকের সংস্কার ও চরিত্র ১৯৩
ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক ১৯৬
বিজয়সমূহ ১৯৬
মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম ও সিন্ধু বিজয় ১৯৬
কুতাইবা ও খুরাসানের বিজয়সমূহ ১৯৭
মাসলামা ও এশিয়া মাইনর ১৯৭
মূসা ইবনে নুসাইর, তারেক ও স্পেন বিজয় ১৯৭
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ১৯৯

www.amarboi.org

হাজ্জাজের মৃত্যু	১৯৯
ওয়ালীদের মৃত্যু	২০০
ওয়ালীদের কৃতিত্ব	২০১
সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক	**২০২**
বিজয়সমূহ	২০৩
পরবর্তী উত্তরাধিকারীর অনুকূলে বাই'আত	২০৩
সুলায়মানের ইনতিকাল	২০৪
সুলায়মানের চরিত্র	২০৪
উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)	**২০৫**
সংস্কার কাজসমূহ	২০৬
বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী	২১০
ওফাত	২১১
উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর চরিত্র ও মর্যাদা	২১২
আব্বাসীয় দাওয়াতের সূচনা	২১৪
ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেক	**২১৬**
বিজয়সমূহ	২১৭
বিদ্রোহ	২১৭
উত্তরাধিকারী নিয়োগ	২১৭
মৃত্যু	২১৮
আব্বাসীয় দাওয়াত	২১৮
হিশাম ইবনে আবদুল মালেক	**২১৯**
বিজয়সমূহ	২১৯
যায়েদ ইবনে যয়নুল আবেদীন ইবনে হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত	২২০
রাফেজীদের উদ্ভব	২২৩
আব্বাসীয় দাওয়াত	২২৩
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন	২২৪
হিশামের মৃত্যু	২২৪
হিশামের চরিত্র	২২৪
ওয়ালীদ (দ্বিতীয়) ইবনে ইয়াযীদ	**২২৬**
ইয়াহ্ইয়া ইবনে যায়েদের শাহাদাত	২২৬
ওয়ালীদের অবরুদ্ধ ও নিহত হওয়া	২২৭
ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদ	**২২৮**
বিদ্রোহ	২২৮

www.amarboi.org

আব্বাসীয় খিলাফতের আন্দোলন	২২৯
ওফাত	২২৯
ইবরাহীম ইবনে ওয়ালীদ	২৩০
ইবরাহীমের অপসারণ	২৩০
মৃত্যু	২৩০
সিরিয়ার বনী উমাইয়া সালতানাতের সর্বশেষ শাসক	
মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাওয়ান	২৩১
বিদ্রোহ	২৩১
আবু মুসলিম খুরাসানী ও আব্বাসীয় আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ	২৩২
সর্বশেষ যুদ্ধ এবং উমাইয়া শাসনের অবসান	২৩৩
বনী উমাইয়া শাসনের বৈশিষ্টসমূহ	২৩৪
বনী উমাইয়া শাসনের অবসান	২৩৬

www.amarboi.org

www.amarboi.org

নবুওয়াত সূর্যের দীপ্তিতে ভাস্বর খিলাফত ও রহমতের উজ্জ্বল তারকাসমূহ

সাইয়েদেনা সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক

১৩ই রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী থেকে ২২শে জমাদিউস সানী ১৩ হিজরী
জুন ৬৩২ খৃঃ থেকে ২৩শে আগষ্ট ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ

যিনি তাঁর উন্নত ও মহত কর্মতৎপরতা দ্বারা ইসলামী আদর্শের বুনিয়াদকে মজবুত করেছিলেন। তাঁর ঈমানী শক্তি "ইরতিদাদ" (ইসলাম ত্যাগ)-এর অভ্যন্তরীণ ফিতনা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলো।

সাইয়েদেনা ফারুকে আযম (রা)-এর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক

২২শে জমাদিউস সানী ১৩ হিজরী থেকে ২৬শে যুলহিজ্জা ২৩ হিজরী
২৪শে আগষ্ট ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ হতে ৩রা নভেম্বর ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ

তিনি তাঁর মহত কর্মশক্তি দ্বারা ইসলামী আদর্শকে মজবুত ও পূর্ণতা দান করেছিলেন। তাঁর সত্যিকার সংকল্প ইসলামের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে শতধা বিভক্তি থেকে রক্ষা করে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো। অথচ সেই সময় একদিকে রোম এবং অন্যদিকে ইরানী বহিঃশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো।

সাইয়েদেনা উসমান গনী যুন্ নূরাইন (রা)-এর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক

১লা মুহাররম ২৪ হিজরী থেকে ১৮ই যুলহিজ্জা ৩৫ হিজরী
১৭ই নভেম্বর ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭ই জুন ৬৫৬ খৃষ্টাব্দ

তিনি ইসলামী আদর্শের পূর্ণাঙ্গ কর্মপ্রণালী বিধি মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে বিকৃতি ও বিভেদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও এমন এক পরিস্থিতিতে নিজের সাদামাটা জীবনের বাস্তব নমুনা পেশ করেছিলেন যখন মুসলমানদের ঘরে ঘরে সম্পদ ও প্রাচুর্যের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছিলো এবং বৈষয়িক প্রয়োজনের মোকাবিলায় দীনি প্রয়োজন পূরণ কঠিন হয়ে পড়েছিলো।

www.amarboi.org

সাইয়্যেদেনা আলী হায়দার (রা)-এর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক

২২শে যুলহিজ্জা ৩৫ হিজরী থেকে ১৭ই রমযান ৪০ হিজরী
২৩ শে জুন ৬৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ২৫শে জানুয়ারী ৬৬১ খৃষ্টাব্দ।

তিনি ইসলামী আদর্শ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে এমন এক সময় হিফাজত করেছিলেন যখন এই পবিত্র আদর্শ রাজতন্ত্রের মধ্যে বিলীন এবং 'ইলহাদ' ও 'যিন্দিকী'র মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি দুনিয়ার সম্মুখে ইসলামী আদর্শ ও দীনি শিক্ষার সঠিক চিত্র পেশ করেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপদকে নজীর বিহীন দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেছিলেন।

ঐসব মহত ব্যক্তিবর্গ যদি এসব না করতেন তাহলে ইসলামের দীনি মর্যাদার রক্ষা কঠিন হতো। নিস্ব এই ফকীর তাঁদের দরবারে ভক্তি ও একনিষ্ঠতার নজরানা পেশ করছে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

ফকীর
সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, ঢাকা
১৮-১০-৬৯ হিজরী।

www.amarboi.org

খিলাফত

আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীর খিলাফত দান করেছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যেও এই খিলাফত পুরুষানুক্রমে চলতে থাকে যা আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত 'দীনে হকে'র মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۝ (سورة الصف)

তিনিই সেই মহান আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও দীনে হক সহ প্রেরণ করেছেন তাকে সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী করার জন্য।

খিলাফত বলা হয় স্থলাভিষিক্ত হওয়া ও প্রতিনিধিত্ব করাকে। পৃথিবীর খিলাফত মুসলমানদের জন্য একটা বড় নিয়ামত।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤئِفَ فِى الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ-(الانعام)

সেই মহান সত্তা আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করেছেন এবং তোমাদের অনেকের মর্যাদা অনেকের চেয়ে সমুন্নত করেছেন।

মুসলমানদের জনমতের ভিত্তিতে তাদের যে নেতা নির্বাচিত হয় তাঁকে ইমাম ও খলিফা বলে। কারণ, সে পৃথিবীতে আল্লাহর নবীর প্রতিনিধি ও মুসলমানদের নেতা। তার কাজ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াতের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা, তার উন্নয়ন সাধন করা, সর্ব প্রকার বিরুদ্ধ প্রভাব থেকে তাকে রক্ষা করা এবং দেশের নিরাপত্তা বিধান করা। সে পৃথিবী থেকে অন্যায় ও অত্যাচারের অন্ধকার দূর এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে।

www.amarboi.org

খিলাফতে রাশেদা

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط - (النور)

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানাবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের বানিয়েছিলেন, যে দীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তাকে দৃঢ়তা দান করবেন এবং তাদের ভীতিকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করবেন। (সূরা নূর, আয়াত—৫৫)

৫ হিজরী সনে আল্লাহর দেয়া এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণার সময় যেসব মুহাজির ও আনসার বর্তমান ছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে সাইয়েদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর ফারূক (রা), হযরত উসমান গনী (রা) এবং হযরত আলী মুরতাজা (রা) যথাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর খিলাফত এবং দীনকে মজবুত করার তাওফীক লাভ করেন। এই চারজন খলিফা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আপাদমস্তক ঈমান ও আমলের মূর্ত প্রতীক। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের শিক্ষাগার থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়ে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেন। তাঁদের শাসনকাল ছিল ন্যায় ও ইনসাফে পরিপূর্ণ। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজগুলোকেই সুসম্পন্ন করেছেন, টিকিয়ে রেখেছেন। বাইরের সব রকম প্রভাব থেকে তা রক্ষা করেছেন, নিজেদের কর্মশক্তি দ্বারা দীনের প্রকাশকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং শরীয়াতের জ্ঞান বিস্তারে পূর্ণরূপে সচেষ্ট থেকেছেন। তাঁদের মধ্যে এমন সার্বিক যোগ্যতা ছিল যে, তাঁরা একই সাথে ছিলেন মুজতাহিদ, মুর্শিদে কামেল, ন্যায়বিচারক, যোগ্যতম প্রশাসক এবং যুদ্ধক্ষেত্রের সুদক্ষ সেনাপতি। মোটকথা ধর্ম ও রাজনীতির সব দিক ও বিভাগে তাঁরা ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যিকার উত্তরসূরী। এটাই

www.amarboi.org

হচ্ছে খিলাফতে রাশেদা বা নবুওয়াতের পদ্ধতির[১] ওপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই খিলাফতের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ-(ترمذى)২

তোমাদের ওপর আমার সুন্নাতের অনুসরণ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ অত্যাবশ্যক।

খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ও তাঁদের ত্রিশ সালা খিলাফত যুগের নজিরবিহীন কৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁদের খিলাফত যুগই খিলাফতে রাশেদা হওয়ার যোগ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ

اَلْخِلاَفَةُ مِنْ بَعْدِى ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا-

আমার পরে ত্রিশ বছর পর্যন্ত খিলাফত ব্যবস্থা থাকবে। তারপর তা রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে।

হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত সাফীনা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত দাস) নিম্নরূপ ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

اَمْسِكْ خِلاَفَةُ اَبِىْ بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَ خِلاَفَةُ عُمَرَ عَشَرَةً وَ عُثْمَانَ اِثْنَى عَشَرَةَ وَ عَلِىٍّ سِتَّةً- (৩)

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকাল দুই বছর, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল দশ বছর, হযরত উসমান (রা)-এর বার বছর এবং হযরত আলী (রা)-এর ছয় বছর এভাবে মোট ত্রিশ বছর হিসেব করো।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে খিলাফতে রাশেদার পবিত্র যুগের অবসান ঘটে।

---

(১) মুসনাদে আহমাদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা—৪০৪
(২) তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৯২, মুসনাদে আহমাদ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা—১২৬
(৩) তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৫

www.amarboi.org

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর সর্ব প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সাহাবীদের মধ্যে থেকে কাউকে খলিফা নিয়োগ করা। আরো জরুরী ছিল এ কাজ অতি সত্বর আঞ্জাম দেয়া যাতে কোন রকম ফিতনার কারণে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যবস্থা ধ্বংস না হয়।

আল্লাহর ইচ্ছা প্রথম খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বাছাই করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এরূপঃ

يَأْبَى اللّٰهُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ اَبَا بَكْرٍ-

মহান আল্লাহ ও মুসলমানরা আবু বকর (রা) ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তির খিলাফতকে অস্বীকার করবেন।[১]

ব্যক্তিগত জীবন

হযরত আবু বকরের নাম ছিল আবদুল্লাহ। উপাধি ছিল সিদ্দীক ও আতীক এবং উপনাম ছিল আবু বকর। তাঁর পিতার নাম ছিল উসমান ও আবু কুহাফা। মায়ের নাম সালমা এবং উপনাম উম্মুল খায়ের। ষষ্ঠতম উর্ধ পুরুষ মুররা পর্যন্ত গিয়ে বংশধারা[২] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উর্ধতন পুরুষের সাথে মিলিত হয়েছে।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের দুই বছর কয়েক মাস পরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর অনুরূপ সময়ের ব্যবধানেই ইনতিকাল করেন। তাই বয়সও হয়েছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়সের মত ৬৩ বছর।

তাঁর গাত্র বর্ণ ছিল ঈষৎ রক্তিম, দেহ হালকা পাতলা, মুখমন্ডল স্বল্প মাংসল, কপাল উঁচু, চোখ ঈষৎ কোটরাগত। মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। চুলে মেহেদীর খিযাব ব্যবহার করতেন। অত্যন্ত নম্রহৃদয় ও সহিষ্ণু ছিলেন। জাহেলী যুগেও কখনো মদ্যপান করেননি।

---

(১) সহীহ আল বুখারী, পৃষ্ঠা—১০৭২ ও সহীহ মুসলিম-১২
(২) পূর্ণ বংশ তালিকা এরূপ। আবু বকর বিন উসমান বিন আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তায়েম বিন মুররা-----।

www.amarboi.org

কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম চরিত্রের কারণে মক্কার লোকেরা তাঁকে অত্যন্ত প্রিয়জন বলে মনে করতো এবং ভালবাসতো। জাহেলী যুগে রক্তপণের সমুদয় অর্থ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখা হতো।

আরবের লোকদের নসবনামা সম্পর্কে তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী জানতেন। কাব্য ও কবিতা সম্পর্কিত জ্ঞানেও ভাল দখল ছিল। সুবক্তা ও শুদ্ধভাষী ছিলেন। বক্তৃতায় আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিভা ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শৈশবকাল থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। অধিকাংশ বাণিজ্য সফরেই সাথে ছিলেন। নবুওয়াত লাভের পর নবী সাল্লাল্লাহু অলিাইহি ওয়া সাল্লাম বন্ধু-বান্ধব ও সৎলোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলে বয়স্ক স্বাধীন লোকদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে মি'রাজের ঘটনা বিশ্বাস করেন এবং 'সিদ্দীকে আকবার' উপাধিতে ভূষিত হন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই দীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত উসমান (রা), হযরত যুবায়ের (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত সা'দ (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) প্রমুখের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হলে তাঁর সঞ্চিত চল্লিশ হাজার দিরহাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে ও ইসলামের প্রচারের জন্য ব্যয় করেন। প্রথম দিকে মক্কায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বহু সংখ্যক ছিলেন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। তারা তাদের মুশরিক মালিকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে নানা রকমের শাস্তির শিকারে পরিণত হন। হযরত আবু বকর (রা) তাদের মধ্যে থেকে হযরত বেলাল (রা), হযরত খাব্বাব (রা), হযরত আম্মার (রা) ও তার মা, হযরত সুহাইব (রা), হযরত আবু ফাকীহা (রা) এবং হযরত যিননিরাহকে পূর্ণ মূল্যে ক্রয় করে ইসলামের কারণে স্বাধীন করে দেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় বাড়ীতে যা কিছু ছিল তা সবই এনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাতে তুলে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.amarboi.org

সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন। নিজের সন্তানদের জন্য কিছু রেখে এসেছো কি ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তাদের জন্য আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলই যথেষ্ট।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইনতিকাল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষণ্ন দেখে নিজ কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-কে একান্ত আন্তরিকভাবে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল তখন খুবই কম। বিয়ের মোহরানাও তিনি নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করেন।

মক্কার জীবনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বিকাল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাড়ীতে যেতেন এবং যেসব বিষয়ে পরামর্শ করার প্রয়োজন হতো সেসব বিষয়ে পরামর্শ করতেন। ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও গেলে হযরত আবু বকর (রা) সাধারণত তাঁর সাথে থাকতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। হিজরতকালে সহযাত্রী হওয়ার কথা কুরআন মজীদেই উল্লেখ করা হয়েছে। নবী (স)-এর পবিত্র জীবনে হযরত আবু বকরের মর্যাদা ছিল উজীর ও পরামর্শ দাতার ন্যায়। সমস্ত যুদ্ধাভিযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে থেকে অত্যন্ত মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

মক্কা বিজয়ের পর ৯ হিজরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রা)-কে প্রথম ইসলামী হজ্জের আমীরুল হজ্জ বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। এই হজ্জের সময়েই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত আলী (রা) সূরা তাওবার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন যার মধ্যে ইসলাম ও কুফরের সীমা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতের সফরের প্রস্তুতি শুরু করলে মসজিদে নববীর ইমামতির সম্মানজনক পদটি তিনি হযরত আবু বকর (রা)-কে দান করেন। নবী (স)-এর ইনতিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। "রাসূলের (স) খলিফা" এই পবিত্র উপাধি তাঁর ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি। পরবর্তী খলিফাদের আমীরুল মু'মিনীন বলা হতো।

তাঁর জীবিকার্জনের মূল মাধ্যম ছিল ব্যবসায়। ইসলামের পূর্বে কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরেও

www.amarboi.org

প্রয়োজন অনুপাতে তা চালু রাখেন এবং এভাবেই জীবিকা অর্জন করতে থাকেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবসায় বন্ধ করতে বাধ্য হন। হযরত উমর (রা) ও হযরত আবু উবায়দা (রা)-এর চাপ সৃষ্টির কারণে মুসলমানদের সাথে পরামর্শের পর বায়তুল মাল থেকে ঠিক প্রয়োজন অনুপাতে আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করেন যার পরিমাণ ছিল বাৎসরিক আড়াই হাজার দিরহাম[১]। বর্তমান প্রচলিত মুদ্রায় তা প্রায় পৌনে সাত শ' টাকার সমান।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি বিয়ে করেন। যেসব স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করে তাদের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) ফাতীলা ঃ তাঁর গর্ভে হযরত আবদুল্লাহ (রা) ও হযরত আসমা (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

(২) উম্মে রুমান ঃ তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর মা।

(৩) আসমা বিনতে উমায়েস ঃ তাঁর গর্ভে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

(৪) হাবীবা বিনতে খারেজা ঃ তাঁর গর্ভে হযরত উম্মে কুলসূম (রা) জন্মলাভ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত

১৩ই রবিউল আউয়াল, ১১হিজরী থেকে জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরী পর্যন্ত (জুন ৬৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে আগস্ট ৬৩৪)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর আনসারগণ সাকীফায়ে বনী সায়েদায় একত্রিত হন। খিলাফতে নববী সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে। আনসাররা চাচ্ছিলেন খলিফা দুইজন হোক; একজন আনসারদের মধ্যে থেকে এবং আরেকজন মুহাজিরদের মধ্যে থেকে। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, খলিফা দুইজন হলে তা সাংঘাতিক মতানৈক্যের কারণ হতো। শুধু আনসারদের মধ্যে থেকে খলিফা নির্বাচন করাও সম্ভব ছিল। কিন্তু সময়টা ছিল এমন যে গোটা আরবের সকল গোত্রকে তাদের অনুগত করা কঠিন হতো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা) এ খবর জানতে পারলেন। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফনের চেয়েও খেলাফত সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার যোগ্য বলে বিবেচনা করলেন। তাঁরা

(১) তাবকাতে ইবনে সা'দ।

www.amarboi.org

দুইজন এবং হযরত আবু উবায়দা (রা) সাকীফায়ে বনী সায়েদায় গিয়ে হাজির হলেন। হযরত আবু বকর (রা) খুবই উত্তম পন্থায় আনসারদের বুঝাতে সক্ষম হলেন। হযরত উমর (রা) উদ্দীপ্ত করায় সবাই এ ব্যাপারে একমত হন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের ওপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। সুতরাং সর্বপ্রথম মুহাজিরদের মধ্যে থেকে হযরত উমর (রা) এবং আনসারদের মধ্যে থেকে হযরত বাশীর[১] ইবনে সা'দ (রা) বাইয়াত করেন। মোট কথা, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভালভাবে নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে যায় এবং মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফন-দাফনে মনোনিবেশ করেন।

পরদিন মসজিদে নববীতে গণ বাইয়াত[২] অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলিফা হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিম্বারে বসে নিম্ন বর্ণিত ভাষায় তাঁর ভবিষ্যত কর্ম পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেন।

"হে জনগণ, আমাকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি কিন্তু তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে উত্তম নই। আমি যদি ভাল কাজ করি তাহলে আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি খারাপ কিছু করতে উদ্যত হই তাহলে আমাকে সোজা করে দেবে। সত্যবাদিতা হচ্ছে আমানতদারী এবং মিথ্যা হচ্ছে খিয়ানত। ইনশাআল্লাহ, তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিও আমার কাছে শক্তিশালী। তার অধিকার আমি তাকে ফিরিয়ে দেবো। আর ইনশাআল্লাহ তোমাদের শক্তিশালী ব্যক্তিও আমার কাছে দুর্বল। আমি তাঁর নিকট থেকে অন্যদের অধিকার আদায় করে দেবো। যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করেন। যে জাতির মধ্যে অন্যায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তাদের বিপদাপদও ব্যাপক করে দেন। আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি তাহলে আমার আনুগত্য করবে। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই তাহলে তোমাদের কাছে আমার আনুগত্য চাওয়ার অধিকার থাকবে না। নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাও।, আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।[৩]

---

(১) তাবকাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা— ১২৯

(২) ফাতহুল বারী ৭ম খন্ডের ৩০৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, প্রথম দিকেই হযরত আলী (রা) হযরত আবু বকরের বাইয়াত হন। ইবনে হিব্বান প্রমুখ এ বর্ণনা বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বুখারীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আলী (রা) ছয় মাস পরে বাইয়াত হয়েছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লামু।-সাইয়েদ আমীমুল ইহসান।

(৩) তবকাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৯

www.amarboi.org

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

খলিফা হওয়ার পরপরই হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সামনে বিপদের পাহাড় দেখতে পান। একদিকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারদের উত্থান ঘটে অন্যদিকে মুরতাদদের একটি দল বিদ্রোহের ঝান্ডা উড্ডীন করে। যাকাত অস্বীকারকারীরাও এই সময়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এসব বিপদের পাশাপাশি হযরত উসামা (রা) ইবনে যায়েদের অভিযানের বিষয়টিও সামনে ছিল। মুতার যুদ্ধের শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় হযরত উসামা (রা)-কে অভিযান পরিচালনার জন্য শুধু নির্দেশই দিয়েছিলেন না, বরং নিজ হাতে সে অভিযানের জন্য প্রস্তুত সেনাদলের পতাকাও বেঁধেছিলেন। অধিকাংশ বড় বড় সাহাবীকে এই অভিযানে অংশ গ্রহণের নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন। এই নাজুক সময়ে সেনাবাহিনীর মদীনা ছেড়ে দূরে যাওয়াও বিপদের আশংকা মুক্ত ছিল না। কিন্তু হযরত আবু বকরের (রা) দৃঢ় সংকল্প সফলভাবে প্রতিটি বিপদের মোকাবিলা করেছে।

উসামার সেনাবাহিনী

এই অভিযান সম্পর্কে কোন কোন সাহাবীর মত ছিল এই যে, এখন তা মুলতুবী রেখে প্রথমে মুরতাদ ও নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারদের সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ ফিতনার মূলোৎপাটন করা হোক। কিন্তু এই অভিযান সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা) কারো পরামর্শই গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যে ঝান্ডা বেঁধেছেন আমি তা খুলে ফেলতে পারি না।" হযরত আবু বকর (রা) ঠিকই বলেছিলেন। এটা সত্য যে, যদি তিনি অন্যদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন তাহলে সর্ব প্রথমই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অমান্য করার একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হতো।

হযরত উসামা (রা)-এর বাহিনী রওয়ানা হলো। হযরত আবু বকর (রা) নিজে বহুদূর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে বাহিনীর সাথে অগ্রসর হয়ে তাদের বিদায় দিলেন। বিদায়ের সময় তাদেরকে নসীহত করলেন এই বলে ঃ

"প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গ করো না, লাশ বিকৃত করো না, কোন শিশু, বৃদ্ধ বা নারীর রক্তপাত ঘটাবে না, খেজুর গাছে অগ্নিসংযোগ করবে না, কোন ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, অপরের গরু, বকরী কিংবা উট জবাই করবে না। তোমরা এমন সব লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা তাদের গোটা

www.amarboi.org

জীবন গীর্জার জন্য উৎসর্গ করেছে। তোমরা তাদেরকে তাদের আপন অবস্থায় পরিত্যাগ করবে, কোনভাবেই তাদেরকে উত্যক্ত করবে না।"

১১ হিজরীর ১লা রবিউস সানী হযরত উসামা (রা)-এর বাহিনী মদীনা থেকে যাত্রা করে এবং সিরিয়ার সন্নিকটবর্তী কুদা'আ জনপদটি আক্রমণ করে চল্লিশ দিন পর সফলকাম হয়ে ফিরে আসে।

সিরিয়ার ওপর এই আক্রমণ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। বহু সংখ্যক বিদ্রোহী গোত্র কেন্দ্রের সামরিক শক্তির এই প্রদর্শনী দেখে পুনরায় নিজেদেরকে ইসলামী আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত করে নেয়।

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

হযরত উসামা (রা)-এর বাহিনী সিরিয়াতে অবস্থানকালেই উত্তরাঞ্চলে বনু আব্বাস ও বনু যুবিয়ান গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। তারা এই মর্মে মদীনাতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে যে, তাদেরকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক। জবাবে হযরত আবু বকর (রা) তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, "আল্লাহর শপথ ! যাকাত হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে যা পাঠানো হতো তার মধ্যে থেকে যদি একটি বকরীর বাচ্চা দিতেও কেউ অস্বীকৃতি জানায় তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো।" এ ঘোষণা শুনে ঐসব গোত্র বিদ্রোহ করে বসে। তারা মদীনার ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য মদীনা থেকে ১২ মাইল দূরবর্তী যুলকিসসা নামক স্থানে সমবেত হয়। ইতিমধ্যে হযরত উসামা (রা)-এর বাহিনী সফলকাম হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। হযরত আবু বকর (রা) হযরত উসামা (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে সেনাবাহিনী নিয়ে নিজেই তাদের মোকাবিলায় অগ্রসর হন। তারা পরাজিত হয়। এতে অন্যান্য যাকাত অস্বীকারকারীরা আপনা থেকেই নিজেদের যাকাত নিয়ে খলিফার দরবারে হাযির হয়।

হযতর আবু বকর (রা) যুলকিসসাতেই ইসলামী বাহিনীকে নতুনভাবে ঢেলে সাজালেন এবং বারটি অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশের জন্য একজন করে নেতা নিয়োগ করলেন। নেতাদের নাম হচ্ছে ঃ (১) খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (২) ইকরিমা (৩) শারাহবীল (৪) মুহাজির ইবনে আবী উমাইয়া (৫) হুযাইফা ইবনে মুহসিন (৬) আরফাজা (৭) সুওয়াইদ ইবনে মাকরান (৮) আ'লা আল হাদরামী (৯) তরীফা (১০) আমর ইবনুল আস (১১) খালেদ ইবনে সাঈদ।

www.amarboi.org

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারদের উৎখাত

সত্য নবীর সাফল্য দেখে আরবে নবুওয়াতের কতিপয় মিথ্যা দাবীদারের উদ্ভব ঘটে। এই দুর্ভাগারা মনে করে যে, নুবওয়াতের দাবীও পার্থিব উন্নতির একটি উত্তম উপায় হতে পারে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ দিকে ইয়ামানে আসওয়াদ আনাসী এবং ইয়ামামায় মুসায়লামা কাযযাব নবুওয়াতের দাবী করে বসে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর নাজদে তুলায়হা আসাদী এবং ইরাকে সাজা নাম্নী এক স্ত্রীলোক নবুওয়াতের দাবী করে। নবুওয়াতের এসব দাবীদারদের সাথে বড় বড় দল ভিড়ে যায় এবং তাদের ফিতনা আরবের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত আবু বকর (রা) তাঁর খোদা প্রদত্ত সাহস ও সংকল্পের সাথে এদিকে মনযোগ দেন। এসব ভন্ড নবীদেরকে উপযুক্ত শাস্তিদানের জন্য ইসলামী বাহিনী প্রেরণ করেন যার মধ্যে মুহাজির এবং আনসারও ছিলেন।

সর্বপ্রথম হযরত খালেদ (রা) ইবনে ওয়ালীদ তুলায়হার দলবলের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তার অনুসারীদের হত্যা করেন এবং তাদের নেতা আইনিয়া ইবনে হাসানকে বন্দী করে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তুলায়হা সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। পরে আইনিয়া ও তুলায়হা উভয়েই তওবা করে পুনরায় ঈমান গ্রহণ করে।

মুসায়লামার মূলোৎপাটনের জন্য প্রথমে হযরত ইকরিমা (রা) এবং পরে শারাহবিল (রা)-কে প্রেরণ করা হয়। খালিদ ইবনে ওয়ালীদও তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিপুল সংখ্যক কুরআনের হাফেজ সহ বহু মুসলমান শহীদ হন এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই বিজয় লাভ করেন। মুসায়লামা কাযযাব নিহত হয় এবং তার দলবল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মুসায়লামা হত্যাকারীদের মধ্যে সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা)-এর হত্যাকারী ওয়াহশীও শরীক ছিলেন। এভাবে তিনি তার কৃতকর্মের উপযুক্ত কাফফারা আদায় করেন।

শাজ্জা' মুসায়লামার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো। স্বামী নিহত হওয়ায় সে সিরিয়ায় পালিয়ে যায় এবং কিছুদিন পর মৃত্যু বরণ করে।

আসওয়াদকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কায়েস ইবনে মাকশূহ ও ফিরোজ দায়লামী হত্যা করে।

www.amarboi.org

মুরতাদদের মূলোৎপাটন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর কোন কোন আরব গোত্রপতি মুরতাদ হয়ে যায় এবং নিজ নিজ গন্ডিতে স্বতন্ত্র শাসন কায়েম করে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। এভাবে বাহরাইনে নু'মান ইবনে মুনযির মাথা তুলে দাঁড়ায়। লাকীত ইবনে মালেক ওমানে বিদ্রোহ করে এবং কিন্দা অঞ্চলেও কতিপয় শাসকের আবির্ভাব ঘটে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ভন্ড নবীদের শায়েস্তা করার পর এদিকে দৃষ্টি দেন। 'আলা আল হাদরামীকে বাহরাইনে পাঠিয়ে নু'মান ইবনে মুনযিরকে দমন করেন। অনুরূপ হুযায়ফা ইবনে মিহসানের হাতে লাকীত ইবনে মালেকের ধ্বংস সাধন হয় এবং যিয়াদ ইবনে ওয়ালীদের হাতে কিন্দার স্বঘোষিত শাসকদের মূলোৎপাটন হয়।

কুরআন মজীদের সংকলন

কুরআন মজীদ বর্তমানে যেভাবে বিন্যস্ত আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় হাফেজদের স্মৃতিতেও সেভাবেই সংরক্ষিত ছিল। তবে লিখিতভাবে একটি গ্রন্থে ছিল না বরং বিভিন্ন ছোট ছোট পুস্তিকাকারে সংরক্ষিত ছিল। ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক কুরআনের হাফেজ শাহাদাত লাভ করলে হযরত উমর (রা) নবী (স) যেভাবে কুরআন মজীদ বিন্যস্ত করেছিলেন সেইভাবে একটি মাত্র গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত করে সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাব দেন। হযরত আবু বকর (রা) প্রথমে কিছু আপত্তি করলেও পরে তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং কাতেবে অহী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) এ কাজের জন্য আদিষ্ট হন। তিনি অতীব যত্ন সহকারে ছোট ছোট সহীফাসমূহ একত্র করে তার সাথে কুরআন মজীদকে একটি বিন্যস্ত গ্রন্থের আকারে সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর ইনতিকালের পর উক্ত মাসহাফ হযরত উমরের কাছে সংরক্ষিত ছিল। হযরত উসমান (রা) খলিফা হওয়ার পর তার একাধিক কপি প্রস্তুত করিয়ে অন্যান্য শহরে প্রেরণ করেন। আমীর মুয়াবিয়ার শাসনযুগে মদীনার গভর্ণর মারওয়ান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর নিকট থেকে হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রস্তুতকৃত মাসহাফ নিয়ে ধ্বংস করে ফেলে।[১]

মোদ্দা কথা, হযরত আবু বকর (রা)-এর ঈমানী শক্তি এবং সৎ ও দৃঢ় সংকল্পের ফলে এক বছরের মধ্যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা অবদমিত হয় এবং

(১) ফাতহুল বারী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা—১৭

www.amarboi.org

সমগ্র আরব ইসলামী পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ হয়। মহা জ্ঞানভান্ডার কুরআন মজীদ—মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যার হিফাজতের প্রতিশ্রুতি ছিল—চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায়।

ইসলামের হিফাজত ও প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল-াইহি ওয়া সাল্লামের পর নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর (রা)-এর অবদানই সর্বাধিক।

বিজয়সমূহ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বে ইরান ও রোমে দুটি প্রাচীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচ্যে ছিল অগ্নিপূজক ইরানীদের আধিপত্য। তাদের রাজধানী ছিল মাদায়েন। সেখানকার শাসকের উপাধি ছিল কিসরা। পাশ্চাত্যে ছিল খৃস্টবাদী রোমানদের আধিপত্য। তাদের রাজধানী ছিল কনষ্টান্টিনোপল। সেখানকার শাসকের উপাধি ছিল কাইজার। পৃথিবীর এ দুটি বিশাল সাম্রাজ্যের সীমান্তের সাথে সংলগ্ন ছিল আরবের সীমান্ত। উত্তর দিকে অবস্থিত সিরিয়া ছিল রোমানদের কর্তৃত্বাধীন এবং পূর্ব দিকে অবস্থিত ইরাকের ওপর ছিল ইরানী আধিপত্য।

প্রতিবেশী এ দুটি সাম্রাজ্য আরবের স্বাধীন ও লড়াকু অধিবাসীদের ওপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সব সময় চেষ্টিত ছিল। কিন্তু কেউ-ই পুরোপুরি সাফল্য লাভ করতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় পর্যন্ত ইরানীদের উপদ্রব অব্যাহত ছিল। রোমানরা ৫ম হিজরীতে সরাসরি মদীনা শরীফের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো এবং সেজন্য নবী (সা)-কে সেনাবাহিনী নিয়ে তাবুক পর্যন্ত অগ্রসর হতে হয়েছিল। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ

قَدْ مَاتَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهٗ وَاِذَ هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهٗ- وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَفْتَحُنَّ كُنُوْزَ كِسْرٰى وَ قَيْصَرَ ثُمَّ لَتُنْفِقُنَّهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ-(صحيح مسلم)

কিসরা মৃত্যু বরণ করেছে। এরপর আর কোন কিসরা হবে না। অনুরূপ কাইজার ধ্বংস হলে তারপর আর কোন কাইজার আসবে না। যার মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার শপথ, তোমরা কিসরা ও কাইজারের ধনভান্ডার দখল করে নেবে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করবে।

(সহীহ মুসলিম)

www.amarboi.org

মাত্র কয়েক বছর পরেই হযরত আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর খিলাফতকালে নবী (স)-এর এ ভবিষ্যতদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়। হযরত আবু বকরের সময় এর ভিত্তি রচিত হয় এবং হযরত উমর (রা)-এর সোনালী যুগে তা পূর্ণতা লাভ করে।

ইরাক ঃ ১২ হিজরীর মুহাররম মাসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ সাইফুল্লাহ (রা)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী গঠন করে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন যাতে সেদিক থেকে পরিচালিত সীমান্ত আক্রমণসমূহ থেকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করা যায় এবং সাথে সাথে ইসলামের প্রচারের কাজও হয়।

হযরত খালিদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে ইরাক পৌঁছার পর ইসলামী বিধান মোতাবেক সর্বপ্রথম তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তারা দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং জিযিয়া দিতেও সম্মত না হওয়ায় তাদের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। যুদ্ধগুলোর নাম হচ্ছে ঃ কাযেমিয়ার যুদ্ধ, তানীর যুদ্ধ, ওয়ালজার যুদ্ধ, আলসনের যুদ্ধ, ফোরাতের যুদ্ধ, আম্বারের যুদ্ধ, আইনুত তামারের যুদ্ধ, দাওমাতুল জানদালের যুদ্ধ, মফীদের যুদ্ধ, ফানানাসের যুদ্ধ, যামীলের যুদ্ধ এবং ফারাদের যুদ্ধ। এসব যুদ্ধে মুসলমানরাই বিজয়লাভ করে এবং আম্বার, আইনুত তামার, দাওমাতুল জানদাল, বাকিয়া, কাসকার প্রভৃতি অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে।

ইরাকে আরবের রাজধানী ছিল হিরা। ইসলামী বাহিনী হিরার ওপর আক্রমণ করে। সেখানকার অধিবাসীরা নিরাপত্তা প্রার্থনা করে এবং জিযিয়া দিতে সম্মত হয়। পারস্যবাসীদের নিকট থেকে মুসলমানদের আদায়কৃত এটাই প্রথম জিযিয়া। হিরাকে ইসলামী বাহিনীর হেড কোয়ার্টার হিসেবে মনোনীত করা হয়।

মুসলমানদের সাধারণ নিয়ম ছিল প্রতিটি যুদ্ধের পূর্বেই অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া। এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যাত হলে যুদ্ধ করা হতো। হযরত খালিদ (রা) হিরা থেকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে ইরানের শাহানশাহের নামে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু সিরিয়ায় যুদ্ধের কারণে হযরত খালেদ (রা)-কে অর্ধেক সৈন্যসহ সিরিয়ায় গমনের নির্দেশ আসলে তিনি সেখান থেকে সিরিয়ায় চলে যান। ইরাকে অবস্থানরত বাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করেন মুসান্না। তিনি হিরায় অবস্থানকালেই হরমূযের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ নতুন ইরানী সৈন্য এসে পৌঁছে। বাবেলের সন্নিকটে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং মুসান্না মাদায়েনের সন্নিকটবর্তী এলাকা পর্যন্ত

www.amarboi.org

ইরানী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। হিরায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জানতে পারেন যে, ইরানীরা ব্যাপক হামলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। রাজকুমারী পুরানদখত ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং বিখ্যাত যোদ্ধা রুস্তম ইরানী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। এ খবর পাওয়ার পর মুসান্না বাশীর ইবনে খাসাসিয়াকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে হযরত আবু বকর (রা)-কে সেখানকার প্রকৃত পরিস্থিতি অবহিত করার জন্য মদীনায় চলে যান। যেদিন তিনি মদীনায় পৌঁছেন সেটি ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর জীবনের শেষ দিন। তিনি হযরত উমর (রা)-কে ডেকে মুসান্নার জন্য সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণের তাগিদ দেন।

সিরিয়া (শাম) ঃ ইসলামী বাহিনী ইরাকে যুদ্ধরত থাকাবস্থায়ই হযরত আবু বকর (রা) রোমানদের ব্যাপারে আশংকা করলেন। তাদের দিক থেকে এখন বিপদের আশংকা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা) সাহাবীদের ডেকে একত্রিত করলেন। পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হলো বীর মুজাহিদ বাহিনী সিরিয়ায় যাবে, তাই তারা প্রস্তুত হয়ে গেলো।

হযরত আবু বকর (রা) ইসলামী বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করলেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে একটি অংশের নেতৃত্ব দিয়ে আমেলার পথে ফিলিস্তিনে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা)-কে দ্বিতীয় অংশের নেতৃত্ব দিয়ে হেমসের দিকে প্রেরণ করলেন। ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে তৃতীয় অংশের নেতৃত্ব দিয়ে দামেশকে পাঠালেন এবং শারাহবীল ইবনে হাসানা (রা)-কে চতুর্থ অংশের নেতা বানিয়ে জর্দানে যাওয়ার আদেশ দিলেন। একত্রিত হওয়ার পর হযরত আবু উবায়দা (রা) গোটা বাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন বলে নির্দেশ দিলেন। এভাবে ইসলামী বাহিনী রওয়ানা হল। হযরত আবু উবায়দা (রা) জাবিয়ায়, ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) বালকায়, শারাহবীল (রা) ইবনে হাসানা বসরায় এবং আমর ইবনুল আস (রা) আরবায় তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপনীত হলেন। আরবায় যুদ্ধ হলে রোমানরা পরাজিত হলো এবং বালকার অধিবাসীরা জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করলো।

সিরীয়রা যখন বুঝতে পারলো যে, ইসলামী বাহিনী তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলেছে তখন তারা সেই সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত সম্রাট হিরাক্লিয়াসের (কাইজার) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। হিরাক্লিয়াস প্রথমে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মুসলমানদের সাথে সন্ধি করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এ পরামর্শ রোমানদের কাছে মোটেই পছন্দনীয় হল না। এমনকি তারা

www.amarboi.org

তাদের বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যত হলো। এ অবস্থা দেখে হিরাক্লিয়াস তার সমস্ত শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমাবেশ করলো এবং ১৩ হিজরী সনে সিরিয়ার একটি বড় উপত্যকা ইয়ারমুকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিরাট বিজয় লাভ করে এবং রোমানদের চরম পরাজয় ঘটে।

যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ—হিরাক্লিয়াস সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার পর তাঁর ভাই তাজারুককে নব্বই হাজার সৈন্য দিয়ে আমর ইবনুল আসের বিরুদ্ধে জুযির ইবনে তুদারকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়ে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে এবং কিকার ইবনে সাতূসকে ষাট হাজার সৈন্য দিয়ে আবু উবায়দা (রা)-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইসলামী বাহিনীর নেতাগণ রোমানদের এই ব্যাপক প্রস্তুতি ও সংখ্যাধিক্য দেখে সবাই একস্থানে সমবেত হলেন এবং হযরত আবু বকর (রা)-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। সেখান থেকে নির্দেশ আসলো, তোমরা সবাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একই স্থানে ইয়ারমুকে সমবেত হও। আমি আরো সাহায্য প্রেরণ করছি। এ নির্দেশ অনুসারে মুসলমানগণ ইয়ারমুকে সমবেত হলেন। হযরত আবু বকর (রা) ইরাকে খালেদ (রা)-এর কাছে নির্দেশ পাঠালেন, তুমি মুসান্না ইবনে হারেসের অধীন অর্ধেক সৈন্য রেখে অবশিষ্ট অর্ধাংশ নিয়ে অতি দ্রুত ইয়ারমুকে চলে যাও এবং নিজে গোটা বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করো। এ নির্দেশ অনুসারে হযরত খালেদ (রা) নয় হাজার সৈন্য নিয়ে ইরাকের দিকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে যারাই তাঁর মোকাবিলা করতে অগ্রসর হয়েছে তাদেরকে পরাজিত করে তিনি ইয়ারমুকে গিয়ে পৌছেন।

ইসলামী বাহিনীর সর্বমোট সংখ্যা ছিল ছত্রিশ হাজার এবং তার প্রধান সেনাপতি ছিলেন হযরত খালেদ (রা) ইবনে ওয়ালীদ। রোমান বাহিনীর সংখ্যা ছিল দুই লাখ চল্লিশ হাজার। এর সেনাধ্যক্ষ ছিল মাহান। ইয়ারমুকের ময়দানে দুটি সেনাবাহিনীই শান শাওকতের সাথে ব্যূহ রচনা করে দন্ডায়মান হলো। রোমান বাহিনীর সম্মুখভাগে ছিল হাজার হাজার পাদ্রী ও বিশপ। তারা ক্রুশ হাতে হযরত ঈসা (আ)-এর নাম নিয়ে সৈন্যদের উৎসাহিত করছিলো। কোন এক ব্যক্তি হযরত খালেদ সাইফুল্লাহকে (রা) বললো, রোমানদের সংখ্যা অনেক বেশী এবং মুসলমানদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। হযরত খালেদ (রা) জবাব দিলেন ঃ "মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশী, রোমানরাই বরং কম। কারণ, এ ক্ষেত্রে জয় পরাজয়ের মাধ্যমেই কমবেশী নির্ধারিত হয়।"

www.amarboi.org

ইয়ারমুক প্রান্তরে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো। উভয় পক্ষের সৈন্যরাই তাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যেতে থাকলো। ইতিমধ্যে মদীনা থেকে একজন দূতের আগমন ঘটলো। তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইনতিকালের খবর দিলেন। সাথে সাথে হযরত উমরের (রা) পক্ষ থেকে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের পদচ্যুতি ও তদস্থলে আবু উবায়দা (রা)-এর নিয়োগের নির্দেশও জানিয়ে দিলেন। পদচ্যুতির কথা জানার পর হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের (রা) মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল না। তিনি স্বেচ্ছায় পূর্বের মতই তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকলেন। যুদ্ধ চলতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত এক গৌরবজনক বিজয় মুসলমানদের পদচুম্বন করলো। এই যুদ্ধে প্রায় এক লাখ খৃস্টান নিহত হলো।

এই পরাজয়ের খবর শোনার পর কাইজার অত্যন্ত অনুতাপের সাথে সিরিয়াকে চিরবিদায় জানিয়ে কনষ্টান্টিনোপলের দিকে যাত্রা করার সংকল্প করলেন। বিজয়ের সুসংবাদ শুনে হযরত উমর (রা) তৎক্ষণাৎ সিজদাবনত হয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

অসুস্থতা ও মৃত্যুবরণ

১৩ হিজরীর ৭ই জমাদিউসানীতে হযরত আবু বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হন এবং একাধারে পনের দিন পর্যন্ত জ্বর অব্যাহত থাকে। বাঁচার আশা তিরোহিত হয়। তিনি বুঝতে পারলেন অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। রোমান ও ইরানীদের সাথে যুদ্ধ চলছে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁর সামনেই খলিফা নির্বাচিত হতো তাহলে তা খুবই ভালো হতো। সাহাবীদের ডেকে হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমরের (রা) ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। অধিকাংশ সাহাবীই এ প্রস্তাব পছন্দ করলেন। তবে কতিপয় সাহাবী ভিন্নমত পোষণ করে বললেন ঃ সাধারণ বিচারে হযরত উমর (রা) খুবই ভাল। কিন্তু তাঁর মেজাজে রয়েছে অত্যন্ত কঠোরতা। হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ খিলাফতের গুরুদায়িত্ব কাঁধে চাপলে মেজাজের কঠোরতা আপনা থেকে উবে যাবে। মোট কথা সেখানে উপস্থিত জ্ঞানী সাহাবীগণ সবাই সম্মত হয়ে গেলেন। হযরত আবু বকর (রা), হযরত উসমান (রা)-কে ডেকে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত সম্পর্কে একটি চুক্তিপত্র লেখালেন। ইসলামে খিলাফতের ব্যাপারে এটাই প্রথম চুক্তিপত্র। জনগণকে এই চুক্তিপত্র শুনানো হলে সবাই তা মেনে নিলো। অতপর এতে হযরত আবু বকরের সিলমোহর লাগানো হলো। হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা)-কে ডেকে সত্য ও ন্যায়ের উপদেশ দিলেন।

www.amarboi.org

এই দায়িত্ব সম্পাদনের পর হযরত আবু বকর (রা) পারিবারিক বিষয়ে মনোবিবেশ করলেন। পরিবারের লোকদের অসিয়ত করলেন, আমি খলিফা থাকাকালে ভাতা হিসেবে বায়তুল মাল থেকে যে অর্থ গ্রহণ করেছি তা পরিশোধের জন্য আমার অমুক ভূমি বিক্রি করে তার মূল্য বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। সাথে সাথে আরো বললেন যে, এখন আমার পরিধানে যে কাপড় আছে তা ধুয়ে অন্য দুটি কাপড়ের সাথে আমাকে কাফন দিবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ এগুলো পুরনো হয়ে গিয়েছে। জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার জন্য পুরনো ছেঁড়া বস্ত্রই যথেষ্ট। তিনি আরো বললেন ঃ আমার কাছে যদি অতিরিক্ত কোন কিছু দেখতে পাও তা উমর (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিবে যাতে সে তা বায়তুল মালে জমা করে নিতে পারে। খোঁজ-খবর নেয়ার পর শুধু একটি দাসী ও দুটি উটনী পাওয়া গিয়েছিলো।

অবশেষে ১৩ হিজরীর জমাদিউসসানীর ২১ তারিখে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। হযরত উমর (রা) তাঁর জানাযা পড়ান এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্র হুজরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। এভাবে তিনি নবী (স)-এর চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব লাভে ধন্য হয়ে জান্নাত লাভ করেন।

তাঁর খিলাফতকাল ছিল দুই বছর তিন মাস দশ দিন।

খিলাফত ব্যবস্থা

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ মাত্র দুই বছর কয়েক মাস। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই তিনি ইসলামী আদর্শকে যে যোগ্যতার সাথে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে স্থায়ীভাবে ক্ষোদিত থাকবে।

আরবের লোকেরা সব সময়ই লাগামহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর বিধানের অনুগত করে উত্তম জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। যারা আল্লাহর রাসূলের (স) সাহচর্য লাভে ভালভাবে সফল হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন এই উজ্জ্বল আদর্শের প্রেমিক। কিন্তু কিছু লোক এমন ছিল যারা এই মহামূল্যবান সম্পদ লাভ করতে সক্ষম হয়নি তারা বরং শুধু দেখে দেখেই মুসলমান হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পরই তারা পুনরায় লাগামহীনতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। কিছু লোক ভন্ড নবীদের প্রতারণার ফাঁদে আটকা পড়েছিলো। অন্যরা মুসলমান থেকে গিয়েছিলো ঠিকই কিন্তু যাকাতকে জারিমানা মনে করে তা থেকে অব্যাহতি পেতে চাচ্ছিল। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা)-এর দৃঢ় সংকল্প সাফল্যজনক ভাবে এসব বিপদের মোকাবিলা করে এবং তিনি নবী (স)-এর খলিফা হওয়ার হক যথাযথভাবে আদায় করেন।

www.amarboi.org

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগের পরিপূরক মনে করতে হবে। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল এই যে, নবী (স)-এর দেয়া আদর্শকে তিনি কোন রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন না করেই অতীব যত্নের সাথে টিকিয়ে রেখেছিলেন এবং অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সকল অভ্যন্তরীণ ফিতনার মূলোৎপাটন করেছিলেন। এরপর তিনি ইসলামী বিজয়ের ধারাবাহিকতার সূচনা করেন যা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে পূর্ণতা লাভ করে।

ইসলামে হযরত আবু বকর সিদ্দীকই সর্ব প্রথম খিলাফত বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি নিজেও সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের বিষয়টিও নিজের সামনে সংখ্যাগরিষ্ঠের পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করিয়েছিলেন। তিনি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। একদল জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ সাহাবী (রা) ছিলেন তাঁর পরামর্শ দাতা।

হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগ ছিল বৈদেশিক বিজয় সূচনার যুগ। এজন্য তাঁর শাসনের গন্ডি আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতে হবে। তিনি গোটা আরব ভূমিকে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করে গভর্ণর ও কর্মচারী নিয়োগ করেন। নিজ নিজ এলাকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত ছিল। নামাযের জামায়াতে ইমামতি, মামলা-মোকদ্দমার শুনানি এবং ইসলামী বিধানে নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করার দায়িত্বও ছিল তাদের ওপর। ঐ সব নেতা ও কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

মক্কা মুয়াযযামায়—ইতাব ইবনে উসায়েদ (রা)
সান'আ—মুহাজির ইবনে আবী উমাইয়া (রা)
খাওলান—ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা)
জুনদ—মু'আয ইবনে জাবাল (রা)
বাহরাইন—আ'লা ইবনে হাদরামী (রা)
তায়েফ—উসমান ইবনে আবিল আস (রা)
হাদরামাওত—যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা)
যুবায়েদ—আবু মূসা আশ'আরী (রা)
জাওশ—আবদুল্লাহ ইবনে সাওর (রা)
নাজরান—জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা)।

সিরিয়ায় সেনাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব লাভের পূর্বে আবু উবায়দা (রা) কেন্দ্র অর্থাৎ মদীনা শরীফে অর্থ সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন কাজী এবং হযরত উসমান (রা) ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)

www.amarboi.org

ছিলেন সচিব। ইরাক ও সিরিয়ায় একের পর এক যুদ্ধ চলছিলো। সেখানকার শাসন শৃঙ্খলার দায়িত্ব ছিল সামরিক অফিসারদের ওপর ন্যস্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যারা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন সাধারণত তাদেরকেই অনুরূপ পদসমূহে নিয়োগ করা হতো। সিদ্দীকে আকবর (রা) কাউকে কোন পদে নিয়োগ করে বাইরে পাঠাতে চাইলে নিজে তাকে ডেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন এবং উত্তম আচরণ ও তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দান করতেন। স্বভাবগতভাবে নম্রহৃদয় ও ক্রটি-বিচ্যুতি উপেক্ষার মানসিকতা থাকা সত্ত্বেও কোন গভর্ণর বা কর্মকর্তা যদি ভুল করে বসতো তাহলে তাকে অবশ্যই যথোপযুক্তভাবে সতর্ক করে দিতেন। শাসনকার্য ও ধর্মীয় ব্যাপারে নমনীয়তাকে কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে ছিলেন নৈতিকতার প্রতিমূর্তি ও আপাদমস্তক দয়ার সাগর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْ بَكْرٍ-(مسند احمد)

আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক দয়াদ্রহৃদয় ব্যক্তি হচ্ছে আবু বকর। (মুসনাদে আহমাদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নিয়মিত অর্থ বিভাগ ছিল না। যখন যে অর্থ আমদানী হতো তা সাথে সাথে বন্টন করে দেয়া হতো। হযরত আবু বকর (রা)ও এই নীতি বহাল রাখেন। তবে খিলাফতের শেষ দিকে তিনি একটি বায়তুল মাল ভবন নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে মাল রাখার সুযোগ আসেনি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নিয়মিত কোন সামরিক বাহিনী বা ব্যবস্থাপনা ছিল না। সাহাবা কিরাম (রা)-এর সবাই ছিলেন ইসলামী বাহিনীর সৈনিক। প্রয়োজন দেখা দিলে সাহাবা কিরাম (রা) স্বতস্ফূর্তভাবে ইসলামী পতাকার নীচে সমবেত হতেন। আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত যুগে এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। প্রয়োজনের মুহূর্তে মুসলমানগণ স্বতস্ফূর্তভাবে সৈনিক হিসেবে কাজ করার জন্য নিজেদেরকে পেশ করতেন। তবে কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ক্ষেত্রে অভিযানে যেতে হলে সৈন্যদেরকে বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের জন্য স্বতন্ত্র একজন অফিসার নিয়োগ করা হতো এবং গোটা বাহিনীর জন্য একজন সর্বাধিনায়কও নিয়োগ করা হতো। হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে খালিদ বিন ওয়ালীদ সাইফুল্লাহ (রা) ছিলেন সর্বপ্রথম সর্বাধিনায়ক।

www.amarboi.org

হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে যুদ্ধলব্ধ অর্থের একটি বিশেষ অংশ সামরিক খাতে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও এ ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল। সরকারের আয়ের একটি যুক্তিসংগত অংশ অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় করা হতো। হযরত আবু বকর (রা) নিজে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করতেন এবং বাহিনীর সবাইকে পরস্পর সহিষ্ণুতা ঐক্য ও দৃঢ় সংকল্পের শিক্ষা দিতেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগে মুসলমানদের নৈতিক তত্ত্বাবধান এবং তাদের জানমালের হিফাজতের জন্য, নিয়মিত কোন পুলিশ বিভাগ ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে মদীনায় পাহারাদারী ও সাধারণ তত্ত্বাবধানের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেসব অমুসলিম জিম্মি হিসেবে মুসলিম রাষ্ট্রে থেকে গিয়েছিল তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। জিযিয়ার পরিমাণ ছিল একেবারেই নগণ্য। যথেষ্ট সংখ্যক অমুসলিমকে জিযিয়া থেকে অব্যাহতিও দেয়া হয়েছিলো। তাদের পূর্ণাংগ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল। হিরা এলাকার অধিবাসী অমুসলিমদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো তার ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

اَنْ لاَّ يُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلاَ كَنِيْسَةٌ وَلاَ قَصْرٌ مِّنْ قُصُوْرِهِمْ الَّتِيْ كَانُوْا يَتَحَصَّنُوْنَ اِذَا نَزَلَ بِهِمْ عَدُوٌّ لَّهُمْ وَلاَ يَمْنَعُوْنَ مِنْ ضَرَبِ النَّوَاقِيْسِ وَلاَ مِنْ اِخْرَاجِ الصُّلْبَانِ فِىْ عِيْدِهِمْ-

তাদের উপাসনালয় গীর্জা ধ্বংস করা হবে না। এমন কোন প্রাসাদ ধ্বংস করা হবে না শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে। নাকুস ও ঘন্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না। কোন পর্বের সময় ক্রুশ বের করতেও নিষেধ করা হবে না।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে হযরত আবু বকর (রা)-এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার-প্রসার। এই কল্যাণের কাজে ইসলামের প্রারম্ভ থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি নিমগ্ন ছিলেন। রোমান ও ইরানীদের মোকাবিলায় যেসব সৈনিক যাত্রা করেছিলো তিনি তাদেরকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সর্ব প্রথমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে। সুতরাং মুসান্নার প্রচেষ্টায় ইরাকে বনী ওয়ায়েল গোত্রের সমস্ত মূর্তিপূজক এবং খৃস্টান মুসলমান হয়ে যায়। হযরত

(১) কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ।

www.amarboi.org

খালিদ (রা)-এর আহবানে ইরাকের আরব অংশের অধিকাংশ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। যে তুলায়হা নিজেই নবুওয়াতের দাবীদার ছিল সেও ভুল স্বীকার করে এবং ঈমানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে পত্র দিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেন এবং তাকে মদীনা আসার অনুমতি দেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ইফতা বিভাগ কায়েম করা হয়। হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা), হযরত উবাই বিন কা'ব এবং হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুম এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা ছাড়া আর কারো ফতোয়া দানের অনুমতি ছিল না। হযরত উমর (রা)-এর সময়ও এই ব্যবস্থা চালু ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঋণ পরিশোধ করা ও তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করা খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত আবু বকর (রা) সর্ব প্রথম এই দায়িত্ব পালন করেন। উম্মুল মুমিনীন (রা)-দের আরাম ও সুযোগ–সুবিধার প্রতি তিনি গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজনদেরও অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। তাঁর খিলাফতকালে তিনি হযরত আলী (রা)-কে বলেছিলেন :

لَاَنْ اَصِلَ قَرَابَةَ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلٰى مِنْ اَنْ اَصِلَ قَرَابَتِىْ-

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করা আমার কাছে আমার নিজের আত্মীয়দের প্রতি উত্তম আচরণের চাইতে শ্রেয়।[১]

হযরত ফাতেমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা উত্তরাধিকার দাবী করলে হযরত আবু বকর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস لَا نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ- (আমরা নবীগণ কোন উত্তরাধিকার রেখে যাই না। যা রেখে যাই তা সাদকা) শুনিয়ে বললেন : আপনার পিতা তো উত্তরাধিকার বিষয়ে সমাধান রেখে গেছেন। আমি তাঁর নির্দেশ থেকে দূরে সরে যেতে পারি না। তবে আমার যে অর্থ-সম্পদ আছে তা সবই আপনার খেদমতে হাজির করতে পারি।

---

১. বুখারী

www.amarboi.org

অভ্যাস চরিত্র ও গুণাবলী

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিস্থিতি অনুধাবনের এমন ক্ষমতা ছিল তাঁর যে, তিনি কোন বিষয়ে যে মতামত দিয়েছেন তা গৃহীত হয়েছে। জ্ঞান ও মর্যাদায় অতুলনীয়, বক্তৃতা-বিবৃতিতে অনুপম এবং বংশ তালিকা জ্ঞানে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং ইসলামী জ্ঞানে তাঁর মর্যাদা ছিল সবার উর্ধে। তিনি বিচক্ষণতা ও ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট এবং অত্যন্ত জ্ঞানী প্রশাসক ও অভিজ্ঞ চিন্তাবিদ ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা) জন্মগতভাবেই প্রশংসনীয় গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। পবিত্রতা, খোদাভীরুতা, স্নেহশীলতা, সত্যবাদিতা ও দীনদারী ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও অতিথি বৎসল ছিলেন। বৈষয়িকতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ও খ্যাতির প্রতি ছিল তাঁর চরম ঘৃণা।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন নবী (স)-এর চরিত্রের পূর্ণাংগ প্রকাশ এবং ইবাদাত ও তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক। ইবাদাত-বন্দেগীর অবস্থা ছিল এই যে, কোন কোন সময় সারা রাত নামাযে কাটিয়ে দিতেন। প্রায়ই দিনের বেলা রোযা রাখতেন। নামাযে একাগ্রতা ছিল এমন যে, নামাযরত অবস্থায় তাঁকে প্রাণহীন কাষ্ঠখন্ডের মত মনে হতো। হৃদয়ের কোমলতা এমন ছিল যে, কাঁদতে কাঁদতে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো। কুরআন তিলাওয়াতের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো এবং তখন তিনি ফুঁপিয়ে অস্ফুট স্বরে এমনভাবে কাঁদতেন যে, আশে পাশে মানুষ জমে যেতো। একারণে তাঁকে أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (আওয়াহুম মুনীব) নামে আখ্যায়িত করা হতো।

পারিবারিক জীবনে হযরত আবু বকর (রা) স্ত্রী ও সন্তানদের ভাল-বাসতেন। তাঁর জীবন প্রণালী ছিল সাদামাটা। মোটা কমদামী বস্ত্র ব্যবহার করতেন। খাওয়া দাওয়াও খুব একটা জাঁকাল ও ব্যয়সাধ্য হতো না। খিলাফত লাভের পর এই আড়ম্বরহীনতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিলো। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অত্যন্ত ধনবান ছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। ফলে সম্বলহীনতা ও দারিদ্রের কারণে কখনো কখনো দুই তিন দিন অনাহারে কেটে যেতো। এমন সময়ও গিয়েছে যখন পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত জোটেনি। একটি মাত্র চাদর গায়ে জড়িয়ে নিতেন এবং তাও ঘুন্ডি বা তকমার পরিবর্তে কাঁটা দিয়ে আটকাতেন।

www.amarboi.org

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, গোটা মানব জাতির মধ্যে নবীদের পরে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আবু বকর (রা)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি প্রতিটি মানুষের আমার প্রতি কৃত ইহসানের প্রতিদান পৃথিবীতেই পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবু বকরের (রা) ইহসানের প্রতিদান এখনো আমার ওপর রয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান দিবেন। নবী (স) বলেন ঃ

اِنَّ مِنْ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِى صُحْبَتِهٖ وَمَالِهٖ اَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَ تَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً لٰكِنَّ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَمَوَدَّتَهٗ –

"বন্ধুত্ব ও অর্থের দ্বারা আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসানকারী হচ্ছে আবু বকর। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু তার সাথে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসাই যথেষ্ট।" (বুখারী)

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

خَيْرُ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا اَبُوْ بَكْرٍ رضـ ثُمَّ عُمَرَ رضـ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে উম্মতের মধ্যে সব চাইতে উত্তম হচ্ছেন আবু বকর (রা) এবং তাঁর পরেই উমর (রা)।"

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

www.amarboi.org

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইনতিকালের কয়েকদিন আগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সাহাবা কিরাম (রা)-এর পরামর্শে হযরত উমর (রা)-কে তাঁর খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন। তাই ১৩ হিজরীর ২৩শে জমাদিউস সানী সন্ধ্যার পর থেকে তিনি খিলাফতের মসনদের শোভা বর্ধন করেন। আল্লাহর রাসূলের খলিফা উপাধির পরিবর্তে আমীরুল মুমিনীন উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তী খলিফাদের জন্যও এই উপাধিই বহাল থাকে।

ব্যক্তিগত জীবন

নাম ছিল উমর (রা), উপাধি ছিল ফারুক এবং উপনাম ছিল আবু হাফ্স। পিতার নাম ছিল খাত্তাব, মায়ের নাম খাতামা। বংশধারা উর্ধতন নবম পুরুষ কা'ব পর্যন্ত গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সাথে মিশেছে।

হযরত উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের ১৩ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়সও নবী (স)-এর বয়সের মত ৬৩ বছর ছিল। নবুওয়াতের সপ্তম বছরে ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সর্বমোট উনচল্লিশজন পুরুষ ও এগার জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গাত্র বর্ণ ছিল ঈষৎ রক্তিম, মাথা ভাঁজ বিশিষ্ট, গাল স্বল্প মাংসল, দাড়ি ঘন, মোচের দুই প্রান্ত বড় বড় এবং দেহ দীর্ঘকায় ছিল। শত শত লোকের মাঝে দাঁড়ালেও সব চাইতে উঁচু দেখা যেতো।

জাহেলী যুগে হযরত উমর (রা)-এর পরিবার ছিল বিশিষ্ট ও সর্বজন পরিচিত। তিনি ছিলেন কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্যতম। বংশ পরিচয়, সৈনিকবৃত্তি, পাহলোয়ানী ও ঘোড়সওয়ারীতে ছিলেন সুদক্ষ। লেখাপড়া জানতেন। কাব্য ও কাব্যিকতার প্রতি আকর্ষণ ছিল। ব্যবসায় উপলক্ষে বহু দূরবর্তী দেশসমূহে ভ্রমণ করেছিলেন। সেজন্য তাঁর মধ্যে দূরদর্শিতা, উদারতা ও অভিজ্ঞতার গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছিলো। জাহেলী যুগে দূতিয়ালির দায়িত্বও পালন করতেন।

হযরত উমর (রা) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও শক্তিমান পুরুষ। মেজাজে ছিল কঠোরতা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কুফরের পক্ষে যেমন কঠোর ছিলেন,

www.amarboi.org

ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের পক্ষেও ঠিক তেমনি কঠোর ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি মু'জিযা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার প্রান্তরে সত্যের আওয়াজ সমুন্নত করলে হযরত উমর (রা) ও তাঁর মামা আবু জেহেল কঠোর বিরোধিতা শুরু করে। ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ওপর তার প্রভাব পড়তে থাকে। এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الْاِسْلَامَ بِاَحَدِى الرَّجُلَيْنِ اِمَّا ابْنِ هِشَامٍ وَاَمَّا عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ

"হে আল্লাহ, তুমি আবু জেহেল ও উমর এই দুই ব্যক্তির যে কোন একজনকে দিয়ে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও।"[১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দোয়া হযরত উমর (রা)-এর অনুকূলে কবুল হয়েছিলো। আল্লাহর ইচ্ছা তাকে ধীরে ধীরে নবী (স)-এর দরবারে পৌঁছিয়ে দেয়। একদিন আবু জেহেলের উস্কানিতে হযরত উমর (রা) উন্মুক্ত তরবারি হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। (নাউযুবিল্লাহ) এটা ছিল সেই সময়ের ঘটনা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরকাম (রা)-এর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কা'বার প্রাঙ্গনে নামায পড়াও মুসলমানদের জন্য সম্ভব ছিল না। রাস্তায় নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ নামে এক সাহাবীর সাথে হযরত উমর (রা)-এর সাক্ষাত হয়। তার ভাবভঙ্গি দেখে নাঈম ইবনে আবদুল্লাহর (রা) কিছুটা সন্দেহ হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ উমর কোথায় যাচ্ছ ? তিনি জবাব দেন ঃ তোমাদের নবীকে হত্যা করতে যাচ্ছি। নাঈম বললেন ঃ প্রথমে নিজের ঘরের খোঁজ নাও। তোমার বোন ফাতেমা (রা) এবং তোমার ভগ্নিপতি সাইদ বিন যায়েদ দুইজনেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ খবর পেয়ে তিনি বোনের বাড়ীতে গেলেন। বোন কুরআন মজীদের কোন সূরা পড়ছিলেন। আভাস পেয়েই সূরার লিখিত পৃষ্ঠাগুলো লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু উমরের কানে গুন গুন শব্দ পৌঁছে গিয়েছিলো। তিনি তাঁর বোন ও ভগ্নিপতিকে এত প্রহার করলেন যে, তাদের মাথা থেকে রক্ত বের হতে থাকলো। তিনি ভগ্নিপতিকে মাটিতে ফেলে তাকে গলা টিপে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। এ অবস্থা দেখে বোন সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে বললেন ঃ ভাইজান, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। ইসলামকে এখন আর মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

---

১. তিরমিযী, পৃষ্ঠা—১২

www.amarboi.org

বোনের একথা তাঁর মনের ওপর বেশ প্রভাব ফেলে। তিনি তাঁর ভগ্নিপতিকে ছেড়ে দিয়ে বোনকে বলেন ঃ তুমি যা পড়ছিলে তা আমাকে শুনাও। ফাতেমা (রা) তাঁর সম্মুখে কয়েকটি লিখিত পাতা পেশ করেন। পাতাগুলোতে সূরা ত্বা-হা'র কয়েকটি আয়াত লিপিবদ্ধ ছিল। আয়াতগুলো পড়ামাত্র হযরত উমরের (রা) মধ্যে বিরাট বিপ্লব শুরু হয়। যে মগজে এতদিন ছিল কুফরের অধিবাস তা এখন ইসলামের খুশবুতে আমোদিত হয়ে উঠলো এবং তিনি অবিলম্বে নবীর সান্নিধ্যে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। খুশীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে অকস্মাত তাকবীর ধ্বনি উচ্চারিত হলো। মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনিতে মক্কার সমস্ত পাহাড়-পর্বত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

হযরত উমর (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি কাফেরদেরকে একত্রিত করে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে ফারুক উপাধিতে ভূষিত হলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, এখন থেকে কা'বায় প্রকাশ্যে নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর (রা)-এর এই আবেদন গ্রহণ করলেন এবং মুসলমানদের সারিবদ্ধভাবে দুটি দলে বিভক্ত করে তাদের সাথে নিয়ে খানায়ে কা'বায় গিয়ে প্রকাশ্যে নামায আদায় করলেন। দুটি দলের একটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত উমর (রা) এবং অপরটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা)।

হযরত উমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম প্রচারের গতি তুলনামূলকভাবে তীব্র হয়ে ওঠে এবং ইসলামের শক্তি ও গৌরব বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের বিজয়, তাঁর হিজরত ছিল আল্লাহর সাহায্য এবং তার খিলাফত ছিল আল্লাহর রহমত।

মদীনায় হিজরতের সময় কাফেরদের দুর্ব্যবহার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানরা সাধারণত নীরবে বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু উমর (রা) অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে হিজরত করেছিলেন। অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বায়তুল্লায় গিয়ে তাওয়াফ করেছেন, নামায পড়েছেন এবং কাফেরদের সমাবেশে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, আমি মদীনায় চলে যাচ্ছি। যে তার মাকে তার শোকে কাঁদাতে চায় সে যেন এই উপত্যকার ওপ্রান্তে আমার মোকাবিলা করে। কিন্তু কেউ-ই তাঁকে বাধা দিতে সাহস পায়নি। হযরত উমর (রা) নিরাপদে মদীনায় উপনীত হন।

www.amarboi.org

তিনি সবগুলো যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং অতীব মূল্যবান অবদান রাখেন। তিনি অহী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি তাঁর কন্যা হাফসা (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে তিনি তাঁর উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী ছিলেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর খলিফা নির্বাচিত হন। দেশ জয়, সংস্কার এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে তাঁর যুগ পরবর্তী সকল যুগের চেয়ে উত্তম ও উন্নত ছিল।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এবং পরে ব্যবসায়-বাণিজ্যই ছিল জীবিকা অর্জনের মাধ্যম। খিলাফত লাভের কয়েক বছর পর খিলাফতের কাজে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। হযরত আলী (রা) এবং অন্য বড় বড় সাহাবা কিরামের (রা) পরামর্শে মাত্র আটশ দিরহাম প্রায় দুইশ টাকা বাৎসরিক ভাতা গ্রহণ করতে সম্মত হন। ১৫ হিজরীতে বায়তুল মাল থেকে যখন সবার জন্য বাৎসরিক ভাতা নির্ধারিত হয় তখন বড় বড় সাহাবীদের মত হযরত উমর (রা)-এর জন্যও পাঁচশ দিরহাম ভাতা নির্ধারিত হয়।

হযরত উমর (রা) কয়েকটি বিয়ে করেন। অধিকাংশ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সন্তানদের মধ্যে তিনজন অর্থাৎ আবদুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ ও আসেম থেকে বংশধারা চলতে থাকে। এক কন্যা অর্থাৎ হযরত হাফসা (রা)-এর বিয়ে হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে। শেষ বয়সে নবী (স) পরিবারের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অধিক মর্যাদা লাভের আকাংখায় হযরত আলীর (রা) কাছে তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুম বিনতে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিয়ে করার আবেদন জানান। হযরত আলী (রা) কন্যার স্বল্প বয়সের কারণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন ঃ শুধু মর্যাদা লাভই আমার উদ্দেশ্য[১]। এতে হযরত আলী (রা) সম্মত হন। ১৭ হিজরীতে চল্লিশ হাজার দিরহাম মোহরানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্রীর সাথে হযরত উমরের (রা) বিয়ে হয়।

---

১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা—১৭৩,

عن جابر رض انه سمع عمر بن الخطاب رض يقول للناس حين تزوج بنت على رض الا تهنؤا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينقطع يوم القيمة كل نسب و نسب الا نسبى و نسبى- رواه الطبرنى- ولرجال ثقات -

www.amarboi.org

খিলাফতে ফারুকী

২৩শে জমাদিউসসানী, ১৩ হিজরী থেকে ২৬ যিলহজ্জ ২৩ হিজরী
২৪শে আগষ্ট ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ৩রা নভেম্বর, ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ।

চুক্তিপত্র অনুসারে হযরত আবু বকরের (রা) ইনতিকালের পর হযরত উমর ফারূক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হন। খিলাফত লাভের পর যে খুতবা দেন তা শুরু করেন নিম্নোক্ত দোয়া দিয়ে ঃ

اللهم انى ضعيف فقونى اللهم انى غليظ فلينى اللهم انى نخيل فسخى -

হে আল্লাহ আমি দুর্বল, আমাকে শক্তিশালী বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ, আমি রূঢ় আমাকে কোমলতা দান করো। হে আল্লাহ, আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল বানিয়ে দাও।[১]

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতের শেষভাগে হযরত খালেদের (রা) বাহিনী ইয়ারমুকের প্রান্তরে যুদ্ধরত ছিল এবং মুসান্নার (রা) বাহিনী ইরাকে তাঁবু পেতে অবস্থান করছিল। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করা মাত্র হযরত উমর (রা)-কে এই অভিযানের প্রতি মনযোগ দিতে হয়।

হযরত উমরের (রা) বিজয়সমূহ

সিরিয়া ঃ সিরিয়ায় ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলছিলো। এই সময় হযরত আবু বকর (রা) ইনতিকাল করেন। ফারূকে আযম হযরত উমর (রা) হযরত খালেদ সাইফুল্লাহ (রা)-কে পদচ্যুত করেন এবং তদস্থলে আমীনুল উম্মাত হযরত আবু উবায়দাকে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। তিনি এ সিদ্ধান্তের যে কারণ বর্ণনা করেন তাহচ্ছে ঃ আমি খালেদ[২] (রা) কে ক্রোধ কিংবা অপরাধের কারণে পদচ্যুত করিনি বরং অতি মাত্রায় সাহসী হওয়ার কারণে পদচ্যুত করেছি। তিনি ছিলেন অস্থির চিত্ত[৩] যার কারণে মানুষের খুব কষ্ট হতো। হযরত খালেদ তাঁর পদচ্যুতির কথা জানতে পারলেন। কিন্তু এ ঘটনায় তিনি মোটেই প্রভাবিত হলেন না।

---

১. ইবনে সা'দ তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা—১৯৭

২. হযরত খালেদ (রা) ষাট বছর বয়সে ২১ হিজরীতে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে ইনতিকাল করেন। তিনি প্রায় একশটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শরীরের কোন জায়গাই জখম শূন্য ছিল না। যে যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন সেই যুদ্ধেই মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেছেন।

৩. হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে মালেক বিন নুয়াইরা যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তাকে হুশিয়ার করে দেয়ার জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু মৌখিকভাবে সতর্ক করার পূর্বেই তিনি হঠকারিতা করে তাকে হত্যা করেন। অথচ পরে জানা যায় যে, সে তওবা করতে প্রস্তুত ছিল। খলিফার দরবারে এ খবর পৌছলে হযরত খালেদ (রা) কঠোরভাবে তিরস্কৃত হন। তবে তাঁর পদ মর্যাদা বহাল রাখা হয়। (মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান)

www.amarboi.org

তবে হযরত আবু উবায়দাকে বললেন ঃ আপনিই সেনাধ্যক্ষ। কিন্তু এখন বিষয়টি প্রকাশ না করাই যুক্তিসংগত। অন্যথায় সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তাই করা হলো। কোন এক ব্যক্তি খালেদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, পদচ্যুতির খবর শুনে আপনার আক্রমণের প্রচন্ডতায় তো সামান্য পার্থক্যও দেখা যাচ্ছে না। তিনি জবাব দিলেন, "আমি আল্লাহর জন্য লড়াই করছি, উমর (রা)-এর জন্য নয়।"

ইয়ারমুকের ময়দানে রোমানরা মারাত্মক পরাজয় বরণ করে। এরপর খলিফার পক্ষ থেকে দামেশকের ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ আসে। কারণ, সেটাও সিরিয়ারই অংশ। হযরত আবু উবায়দা (রা) তাঁর গোটা বাহিনীকে অনেকগুলো ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে দামেশকের ওপর আক্রমণ চালান এবং শহর অবরোধ করেন। ১৭ দিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত হযরত খালিদ (রা) সুকৌশলে ১৪ হিজরীতে তা দখল করে নেন এবং হযরত উমর (রা)-কে বিজয়ের খবর প্রেরণ করেন। এরপর ফাহল, মুরজ, রোম, হিমৃস, কানসারীন, হালব (আলেপ্পো) এবং ইনতাকিয়ার যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধেও মুসলমানরা বিজয় লাভ করে এবং সবগুলো এলাকাই মুসলমানদের অধিকারে আসে।

কানসারীন বিজয়ের সময় হিরাক্লিয়াস ইনতাকিয়ায় অবস্থান করছিলেন। ক্রমাগত পরাজয়ের খবরে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে কনষ্টান্টিনোপল চলে যান। সেখানে মুসলমানদের হাত থেকে পালিয়ে আসা একজন রোমানের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। কাইজার তাঁর কাছে মুসলমানদের অবস্থা জানতে চাইলে সে বলে ঃ

"হে বাদশাহ, তারা দিনের বেলা দুর্ধর্ষ সৈনিক এবং রাতের বেলা রাত জাগা খোদাভীরু দরবেশ। বাদশাহর পুত্র চুরি করলেও তারা তার হাত কেটে ফেলে এবং কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে পাথর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করে। ন্যায় ও সত্যের পক্ষাবলম্বন তাদের স্থায়ী নীতি। তারা তাদের হাতে পরাজিত লোকদের মালও মূল্য পরিশোধ না করে গ্রহণ করে না। তারা যে দেশেই প্রবেশ করে সে দেশেই নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাথে নিয়ে যায়। কিন্তু যে জাতিই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে অস্ত্র ত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা তাদেরকে ছাড়ে না।" কাইজার বললো ঃ এই যদি মুসলমানদের পরিচয় হয় তাহলে তারা আমার পায়ের নীচের এলাকা পর্যন্তও দখল করে নেবে।

এসব বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দা (রা) বিজিত এলাকাসমূহে কর্মচারী নিয়োগ করলেন এবং সাথে সাথে মায়সারা ইবনে মাসরুক এবং মালেক ইবনে হারেসের নেতৃত্বে একটি বাহিনী এশিয়া মাইনরের দিকে প্রেরণ

www.amarboi.org

করলেন। সেখানে রোমান ও খৃস্টান আবরদের সাথে যুদ্ধ হলো এবং সে যুদ্ধেও মুসলমানরা বিজয় লাভ করলো। হযরত খালেদের (রা) নেতৃত্বে আরেকটি সেনাদল মারআশ অভিমুখে যাত্রা করে এবং সে এলাকাও বিজিত হয়।

মুরজে রুম ও বায়সান বেদখল হওয়ার পর কাইজার আরতাবুন নামক অত্যন্ত চালাক ও ধূরন্ধর এক জেনারেলের নেতৃত্বে সিরিয়ার অবিশিষ্ট এলাকা রক্ষার জন্য একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। আরতাবুন একটি সেনাদল রামলায় মোতায়েন করে কিছু সৈন্য বায়তুল মুকাদ্দাস রক্ষার জন্য সেখানে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য আজনাদাইন নামক স্থানে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। হযরত উমর (রা)-কে বিষয়টি অবহিত করা হলে তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, রোমান আরতাবুনের মোকাবিলার জন্য আরবী আরতাবুন অর্থাৎ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) যাবেন। তাই জর্দানে অবস্থানরত আমর ইবনুল আস (রা) সেনাবাহিনী সহ আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হন এবং আলকামা ইবনে হাকীম ফারাসী ও মাসরূক মক্কীকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে এবং আবু আইয়ুব মালেকীকে রামলার দিকে প্রেরণ করেন।

আজনাদাইনে প্রচন্ড যুদ্ধ হয় এবং আরতাবুন পরাজিত হয়। আজনাদাইন বিজয়ের পর আমর ইবনুল আস (রা) বিভিন্ন যুদ্ধে গাজা, সাতিয়া, নাবলুস, লুদ, আমওয়াস, বৈরুত, হিবরুন ও ইয়াফা দখল করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সেখানে পৌছে তিনি সৈন্যদেরকে চারদিকে ছড়িয়ে দেন। ঠিক এই সময়েই আবু উবায়দা (রা) এবং খালেদ (রা) ও বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে উপনীত হন।

হযরত আবু উবায়দা (রা) ইসলামী রীতি অনুসারে কুদসের অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় মুসলিম বাহিনী কুদুস অবরোধ করে ফেলে। আরতাবুন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মিসরে পালিয়ে যায়। অবরোধের প্রচন্ডতায় বাধ্য হয়ে কুদসের অধিবাসীরা সন্ধি করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু শর্ত আরোপ করে যে, আমীরুল মুমিনীনকে এসে নিজ হাতে সন্ধিপত্র লিখতে হবে। হযরত উমর (রা)-কে এ বিষয়ে অবগত করা হলে তিনি বড় বড় সাহাবীর সাথে পরামর্শ করে হযরত আলীকে (রা) মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং ১৬ হিজরীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে যাত্রা করেন।

হযরত উমর (রা) অত্যন্ত অনাড়ম্বরপূর্ণ ভাবে মদীনা থেকে যাত্রা করে জাবিয়া পৌছেন। এখানে অফিসাররা তাঁকে স্বাগত জানান। দীর্ঘ সময় সেখানে

www.amarboi.org

অবস্থান করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সন্ধি চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করেন। অতপর সেখান থেকে যাত্রা করে মূল শহরে প্রবেশ করেন এবং মসজিদে আকসায় হাজির হন। দুই রাকআত তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করেন। সেখানেই অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে ফজরের নামায পড়েন। সাখরার পাশে মসজিদ নির্মাণের জন্য আদেশ দেন। এ মসজিদই বর্তমানে মসজিদে উমর (রা) নামে খ্যাত। একদিন হযরত উমর (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসের গীর্জা পরিদর্শনে যান। সেখানেই নামাযের সময় হলে পোপ গীর্জার আঙিনাতেই তাঁকে নামায পড়ার অনুমতি দেন। কিন্তু এ ঘটনাকে দলীল হিসেবে পেশ করে ভবিষ্যত প্রজন্ম খৃস্টান উপাসনালয়টিতে হস্তক্ষেপ করে বসতে পারে সেজন্য হযরত উমর (রা) সেখানে নামায না পড়ে গীর্জার বাইরে নামায পড়েন।

বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত উমর (রা) গোটা দেশ সফর করেন। সীমান্তসমূহ পরিদর্শন করে দেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং সুস্থ শরীরে নিরাপদে মদীনা ফিরে আসেন।

১৬ হিজরীতে রামলা বিজিত হয়। এই সময় হযরত উমর (রা) ফিলিস্তিনকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসকে একাংশের রাজধানী করে আলকামা ইবনে মুখবারেযকে সেখানকার গভর্ণর নিয়োগ করেন এবং অপরাংশের রাজধানী করেন রামলাকে এবং সেখানকার গভর্ণর নিয়োগ করেন আলকামা ইবনে হাকীমকে।

১৭ হিজরীতে রোমানরা হিমসের ওপর প্রচণ্ড হামলা করে ব্যর্থ হয়। এরপর মুসলিম বাহিনী জাযিরা (ফোরাত ও দজলা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) তাকরীব, মুসেল, রিক্কা, নাসীবাইন, হাররান, সামিয়াত, কারাকসা, সুরুজ, জাসরে আসাদ এবং অন্যান্য এলাকার বিরুদ্ধে মামুলি ধরনের যুদ্ধের পর তা দখল করে নেন। অতপর আরো অগ্রসর হয়ে পশ্চিমে সিরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং পূর্বে আর্মেনিয়া ও কুর্দিস্তান পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হন। দারব এবং বালীস এলাকা দখল করেন এবং সাফল্যের ঝাণ্ডা উড্ডীন করে খালাত ও আইনে হামেদা পর্যন্ত গিয়ে থামেন। এভাবে গোটা সিরিয়া মুসলমানদের দখলে চলে আসে।

মিসর (আফ্রিকা) ঃ মিসর রাজনৈতিকভাবে রোমের বাদশাহ কাইজারের শাসনাধীন ছিল। সেখানকার শাসক ছিলেন মুকাওকিস। তিনি ছিলেন কিবতীদের ধর্মীয় ও পার্থিব নেতা। জাহেলী যুগে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) মিসর ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর মিসর আক্রমণের খুব আগ্রহ ছিল। অতএব তিনি ১৮ হিজরীতে হযরত উমর (রা)-এর নিকট থেকে মিসর

www.amarboi.org

দখলের অনুমতি গ্রহণ করেন এবং চার হাজার সৈন্য নিয়ে মিসর আক্রমণ করেন। ফারমা, বালীলিস, উম্মে ওয়ানীন প্রভৃতি দখল করে ফুসতাতের নিকটবর্তী দুর্গ অবরোধ করেন এবং হযরত উমর (রা)-কে আরো সামরিক সাহায্য প্রেরণের জন্য লিখে পাঠান। হযরত উমর (রা) যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা), উবাদা ইবনে সামেত (রা), মিকদাদ ইবনে উমর এবং সালামা ইবনে মাখলাদ (রা) এই চারজন অফিসারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেন। সাত মাস অবরোধের পর হযরত যুবায়ের (রা)-এর অসাধারণ বীরত্বের ফলে ১৯ হিজরীতে দুর্গটির পতন ঘটে এবং মুকাওকিসের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। ইসলামী বাহিনী সেখান থেকে ২০ হিজরীতে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিবতী ও রোমান সৈন্যদের সাথে মারাত্মক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রোমানরা পরাজিত ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়া অধিকারে আসার পর সমগ্র মিসরের ওপর ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং বহু সংখ্যক কিবতী স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করে। অবশিষ্ট অধিবাসীরা জিযিয়া দিতে সম্মত হয়।

২২ হিজরীতে আমর ইবনুল আস (রা) বারকার দিকে অগ্রসর হলে সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর তিনি পশ্চিমে তারাবেলসের দিকে অগ্রসর হন। এক সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর তাও অধিকারে আসে।

ইরাক ও ইরান ঃ হযরত আবু বকরের (রা) বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ইরাকে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক মুসান্না (রা) মদীনায় আগমন করেছিলেন। সেই সময়ই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ইনতিকাল করেন। অতপর হযরত উমর ফারুক (রা) খলিফা হন। খিলাফতের বাইআতের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য লোকজন মদীনায় এসে সমবেত হয়েছিলো। সাধারণভাবে মনে করা হতো যে, ইরাক পারস্য সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তা বিজিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এ কারণে হযরত উমর (রা)-কে বিশেষভাবে ইরাক অভিযানের প্রতি মনযোগ দিতে হয়। তিনি পরপর কয়েকদিন জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করে মুসলমানদেরকে ইরানীদের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ইরান বিজয় সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর আহবানে সর্ব প্রথম সাড়া দেন আবু উবায়েদ সাকাফী (রা)। অতপর একটি বিশাল জনতা ইরানের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সুতরাং আবু উবায়েদের (রা) নেতৃত্বে একটি নতুন বাহিনী গঠিত হয়। এ বাহিনীতে বহু সংখ্যক সাহাবীও অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী হযরত

www.amarboi.org

সাবীত (রা)ও এ বাহিনীতে ছিলেন। মুসান্না (রা) অনতিবিলম্বে ইরাক যাওয়ার নির্দেশ পেলেন। পরপরই আবু উবায়েদের (রা) বাহিনীও রওয়ানা হলো। দুইজন সেনাধ্যক্ষই নিজ নিজ বাহিনী সাথে নিয়ে নামারেকে গিয়ে একত্রিত হলেন। ইরানীরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ইরানী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রুস্তম জাবানকে মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। জাবান পরাজিত হয়। প্রচুর গণিমতের মাল হস্তগত হয়। বন্টনের অবকাশ পাওয়ার আগেই ইরানের বাদশাহর খালাতো ভাই নারসী শাহ মোকাবিলা করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেও পরাজয় বরণ করে। এরপর জালবূসের নেতৃত্বে অপর একটি ইরানী বাহিনী মোকাবিলার জন্য এসে পৌঁছে। মুসলিম বাহিনী তাকেও পরাজিত করে। এ তিনটি যুদ্ধ শেষে গনিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বন্দীদের সহ রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অবশিষ্ট সম্পদ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

একের পর এক এসব পরাজয়ের খবর ইরান সম্রাজ্ঞী পূরানদাখতের কাছে পৌঁছলে তিনি বাহমান জাদুকে ত্রিশ হাজার সৈন্য এবং তিন হাজার হাতীসহ মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। উভয় বাহিনী ফোরাত নদীর উভয় তীরে সমবেত হয়। অসীম সাহসে ভর করে আবু উবায়েদ (রা) পুল পার হয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ৯ হাজার সৈনিকের মধ্যে ৬ হাজার সৈনিক শাহাদাত লাভ করেন। আবু উবায়েদ (রা) নিজেও আহত হন। শত্রু পক্ষেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়। ২৩ হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত এই যুদ্ধ ওয়াক'আতুল জাসার নামে পরিচিত। মদীনায় এই ঘটনার খবর প্রেরণ করা হলে হযরত উমর ফারুক (রা) মুসান্নার (রা) অধীনে কাজ করার জন্য চার হাজার সৈন্য দিয়ে হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ বাজালীকে ইরাক প্রেরণ করেন। এই সময় ইরানী বাহিনীর সেনাপতি ছিল মাহরান বিন মাহরাবিয়া। পুনরায় উভয় বাহিনী টাইগ্রীস নদীর উভয় তীরে সমবেত হয়। এবার ইরানীরাই নদী পার হয়ে মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হয়। ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শত্রু বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলমানদের চেয়ে দশগুণ অধিক। কিন্তু মুসলমানরাই বিজয় লাভ করে। মাহরান নিহত হয়। এ যুদ্ধ ইয়াওমুল আশার নামে পরিচিত।

১৫ হিজরীর সূচনাতে যে ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয় তা কাদেসিয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবীর উক্তি অনুসারে ফারুকে আযম হযরত উমর (রা)-এর প্রচেষ্টায় এই যুদ্ধে কুফর ও ইসলামের মধ্যকার বিরাট পার্থক্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ইসলামী বিজয় সমূহের খবর মাদায়েনে পৌঁছলে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, নারীর স্থলে কোন

www.amarboi.org

পুরুষকে সিংহাসনে বসাতে হবে। অতএব নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভেদের অবসান ঘটিয়ে সম্রাজ্ঞী পূরানদাখতকে ইরানের সিংহাসন থেকে অপসারণ করা হয়। তার স্থানে ইরানী রাজকুমার ইয়াযদগির্দকে সিংহাসনে বসানো হয়। যিনি ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী ও সাহসী যুবক। তিনি ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি সীমান্ত চৌকি ও দুর্গসমূহ মজবুত করেন। যুদ্ধাস্ত্র সমূহের সংস্কার করেন এবং সেনাবাহিনীতে নতুন লোক ভর্তির জন্য অঢেল অর্থ ব্যয় করেন। এ উদ্দেশ্যে পুরনো রাজ কোষাগার উন্মুক্ত করে দেন। এভাবে ইরানী সরকারের মধ্যে যেন এক নতুন প্রাণ স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। ইরানের বহু বিজিত এলাকা মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। রুস্তম নিজে দুই লাখ লড়াকু সৈন্য এবং বিপুল সংখ্যক হাতী নিয়ে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করে সাবাত নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। হযরত উমর (রা)-কে এ খবর জানানো হলে তিনি মুসলিম বাহিনীকে ইরাকের সব এলাকা থেকে আরব সীমান্তে এসে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। সুতরাং মুসান্না (রা) তার সমস্ত সৈন্য নিয়ে যী-কার নামক স্থানে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা) ও ব্যাপক প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। তিনি সকল গভর্ণরের কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠান যে, যেখানেই যুদ্ধক্ষম যুবক, সুদক্ষ সৈনিক এবং অভিজ্ঞ সামরিক অফিসার আছে তারা যেন অনতিবিলম্বে রাজধানীতে পৌঁছে যায়। এরপর মানুষ দলে দলে মদীনায় পৌঁছতে শুরু করে। মদীনার সর্বত্র শুধু সৈন্যই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। ফারূকে আযম হযরত উমর (রা)-এর নিজেরই যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরামর্শ গ্রহণের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে ইরানের বিরুদ্ধে এই অভিযানের সেনাধ্যক্ষ করা হবে।

হযরত সা'দ (রা) রওয়ানা হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই মারহার যুদ্ধে আহত হযরত আবু উবায়েদের ইনতিকালের খবর এসে পৌঁছলো। হযরত সা'দ মুসলিম বাহিনী নিয়ে কাদেসিয়া পৌঁছলেন এবং হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশ মোতাবেক মোর্চা তৈরী করলেন। হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশ ছিল, মোর্চা এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন সম্মুখে থাকে আজমের (অনারব) নিম্নভূমি এবং পেছন দিকে পাহাড় যাতে বিজয় লাভের ক্ষেত্রে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যায় এবং ভিন্ন কিছু হলে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া যায়। হযরত সাদ (রা)-এর বাহিনীর সর্বমোট সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। তাদের মধ্যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৯৯ জন সাহাবীসহ মোট এক হাজার সাহাবী (রা) ছিলেন। এ যুদ্ধের জন্য হযরত উমর (রা) অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের জন্য তিনি ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তে শুরু করেন।

www.amarboi.org

ইসলামী জিহাদের নিয়মানুসারে হযরত সা'দ (রা) বিশিষ্ট নেতাদের একটি প্রতিনিধি দলকে নু'মান ইবনে মাকরানের নেতৃত্বে ইরানের বাদশাহ ইয়াযদগির্দের দরবারে প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ অত্যন্ত নির্ভীক-চিত্তে সৌজন্যবোধের সাথে ইয়াযদগির্দের সামনে তিনটি বিকল্প বিষয় গ্রহণের জন্য পেশ করেন। অর্থাৎ ইসলাম, জিযিয়া ও যুদ্ধ। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অযৌক্তিক জওয়াব দেন। এমনকি বলেন যে, দূতদের হত্যা করা আন্তর্জাতিক রীতিনীতির পরিপন্থী না হলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। তোমাদের মোকাবিলার জন্য আমি রুস্তমকে লিখছি। সে তোমাদেরকে ও তোমাদের সঙ্গী সাথীদেরকে কাদেসিয়ার গর্তসমূহের মধ্যে দাফন করবে। মোট কথা প্রতিনিধিদল ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। এ ঘটনার পর উভয় পক্ষই কয়েক মাস পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকে। রুস্তম সাবাত নামক স্থানে অবস্থান করছিলো। ইয়াযদগির্দের তাগাদা সত্ত্বেও সে যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে থাকে। অবশেষে বাধ্য হয়ে রুস্তম তার বাহিনী নিয়ে মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়ে কাদেসিয়ার প্রান্তরে গিয়ে পৌছে।

কাদেসিয়ায় পৌছার পরও রুস্তম যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা চালাতে থাকে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দূতদের আসা যাওয়া অব্যাহত থাকে। কিন্তু মুসলমানদের শেষ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল এটাই যে, ইসলাম কিংবা জিযিয়া গ্রহণযোগ্য না হলে তরবারির মাধ্যমেই ফয়সালা হবে। সন্ধির সমস্ত প্রচেষ্টা ও কৌশল ব্যর্থ হলে রুস্তম ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি শপথ করে বললেন ঃ সূর্যের শপথ ! এখন আমি সমগ্র আরবকে ধ্বংস করে ফেলবো। রুস্তম তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন এবং নিজে সারা রাত জেগে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকলেন। সকাল বেলা কাদেসিয়া প্রান্তরে অনারব সৈন্যদের দ্বারা এমনভাবে ভরে উঠলো যে তা মানুষের সমুদ্র বলে মনে হতে লাগলো। পেছনে ছিল পাহাড়ের মত হাতীর দল যা এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সৃষ্টি করছিলো। রাজধানী মাদায়েন থেকেও সৈন্যদের আগমনের ধারা অব্যাহত রইলো। অপরদিকে মুজাহিদদের মজবুত বাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছিলো। সায়েটিকা রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে হযরত সাদ (রা) নিজে যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারলেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্রের সন্নিকটেই একটি প্রাসাদ ছিল। তিনি তার ছাদে বসে নির্দেশ দিতে থাকলেন। খালেদ বিন আরফাতা তাঁর নির্দেশনা অনুসারে সেনাবাহিনী পরিচালনা করছিলেন।

যোহরের নামায শেষ করে হযরত সা'দ (রা) তিনবার তাকবীর বললেন। চতুর্থ তাকবীর বলতেই ইসলামী বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হলে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সারা দিন যুদ্ধ চললো। ইতিহাসে এ দিনটিকে 'ইয়াওমুল আমারিস'

www.amarboi.org

বলা হয়। দ্বিতীয় দিন ইরানীরা পুনরায় হামলা করলো। প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। ইরানীদের বড় বড় নেতা নিহত হলো। এদিনকে 'ইয়াওমুল আগওয়াস' বলা হয়। তৃতীয় দিনও ভয়ানক যুদ্ধ হলো। এভাবেই গোটা দিন কেটে গেল। এই দিনকে 'ইয়াওমুল আমাস' বলা হয়। সারারাতও যুদ্ধ চললো। এই রাত 'লাইলাতুল হারীর' নামে পরিচিত। লড়াই চলতে চলতে সকাল হয়ে গেলে কয়েকজন মুসলমান অত্যন্ত বীরত্বের সাথে সিংহাসনে বসে লড়াইরত রুস্তমের দিকে অগ্রসর হয়। তিনি যখন দেখলেন যে, মুসলমান আক্রমণকারীরা একেবারে কাছে এসে পৌছে গেছে তখন সিংহাসন থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েন এবং বীর পুরুষের মত লড়াই করতে থাকেন। কিন্তু আঘাতে আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়লে পালিয়ে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন যাতে সাতরিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু হেলাল নামক একজন সৈনিক তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে এবং নদী থেকে টেনে ওপরে তুলে এনে তরবারীর আঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করে। রুস্তমের জীবনাবসানের সাথে সাথে ইরান সাম্রাজ্যের ভাগ্যরবিও অস্তমিত হয়। ইরানী সৈনিকরা এরপর পালাতে থাকে। মুসলমানরা বহুদূর পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করে। প্রায় ত্রিশ হাজার ইরানী নিহত হয় এবং আট হাজার মুসলমান শহীদ হন। ইরানীদের সাথে মুসলমানদের আশিটি যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধের মধ্যে কাদেসিয়ার এই যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়াবহ ও গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত সা'দ (রা) হযরত ফারুকে আযমের কাছে বিজয়ের সুসংবাদের সাথে সাথে গনিমতের একপঞ্চমাংশও পাঠিয়ে দেন এবং লিখেন যে, কাদেসিয়ায় মুসলিম বাহিনী আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। হযরত উমর (রা)-এর পক্ষ থেকে ইরানের রাজধানী মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ আসলে মুসলিম বাহিনী মাদায়েনের দিকে যাত্রা করে। কাদেসিয়া থেকে পালিয়ে আসা ইরানী সৈন্য বাবেলে সম্মিলিত হয়ে মোকাবিলা করে পরাজিত হয়।

মাদায়েন ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত শহর। সেখানে কিসরার জাঁকালো দরবার মহল ও রাজপ্রাসাদ ছিল। ১৬ হিজরীতে মুসলমানরা পূর্ণ তিন মাস অবরোধ করে রাখার পর তা দখল করে নেয়। ইয়াযদগির্দ তার পরিবার পরিজনসহ হুলওয়ানে পালিয়ে যায়। ইসলামী বাহিনী মাদায়েনে প্রবেশ করে সফেদ মহলে ইসলামী পতাকা উত্তোলন করে। ইরানের সমস্ত ধন-সম্পদ মুসলমানদের দখলে আসে। ফারুকে আযম হযরত উমর (রা)-এর দরবারে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ সহ বিজয়ের সুসংবাদ প্রেরণ করা হয়। হযরত সা'দ (রা) ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) মুসলিম বাহিনীর সাথে শাহী দরবার মহলে নামায আদায় করেন।

www.amarboi.org

ইরানীরা মাদায়েন থেকে পালিয়ে গিয়ে জালূলাতে সামরিক হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে। হাশেম ইবনে আনসারির নেতৃত্বে মুজাহিদদের একটি দল জালূলার দিকে অগ্রসর হয় এবং কিছু সময় অবরুদ্ধ রাখার পর তা দখল করে নেয়। এখান থেকে কা'কার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর একটি দল হুলওয়ানের দিকে রওয়ানা হয়। সেখানকার শাসক খসরু ভিশনোমকে পরাজিত করে তিনি হুলওয়ান দখল করেন। ইয়াযদগির্দ এখান থেকেও পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এটি ইরাকের ভূমিতে মুসলমানদের শেষ বিজয়। কারণ, এখানেই ইরাকের সীমান্ত শেষ হয়েছে।

মুসলিম বাহিনী ১৭ ও ১৮ হিজরীতে নিম্নে উল্লেখিত শহরসমূহ দখল করে ঃ আহওয়ায, মূস, মুসেল, তাকরীত, মাসবাযান, কারকিয়া, জাযিরা, আর্মেনিয়া প্রভৃতি।

১৮ হিজরীর পর ফারুকে আযম হযরত উমর (রা) ইরানের সমস্ত শহরের ওপর আক্রমণ করে সেগুলো দখল করার জন্য হযরত সা'দকে (রা) নির্দেশ দেন। ফলে ১৯ ও ২০ হিজরীতে নিম্ন বর্ণিত বিখ্যাত স্থানসমূহ বিজিত হয় ঃ খুরাসান, আরদশীর, সাবুর, ইসতাখার, সার্দালিসিয়া, দারা হাজুদ, কিরমান, সিজিস্তান, তসতর, হামাদান, মাকরান, দাহনূয, সিরাজ, সাহবান, কাজবীন, তাবারিস্তান, কাওসারাহ, জুরজান, তাখারিস্তান, ফারগানা, সাগাদ, বলখ, দায়লাম অঞ্চল প্রভৃতি।

মার্ভে অবস্থানরত ইয়াযদগির্দ যখন দেখলো যে, ইসলামী বাহিনী গোটা দেশই দখল করে ফেলছে তখন ২১ হিজরীতে তিনি সেখান থেকেই নতুন করে তাদের মোকাবিলার প্রস্তুতি শুরু করেন। সুতরাং মারওয়ান শাহর নেতৃত্বে দেড় লাখ ইরানী সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিহাওয়ান্দের দিকে অগ্রসর হয়। নু'মান বিন মাকরান ত্রিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হন। প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। নু'মান শাহাদাত বরণ করেন। তার ভাই নাঈম পতাকা হাতে নেন। যুদ্ধ চলতে থাকে। রাত ঘনিয়ে আসতেই ইরানীরা পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ হাজার ইরানী মারা যায়। মুসলমানগণ এই যুদ্ধকে ফাতহুল ফুতুহ অর্থাৎ অন্যতম বিজয় বলে আখ্যায়িত করে।

২১ হিজরীতে সমগ্র ইরান ইসলামী কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। কিয়ানী খান্দানের শেষ বাদশাহ পালিয়ে চীন সম্রাট খাকানের দরবারে চলে যান কিন্তু বিফল মনোরথ হন। ফারগানায় যান এবং সেখান থেকে পালিয়ে বেড়াতে থাকা অবস্থায় ২২ হিজরীতে অসহায়ভাবে নিহত হন।

www.amarboi.org

হযরত উমর (রা)-এর কাছে সমগ্র ইরান বিজিত হওয়ার সুসংবাদ পৌছলে তিনি সব মুসলমানকে একত্রিত করলেন এবং বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়ে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার শেষে বললেন ঃ আজ অগ্নিপূজকদের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন আর তারা কোনভাবেই মুসলমানদের ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরাও যদি সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাদের থেকেও কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদের দিয়ে দেবেন।

শাহাদাত

মদীনায় হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা)-এর আবু লু'লু' নামক এক অগ্নিপূজক ক্রীতদাস ছিলো। সে একদিন হযরত উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো যে, আমার মনিব আমার ওপর মাত্রাতিরিক্ত আয়ের কোটা ধার্য করে রেখেছেন। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কত ? সে বললো ঃ প্রতিদিন দুই দিরহাম। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কাজ করো ? সে বললো ঃ কাঠের কাজ, লোহার কাজ ও চিত্রাঙ্কন। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ তাহলে তো দুই দিরহাম বেশী নয়। এতে ক্রীতদাসটি অসন্তুষ্ট হয়ে এ কথা বলে চলে গেল যে, ঠিক আছে, বুঝবো। পরদিন ২৩ হিজরীর ২৫শে যিলহজ্জ ভোরে হযরত উমর (রা) নামাযের জন্য মসজিদে আগমন করেন। আবু লু'লু' বিষমাখা ছুরি নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকে। হযরত উমর (রা) যেই মাত্র নামাযের জন্য তাকবীর বলেছেন তখনই সে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে এবং একের পর এক কাঁধ ও নাভিতে ছয়টি আঘাত করে। অতপর সাহায্যের জন্য যে এগিয়ে এসেছে তাকেই আঘাত করে নামাযের কাতার ঠেলে পালাতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে এবং আত্মহত্যা করে। হযরত উমর (রা) তৎক্ষণাৎ আবদুর রহমান ইবনে আওফকে (রা) তাঁর স্থলে নামাযের ইমামতির জন্য দাঁড় করিয়ে দেন। পরক্ষণেই তিনি মাটিতে পড়ে যান। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) যখন নামায পড়ছিলেন তখন হযরত উমর (রা) মসজিদের বিছানার ওপর পড়ে যন্ত্রনায় ছটফট করছিলেন। নামাযের পর তাঁকে বাড়ীতে পৌছানো হলো। তিনি তাঁর হত্যাকারী সম্পর্কে জানতে চাইলেন। যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর আঘাতকারী আবু লু'লু', তখন এই বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন যে, আমার রক্তে কোন মুসলমানের হাত রঞ্জিত হয়নি।

আঘাত ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। বেঁচে থাকার আশা একেবারেই ছিল না। হযরত উমর (রা) তাঁর পুত্রকে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-

www.amarboi.org

এর কাছে এই বলে পাঠান যে, হযরত উমর (রা) আপনার হুজরায় তাঁর দুই মহাসম্মানিত বন্ধুর পাশে দাফন হতে চান। তিনি আপনার অনুমতির প্রত্যাশী। তাঁর এই আবেদন মঞ্জুর হয়। তিনি এখবর পেয়ে বললেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহ ! এটিই ছিল আমার সবচেয়ে বড় আকাংখা।"

হযরত উমর (রা)-এর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের ব্যাপার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে সবাই আবেদন জানালে তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। পরে এ বিষয়ে আবার আলোচনা শুরু হলে তিনি বললেন ঃ যে বোঝা সারা জীবন আমার ওপর চেপে ছিল মৃত্যুর পরেও তার দায়িত্ব নিতে চাই না। তবে আলী, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ, যুবায়ের ও তালহা (রা) আছেন। এই ছয় ব্যক্তির প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট ছিলেন এবং এরা জান্নাতের সুসংবাদও লাভ করেছেন। এদের মধ্য থেকে কাউকে খলিফা নির্বাচিত করে নাও। সাইদ ইবনে যায়েদ (রা)ও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তবে সে যেহেতু আমার নিকটাত্মীয় সেহেতু খিলাফতে তাঁর কোন অংশ নেই। তিনি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে ডেকে বললেন ঃ আমার দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর এই ছয়জনকে ডেকে একত্র করে তাদেরকে তাদের মধ্য থেকেই কাউকে তিন দিনের মধ্যে খলিফা নিয়োগ করতে হবে। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না হলে যার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠার মত থাকবে সেই খলিফা হবে। দুই দিকেই সমান সমর্থক হলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে সিদ্ধান্তদাতা বানাতে হবে। কিন্তু তাকে খলিফা বানাবে না। আবদুল্লাহকে (রা) সিদ্ধান্তদাতা হিসেবে মনঃপুত না করলে যেদিকে আবদুর রহমান (রা) থাকবেন সেই দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে। খলিফা নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত হযরত সুহাইব (রা) মসজিদে নববীতে ইমামতি করবেন।

ইনতিকালের পূর্বে ফারুকে আযম হযরত উমর (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে এই মর্মে অসিয়ত করেন যে, আমার বাগান ইত্যাদি বিক্রি করে বায়তুল মালের কাছে আমার যে ঋণ আছে তা পরিশোধ করবে। সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয়। আহত হওয়ার তৃতীয় দিনে ২৩ হিজরীর ২৭ যিলহজ্জ বুধবার দিন হযরত উমর (রা) ইনতিকাল করেন। জানাযার নামায পড়েন হযরত সুহাইব (রা)। পরের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাস রওযা মোবারকে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। ইনতিকালের সময় দুই প্রিয়তম বন্ধুর মত তাঁর বয়সও ছিল ৬৩ বছর। তাঁর খিলাফতকাল ছিল দশ বছর ছয় মাস চারদিন।

www.amarboi.org

হযরত উমরের (রা) খিলাফত ব্যবস্থা কৃতিত্ব ও সংস্কার

ইসলামের ইতিহাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের পর হযরত উমর ফারূকের (রা) যুগই শ্রেষ্ঠ যুগ। মাত্র দশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে রোম ও ইরানের রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়। এভাবে لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ – (সব বাতিল দীনের ওপর তাঁর দীনকে বিজয়ী করে দেবেন) আয়াতাংশটির প্রতিপাদ্য বাস্তব রূপ লাভ করে যে, সেই সময় গোটা পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি ছিল না যা মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হয়ে ফলে ফুলে সুশোভিত হতে পারে। বিজিত অঞ্চলের বিশালতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, হযরত উমর (রা)-এর শাসন যুগে পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ এক হাজার ছত্রিশটি শহর অধিকারে আসে। সেই সময় ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ছিল মক্কা থেকে উত্তর দিকে ১০৩৬ মাইল, পূর্বদিকে ১০৮৭ মাইল এবং দক্ষিণ দিকে ৪৮৩ মাইল। পশ্চিমে জেদ্দা ছিল সর্বশেষ সীমান্ত। ব্যবস্থাপনা এত ভাল ছিল যে, গোটা দেশে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল। কেউ-ই সরকার বিরোধী ছিল না এবং খলিফার আদেশ অমান্য করার দুঃসাহসও কারো ছিল না। এতটা ন্যায় ও ইনসাফ ছিল যে, মুসলিম তো বটেই অমুসলিমরাও সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

ফারূকে আযম হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু সংস্কার সাধন অবশ্যই করেছেন। কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে নতুন নীতিমালা ও আইন বিধিবদ্ধ করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিধিবদ্ধকৃত এসব নীতিমালা ও আইনকেই 'আউয়ালিয়াতে উমর' বলা হয়।

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল থেকেই আনুষ্ঠানিক ইসলামী সরকারের সূচনা হয় এবং সরকারের সমস্ত বিভাগ সৃষ্টি হয়। হযরত উমরের (রা) খিলাফত ছিল কিতাব ও সুন্নাতের সুসংবদ্ধ বাস্তব ব্যাখ্যা। নিয়ম ছিল, যেসব রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় সমস্যার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে কোন দলীল বা উক্তি পাওয়া যেতো সেগুলো যথারীতি মজলিসে শুরায় পেশ করা হতো এবং সেখানে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। এই মজলিসে শুরায় বড় বড় এবং জ্ঞানী গুণী সাহাবী যেমন ঃ হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ (রা) অংশগ্রহণ করতেন। এই মজলিসে শুরা ছাড়াও আরো দুটি মজলিস ছিলো। এর একটি ছিল মজলিসে আম যাতে মুহাজির ও আনসার ছাড়া সমস্ত গোত্রের নেতৃবৃন্দ শরীক হতেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

www.amarboi.org

বিষয়ের উদ্ভব হলে এই মজলিসে আহবান করা হতো। অপরটি ছিল মজলিসে খাস যাতে শুধু মুহাজিরগণই অংশ গ্রহণ করতেন। মজলিসে শুরার অধিবেশন আহবানের পদ্ধতি ছিল একজন ঘোষক اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ (আসসালাতু জামেয়াহ) বলে ঘোষণা করতো। ঘোষণা শুনেই লোকজন মসজিদে নববীতে (স) সমবেত হতো। হযরত উমর (রা) দুই রাকআত নামায পড়ার পর আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা শুরু করতেন। মজলিসে আমে প্রত্যেকে তাঁর মতামত প্রকাশের ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। এমনকি আমীরুল মুমিনীনের সমালোচনারও অবাধ অধিকার ছিল। ভুল সমালোচনা হলে ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করা হতো এবং বাস্তব ভিত্তিক হলে অবিলম্বে সংশোধনের চেষ্টা করা হতো। দেশের সাধারণ পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য গোটা দেশে গোয়েন্দা বাহিনী নিয়োজিত ছিল। তারা খলিফার দরবারে খুঁটিনাটি ঘটনারও রিপোর্ট প্রেরণ করতো। হজ্জের সময় শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের অবাধ অনুমতি ছিল। আমীরুল মুমিনীন নিজেও দুইবার মদীনার বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এসব সফরে তিনি কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত অঞ্চলসমূহ স্বচক্ষে পরিদর্শন করেছেন। হযরত উমর ফারুক (রা) বিজিত সবগুলো দেশকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রদেশে ছয়জন বড় পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। তারা হচ্ছেন, গভর্ণর, সচিব, সমর বিভাগীয় সচিব, কালেক্টর, পুলিশ অফিসার, অর্থ সচিব, কাজী বা বিচারক। মজলিসে শুরার আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে এসব বড় বড় পদাধিকারীদেরকে নির্বাচন করা হতো। হযরত উমরের ইনতিকালের সময় নিম্নবর্ণিত গভর্ণরগণ বিভিন্ন প্রদেশের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঃ

মক্কা—নাফে' ইবনে আবিল হারেস আল খাযায়ী (রা)
কুফা—মুগীরা ইবনে শু'বা (রা)
মিসর—আমর ইবনুল আস (রা)
হিমস—উমায়ের ইবনে সা'দ (রা)
তায়েফ—সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাকাফী (রা)
বসরা—আবু মূসা আশ'আরী (রা)
দামেশক—মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান (রা)
বাহরাইন—উসমান ইবনে আবিল আ'স (রা)

হযরত উমর (রা)-এর সেক্রেটারী ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ও মু'আইকীব (রা)। বায়তুল মালের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকামের (রা) ওপর। তাঁর দাস ইয়ারফা ছিল তাঁর দেহরক্ষী। প্রদেশসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য যুক্তি

www.amarboi.org

সংগত বেতন নির্ধারণ করা হতো। বায়তুলমাল থেকে এর অধিক অর্থ গ্রহণের অধিকার থাকতো না। নিয়োগের পূর্বে গভর্ণরদের ন্যায়নিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততা ভালভাবে যাচাই করা হতো এবং নিয়োগের পরেও তাদের কর্মতৎপরতা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা হতো। জনগণের প্রতি সাধারণ নির্দেশ ছিল, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে আমাকে নির্ভয়ে তা জানাতে হবে। হযরত উমর (রা) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও তাঁর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কঠোর সমালোচনা করতেন এবং নিয়োগ করার সময় ন্যায়নিষ্ঠ ও সরলমনা হওয়ার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে লিখিতভাবে নিম্ন বর্ণিত দিকনির্দেশনা দান করতেন ঃ

মিহি বস্ত্র পরিধান করবে না, চালা আটা খাবে না। ঘরের দরজা বন্ধ করবে না কিংবা কোন দ্বাররক্ষী রাখবে না যাতে যখনই কেউ তোমার কাছে আসতে চাইবে বিনা বাধায় আসতে পারে। রুগ্নদের দেখা শোনা করতে যাবে এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করবে।

হযরত উমর ফারুক (রা) একবার তাঁর গভর্ণরদের সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ মনে রেখো, আমি তোমাদেরকে একনায়ক ও জালেম বানিয়ে পাঠাইনি বরং ইমাম বানিয়ে পাঠিয়েছি যাতে মানুষ তোমাদের কাছে পথের সন্ধান পায়। তোমরা মুসলমানদের হকসমূহ আদায় করবে। তোমরা তাদেরকে প্রহার করবে না কিংবা অযথা প্রশংসা করবে না। তাদের জন্য দরজা বন্ধ করবে না, তাহলে শক্তিমানরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করবে। কোন বিষয়ে তাদের চেয়ে নিজেদেরকে অগ্রাধিকার দেবে না। এটা হবে তাদের প্রতি জুলুম।

গভর্ণরদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য হযরত উমর (রা) মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে নিয়োগ করেছিলেন। কোন গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হলে অবিলম্বে তা তদন্ত করার জন্য তিনি বেরিয়ে পড়তেন। এভাবে গভর্ণরদের নৈতিক চরিত্রের পূর্ণরূপে তত্ত্বাবধান করা হতো। এমনকি সাধারণ-ভাবে সমস্ত মুসলমানের নৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারসূহের তত্ত্বাবধানেরও পুরা ব্যবস্থা ছিল। হযরত উমরের ইচ্ছা ছিল সমস্ত মুসলমানের নিন্দনীয় স্বভাব দূরীভূত হয়ে তারা উত্তম নৈতিক গুণাবলীতে ভূষিত হোক। তিনি আরবদের মত অহংকারী জাতির মধ্যে থেকে অহংকার ও গৌরবের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলেছিলেন। বাস্তবে চাকর ও মনিবের পার্থক্য উঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবিতা ও কবিত্বের মাধ্যমে উপহাস ও কুৎসা রটনা ছিল আরবদের সাধারণ রুচিবোধের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উমর (রা) নির্দেশ জারী করে অত্যন্ত কঠোরভাবে তা বন্ধ

www.amarboi.org

করেন। মানুষ যাতে ভোগ বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে সরলতার গুণাবলী থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য তিনি পারসিকদের মত পোশাক-পরিচ্ছদ ও তাদের মত জীবন যাপন প্রণালী অবলম্বন না করতে এবং আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে না করতে নির্দেশ দেন। দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল রাখার জন্য তিনি স্বতন্ত্র একটি পুলিশ বিভাগ কায়েম করেন। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল রাখার পাশাপাশি ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। তিনি অপরাধীদের জন্য জেলখানা নির্মাণ করেন।

ফারুকে আযম হযরত উমর (রা) রাষ্ট্রের সব জেলাতে বিচারালয় স্থাপন করেন। বিচারকদের বেতন নির্ধারণ করেন। বিচার বিভাগের নিয়ম কানুন ও নীতিমালা বিধিবদ্ধ করেন। ন্যায় ও ইনসাফের ক্ষেত্রে উচ্চ নীচ, আপন ও পর, বাদশাহ ও ফকীর সবার জন্য একই আইনের ব্যবস্থা করেন। আদালতের আঙিনা মুসলিম ও অমুসলিম সবার জন্য সমানভাবে খোলা ছিল।

হযরত উমর (রা) গোটা দেশে আদমশুমারি করান। ভূমি জরিপ করিয়ে আবাদযোগ্য ভূমির বন্দোবস্ত করেন। উশর ও ভূমিকরের সুষ্ঠু নিয়ম চালু করেন। তার খিলাফতকালে শুধু ইরাকের ভূমিকরের পরিমাণ ছিল দশ কোটি দিরহাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নগরশুল্ক বা স্থানীয় ট্যাক্স তাঁরই আবিষ্কার। এরপর অবাধে বৈদেশিক বাণিজ্য হতে থাকে। আর্থিক ক্ষেত্রে যাকাত, উশর, দান, যুদ্ধ লব্ধ অর্থ, জিযিয়া এবং ভূমিকর প্রভৃতি কর আদায় ও বন্টনের জন্য হযরত উমর (রা) চমৎকার আইন-কানুন রচনা করেন।

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের পূর্বে স্বতন্ত্র কোন কোষাগারের অস্তিত্ব ছিল না। অর্থ-সম্পদ যা আমদানি হতো তৎক্ষণাৎ বন্টিত হতো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর খিলাফতের শেষভাগে বায়তুল মালের জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু তা সব সময় শূন্য থাকতো। ১৫ হিজরীতে হযরত উমর (রা) বেতন ও ভাতা বিষয়ক স্বতন্ত্র নিয়ম-কানুন চালু করলে একটি স্বতন্ত্র কোষাগারের প্রয়োজন পড়ে। মজলিসে শুরার মঞ্জুরী নিয়ে তিনি মদীনাতে একটি বড় কোষাগার নির্মাণ করেন। রাজধানী ছাড়াও সমস্ত প্রদেশ ও জেলায় এর শাখা প্রতিষ্ঠিত করে সব শাখার জন্যই অফিসার নিয়োগ করেন। প্রদেশ ও জেলাসমূহে গোটা বছরে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হতো তা সেখানকার বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের পর বছর শেষে কেন্দ্রীয় কোষাগার অর্থাৎ মদীনার বায়তুল মালে প্রেরণ করা হতো। কেন্দ্রীয় কোষাগারের গুরুত্ব কেমন ছিল তা এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, শুধুমাত্র মদীনার লোকদেরকে সেখান থেকে যে বেতন দেয়া হতো তার পরিমাণ ছিল বাৎসরিক তিন কোটি দিরহাম। বায়তুল মালের হিসেব নিকেশের জন্য তিনি যথারীতি রেজিষ্টার

www.amarboi.org

প্রস্তুত করান। সেই সময় পর্যন্ত আরবে কোন সন প্রচলিত ছিল না। হযরত উমর (রা) ১৬ হিজরীতে হযরত আলীর (রা) পরামর্শে হিজরী সনের প্রবর্তন করে সে অভাব পূরণ করেন।

হযরত উমর (রা)-এর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনের মুহূর্তে মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় ইসলামী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতো। তাদের নির্দিষ্ট কোন বেতনও ছিল না। যুদ্ধলব্ধ অর্থের চার পঞ্চমাংশ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। কখনো পরিমাণে এর চাইতে কিছুটা বেশীও লাভ করতো। ১৫ হিজরীতে হযরত উমর (রা) সামরিক বাহিনীর জন্য স্থায়ী দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। সকল আরবকে সামরিক বাহিনীর সদস্য ঘোষণা করে তাদের জন্য ইসলামের প্রতিরক্ষা অত্যাবশ্যকীয় করে দেয়া হয়। আরব ছাড়া অন্য এলাকার মুসলমানদের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদান ছিল ঐচ্ছিক। সকল সৈনিকের নাম যথারীতি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আত্মীয়তা এবং ধর্মীয় খেদমতের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে বার্ষিক বেতন নির্ধারিত ছিল ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস (রা)	১২ হাজার দিরহাম।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ (রা)	১২ হাজার দিরহাম।
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, হুসাইন, আবু যর ও সালমান ফারেসীসহ	৫ হাজার দিরহাম।
হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিতে অংশগ্রহণকারীগণ উসামাসহ	৪ হাজার দিরহাম।
মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ	৩ হাজার দিরহাম।
কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ	২ হাজার দিরহাম।
রিজার্ভ সৈনিক	৫০০ থেকে ২৫০ দিরহাম
নারীদের	২০০ থেকে ৫০০
এবং শিশুদের	১০০ দিরহাম।

এক্ষেত্রে আরব ও অনারবের কোন প্রশ্ন ছিল না। এই অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত ছিল। হযরত আলী (রা) তাঁর খিলাফতকালে সকল সৈনিকের বেতন সমান করে দেন।

সামরিক ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত নিয়মিত। হযরত উমরের তত্ত্বাবধান এত কঠোর ছিল যে, ডিউটিতে গায়ের হাজির থাকা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। সৈনিকদের প্রশিক্ষণ, শরীর চর্চা এবং স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। সৈন্যরা বেতন এবং পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়মিত পেতো। তিনি সৈন্যদের ছুটি,

www.amarboi.org

আবহাওয়া পরিবর্তন এবং দিবারাত্রির ডিউটি সম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত আইন-কানুন রচনা করেন।

সামরিক বাহিনীতে নিম্নবর্ণিত পদগুলো ছিল আবশ্যিক ঃ খাজাঞ্চি, হিসাব নিরীক্ষক, দোভাষী, ডাক্তার, শল্য চিকিৎসক ও গোয়েন্দা। যুদ্ধের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকার নিমিত্তে সেনাবাহিনীকে নিম্নবর্ণিত ভাবে বিভক্ত করা হয়েছিলোঃ মুকাদ্দামা (সম্মুখ ভাগ), কাল্‌ব্‌ (মূল অংশ), মায়মানা (দক্ষিণ বাহু), মায়সারা (বামবাহু), সাকা (পশ্চাতভাগ), তালি'আ (অগ্রবর্তী দল), সাফার মায়না (খনকদল), বাদ (পশ্চাদরক্ষী বাহিনী), উষ্ট্রারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক ও তীরন্দাজ। এসব বিভাগ আবার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হতো। ঐগুলোকে কারদুস বলা হতো। সামরিক অফিসারদের পদবিন্যাস ছিল এরূপ ঃ আমীরে আম (কমান্ডার ইন চীপ), নায়েবে আমীরে আম, আমীরে মায়মানা, মায়সারা ও কালব প্রভৃতি (উইং কমান্ডার), তাদের সহকারী, তারপর কারদুস সমূহের আমীর (স্কোয়াড্রন অফিসার), অতপর উরাফা উমারায়ে অশার (লেফটেনান্ট)।

যুদ্ধাস্ত্রসমূহের মধ্যে তরবারী, বর্শা এবং তীর ছাড়াও দুর্গ বিধ্বংসী মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপক) ও দাব্বাবা সংযোজন করা হয়েছিল।

হযরত উমরের সময় মদীনা, কুফা, বসরা, মুসেল, ফুসতাত, দামেশক হিমস, জর্দান ও ফিলিস্তীনে সেনানিবাস ছিল। এসব স্থান ছাড়াও সমস্ত জেলায় সামরিক ব্যারাক ও ছাউনি ছিল যেখানে সব সময়ই কিছু সংখ্যক সৈন্য থাকতো।

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে বিজিত অঞ্চলসমূহে বিপুল সংখ্যক নতুন বসতি স্থাপন করা হয়। পাঁচটি নতুন শহর নির্মিত হয়। ১৭ হিজরীতে ইরাক অঞ্চলে কুফা নগরীর পত্তন হয় এবং ১৪ হিজরীতে বসরা নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। মিসর বিজয়ের পর নীল নদের তীরে ফুসতাত শহরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। অনুরূপ মুসেলের মত একটি ক্ষুদ্র পল্লী যথারীতি শহরে রূপান্তরিত হয়। মিসরের নদীর তীরে জিযা শহরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ২১ হিজরীতে সেখানে দুর্গ নির্মাণ করা হয়।

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত যুগে শাসকদের বসবাসের জন্য বহু সরকারী ভবন, সামরিক প্রয়োজনে দুর্গ, ছাউনি ও ব্যারাক নির্মাণ করা হয়। জনকল্যাণের জন্য রাস্তা, ব্রিজ, মেহমানখানা, সরাইখানা নির্মাণ এবং খাল খনন করা হয়। হযরত উমর (রা) প্রত্যেকটি জনপদে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তাঁর সময়ে চার হাজার ওয়াক্তিয়া মসজিদ এবং নয়শ জামে মসজিদ

www.amarboi.org

নির্মাণ করা হয়। কা'বার চারপাশে মসজিদ ছিল না। লোকজন খোলা জায়াগায় নামায পড়তো। হযরত উমর (রা) কিছু বাড়ীঘর কিনে মসজিদে বায়তুল হারাম নির্মাণ করেন। অনুরূপ মসজিদে নববীও নতুন করে নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন।

হযরত উমর (রা)-এর খেয়াল ছিল জনকল্যাণের প্রতি। কেউ যাতে অনাহারে মৃত্যুবরণ না করে সে জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তিনি গরীব ও দুস্থদের জন্য ধর্ম নির্বিশেষে বায়তুলমাল থেকে দৈনিক ভাতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। অনুরূপ বিকলাঙ্গ, দুর্বল, কর্মক্ষমতাহীন এবং খোঁড়া সবাই বায়তুলমাল থেকে নিয়মিত বেতন পেতো। তিনি মুসাফিরদের জন্য লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। বে-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালনের প্রতিও তাঁর পূর্ণ মনযোগ ছিল। ১৮ হিজরী থেকে তিনি এই ব্যবস্থা চালু করেন যে, বে-ওয়ারিশ শিশু পাওয়া গেলে অবিলম্বে অবগত করতে হবে যাতে বায়তুলমাল থেকে তার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা যায়। হযরত উমর (রা) রাতের বেলা শহরে ঘুরে ঘুরে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে অবহিত হতেন এবং অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করতেন।

১৮ হিজরীতে হিজাযে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই বিপদ লাঘব করার জন্য তিনি অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেন। অন্য সব প্রদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য এনে সুষ্ঠু ব্যবস্থাধীনে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে বন্টন করিয়ে দেন এবং এই দুর্ভিক্ষের ছোঁয়া পর্যন্ত জনগণের গায়ে লাগতে দেননি। এভাবে অতি দ্রুত দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হয়। হযরত উমর (রা) শপথ করেছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ দূর না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঘি এবং মধু খাবেন না। সুতরাং শুধু শুকনো রুটি বা জলপাই তেল দিয়ে রুটি খেতেন।

১৭ অথবা ১৮ হিজরীতে শাম (সিরিয়া), ইরাক ও মিসরে ধ্বংসাত্মক মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। এই মহামারীকে আমওয়াস বা 'আমুর রামাদাহ' বলা হয়। হাজার হাজার মানুষ এতে মারা যায়। এই মাহামারীতে আক্রান্ত হয়েই হযরত আবু উবায়দা (রা) ও হযরত মুআয (রা) প্রমূখ মৃত্যুবরণ করেন। এই সময়েই হযরত উমর (রা) হযরত আলীকে (রা) মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে সিরিয়া যাত্রা করেন। যেহেতু সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিলো তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস (কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়লে সেখানে যাবে না এবং যেখানে অবস্থান করছো সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়লে সেখান থেকে পালাবে না) অনুসরনে সিরিয়ায় প্রবেশ করলেন না। এভাবে তার যুগেই কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা সর্বপ্রথম চালু হয়। মহামারী বন্ধ হলে তিনি পুনরায় সিরিয়া যান, মৃতদের খোঁজ-খবর নেন এবং

www.amarboi.org

তাদের আত্মীয় স্বজনদের সান্ত্বনা দান করেন। সিরিয়ায় গভর্নর ইয়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান (রা) এই মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্থলে হযরত উমর (রা) তার ভাই মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানকে (রা) সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন।

ফারুকে আযম হযরত উমর (রা) যেভাবে জনকল্যাণ এবং ইসলামী অঞ্চলসমূহের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কর্মতৎপর থাকতেন ঠিক একইভাবে তাঁর সরকারী কাজ-কর্ম, ইমামতি, ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ধর্মীয় দায়িত্বের প্রতিও যত্নবান ছিলেন। ধর্মীয় আদেশ নিষেধ এবং আকীদা-বিশ্বাস পালনে এমন যত্নবান ছিলেন যে, ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতিরও সমালোচনা করতেন। ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি কুরআন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই সকল বিজিত এলাকায় হাফেজে কুরআন ও শিক্ষক প্রেরণ করেন। নিজেও ছিলেন কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি অত্যাধিক আগ্রহী। ১৪ হিজরীতে তারাবীর নামায নিয়মিত মসজিদে পড়ার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থা কুরআন সংরক্ষণের একটি বড় উপায় হিসেবে প্রমাণিত হয়। তিনি শিক্ষক, কুরআনের হাফেজ, মসজিদের ইমাম এবং মুয়াযযিনদের বেতন নির্ধারণ করে দেন এবং হাদীস ও ফিকাহ্ শিক্ষাদানের জন্য বড় বড় সাহাবীকে (রা) বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন।

১৮ হিজরীতে হযরত উমর (রা) ইসলামী রৌপ্য মুদ্রা চালু করেন এবং একই বছর যথারীতি ডাক বিভাগ চালু করেন। হযরত উমর (রা)-এর কৃতিত্বসমূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নমুনা হিসেবে দেখানো হয়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

"আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক কূপের পাশে দাঁড়িয়ে আছি এবং পাশেই বালতি রাখা আছে। আমি আল্লাহর ইচ্ছা মত যতটা সম্ভব ঐ কূপ থেকে বালতি ভরে পানি উঠালাম। এরপর আবু বকর (রা) এসে ঐ বালতি নিয়ে কয়েক বালতি পানি উঠালো। কিন্তু তার পানি উঠানোতে কিছু দুর্বলতা ছিল। অতপর বালতিটি বৃহদাকার হয়ে গেলো এবং উমর (রা) তা নিয়ে নিলো। আমি কোন শক্তিশালী মানুষকেও উমরের (রা) মত এত অধিক পানি উঠাতে দেখিনি। এমনকি সব মানুষের পিপাসা নিবৃত হলো।" (বুখারী ও মুসলিম)

অভ্যাস, চরিত্র ও মর্যাদা

উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত উমর (রা)-এর স্থান ছিল অনেক উর্ধে। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বশুর এবং খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমার (রা) জামাতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছিলেন

www.amarboi.org

এবং তাঁর জ্ঞান ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর কৃতিত্বই তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সুব্যবস্থাপনা, ন্যায় ও ইনসাফ, সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ এবং বিশ্বমানের পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক ব্যাপারে অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়। তাকওয়া, যুহদ, আল্লাহর আনুগত্য ও ভয়, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ, অল্পে তুষ্টি, বিনয়, সরলতা, সত্যবাদিতা, সত্যপ্রীতি, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা এবং তাওয়াক্কুলের সমস্ত গুণাবলী তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) সত্যই বলেছেন ঃ "হযরত উমর (রা)-এর মধ্যে বিভিন্ন মনীষীর ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতার একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। যেমন ঃ দেশজয়, শাসনকার্য, সেনাবাহিনী সংগঠন ও শত্রুর প্রতি আপোষহীনতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যুলকার নাইনের মত। নম্রতা, প্রজাপালন ও দানের ক্ষেত্রে নওশেরোঁয়ার মত [যদিও হযরত উমরের (রা) মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে নওশেরোঁয়ার উল্লেখ অশোভনীয়), পাণ্ডিত্য, ফতোয়া ও শরীয়াতের হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালেকের (র) মত, মুর্শিদ হিসেবে হযরত আবদুল কাদের কিংবা খাজা আলাউদ্দীনের মত, হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও ইবনে উমরের (রা) মত এবং জ্ঞানের বিচারে হযরত জালালুদ্দীন রুমী (র) কিংবা শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তাবের (র) মত। এসব মনীষী পরস্পর সমমর্যাদা সম্পন্ন ও একই পরিবার ভুক্ত। এসব জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অভাবী তাদের নিজ নিজ অভাব মোচনের জন্য তাদের কাছে প্রার্থী হয়ে সফলকাম হতে পারে।"

হযরত উমর (রা) স্বভাবের দিক দিয়ে ছিলেন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। তার মেজাজ ছিল অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি কখনো ক্রোধান্বিত হতেন না। ঠিক উত্তেজনার মুহূর্তে তাঁকে আল্লাহ ও রাসূলের কথা কিংবা কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীস শুনানো হলে তৎক্ষণাৎ ক্রোধ নির্বাপিত হতো। একবার বক্তৃতার সময় তিনি বলেছিলেন ঃ

"হে জনগণ, যতদিন পর্যন্ত তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নম্রতা ও দয়া দ্বারা সিক্ত ছিলে আমার কঠোরতা ততদিনই ছিল। এখন আমি তোমাদের অভিভাবক। এখন আর আমি তোমাদের প্রতি কঠোর হবো না। আমার কঠোরতা হবে শুধু জালেম দুষ্কর্মশীলদের প্রতি। হে জনতা, আমি যদি নবীর (সা) সুন্নাত ও আবু বকর (রা)-এর কর্মপন্থার পরিপন্থী কোন আদেশ দেই তাহলে তোমরা কি করবে? জনতা কোন জবাব দিল না। পুনরায় তিনি একই প্রশ্ন করলে এক যুবক তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে বললো ঃ فَعَلْنَا بِكَ هٰكَذَا "আমরা তরবারির সাহায্যে আপনাকে সঠিক পথে আনবো। এ জবাব শুনে ফারুককে

www.amarboi.org

আযম অত্যন্ত খুশী হলেন।" সমালোচনার অবাধ অনুমতি ছিল। এর সাথে সাথে সন্দেহ্ নিরসন অথবা সংশোধনের ত্বরিত প্রচেষ্টা চালানো হতো।

হযরত উমর (রা) ছিলেন তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং সঠিক ও সুস্থ্ মতামতের অধিকারী। এ কারণে তাঁর বহু মতামত ধর্মীয় নির্দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছিলেন সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও শরয়ী হুকুম-আহ্কাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি যেহেতু স্বভাবতই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তাই ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য ইজতিহাদের প্রশস্ত রাজপথ তৈরী করে গিয়েছেন। ফিকাহ্ শাস্ত্রের সূচনা ও ধারাবাহিকতা বিশেষভাবে হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর সাথে সম্পর্কিত। কুরআন থেকে প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা) অতীব দক্ষ ছিলেন। হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন। এ ব্যাপারে তিনি উত্তম নীতিমালা নির্ধারণ করেছিলন। দীনের প্রচার-প্রসার ও জনকল্যাণের কাজে নিজেকে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখতেন।

বিনম্রতা ও একাগ্রতার সাথে সারারাত নামায পড়তেন। হৃদয়ের কোমলতার অবস্থা ছিল এই যে, একবার নামাযে اِنَّمَا اَشْكُوْ بَثِّىْ وَ حُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ (আমি আমার অসহনীয় দুঃখ-বেদনা কেবল আল্লাহ্র কাছেই নিবেদন করছি) আয়াতটি পড়ে এত উচ্চস্বরে কেঁদে ফেলেন যে, পেছনের কাতারের লোক পর্যন্ত তা শুনতে পায়। খিলাফত লাভের পর বলেন ঃ যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ ! আমি যদি আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে যাই এবং আমার নেককাজ ও মন্দকাজ যদি সমান সামন ও হয় তবু আমি তাকে আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করবো।

হযরত উমর (রা) প্রকৃতিগতভাবেই বৈষয়িকতা, লোভ ও বিলাসী জীবনকে ঘৃণা করতেন। কৃচ্ছ্রতা সাধনের অবস্থা ছিল এই যে, তাঁর দেহ কখনো নরম ও আরামদায়ক কাপড় স্পর্শ করেনি। পরিধেয় বস্ত্রে ছোট ছোট তালি, মাথায় ছেঁড়া পাগড়ি এবং পায়ে ছেঁড়া জুতা থাকতো। এ অবস্থায়ই রোমের কাইজার ও ইরানের কিসরার দূতদের সাথে সাক্ষাত করতেন। অধিকাংশ সময়ই জামা পরতেন, পাগড়ী বাঁধতেন এবং প্রাচীন আরব স্টাইলের জুতা পরতেন। সাদামাটা খাবার খেতেন। সাধারণত রুটি এবং জয়তুন তেল খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। কখনো কখনো গোশতের টুকরা, দুধ, মধু এবং তরকারিও খেতেন।

www.amarboi.org

তিনি এতো বিনয়ী ছিলেন যে, বিধবা মেয়েদের জন্য মশক ভর্তি পানি কাঁধে বহন করে এনে দিতেন। জিহাদে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের স্ত্রীদের জন্য নিজে সওদাপত্র কিনে পৌছিয়ে দিতেন। এভাবে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে মসজিদের এক কোণে মাটির ওপর শুয়ে পড়তেন। এসব সত্ত্বেও খলিফা হিসেবে হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর প্রভাব প্রতিপত্তি সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একাই বাইরে বের হতেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রভাব এতো প্রবল ছিল যে, যে দেখতো সেই ভয়ে থরথর করে কাঁপতো। স্বল্পে তুষ্ট থাকার অবস্থা ছিল এই যে, দারিদ্র ও অনাহার সত্ত্বেও খিলাফত লাভের পর কয়েক বছর পর্যন্ত বায়তুল মাল থেকে সামান্য কিছুও গ্রহণ করেননি। যখন গ্রহণ করেছেন তখন দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম পরিমাণ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সময়ে সবার জন্য ভাতা নির্ধারিত হলে তিনি নিজে অন্যদের সমান ভাতা গ্রহণ করেছেন। গনীমাতের মাল আসলে অন্যদের যে পরিমাণ দিয়েছেন নিজেও ঠিক সেই পরিমাণই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"ইয়াতীমের সম্পদে তার লালনপালনকারীর যতটা অধিকার, তোমাদের সম্পদে আমারও ঠিক ততটাই অধিকার। আমি সম্পদশালী হলে কিছুই গ্রহণ করতাম না। আমি অভাবী। তাই শুধু খাদ্য হিসেবে যতটা প্রয়োজন ততটাই গ্রহণ করবো। বন্ধুগণ, আমার এবং তোমাদের পরস্পরের কাছে কিছু অধিকার আছে। এসব অধিকারের ব্যাপারে তোমাদের উচিত আমাকে পাকড়াও করা। সেই সব অধিকারের একটি হচ্ছে, আমি যেন দেশের কর ও গনীমাতের মালসমূহ অযথা জমিয়ে না রাখি। আরেকটি অধিকার হচ্ছে, আমার হাত দিয়ে তা যেন অযথা ব্যয়িত না হয়। অন্যান্য অধিকার হচ্ছে, আমি যেন তোমাদের দৈনন্দিন ভাতা বৃদ্ধি করি, দেশের সীমান্তসমূহ রক্ষা করি এবং তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত না করি।"[১]

পারিবারিক জীবনে হযরত উমর (রা) তাঁর সন্তান ও স্ত্রীদের ভাল বাসতেন। তবে সেই ভালবাসা এতটা হতো না যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির সুষ্ঠু সম্পর্কের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। নিজের পুত্র আবু শাহমার ওপর নিজেই হদের শাস্তি কার্যকর করেছিলেন। আবু শাহমা (রা) অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কোন প্রকার আনুকূল্য দেখাননি। এই মন কষ্টের কারণে আবু শাহমার (রা) অসুস্থতা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ইন্তেকাল করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালবাসা ছিল। নবীর (সা)-এর আত্মীয়দেরকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। উম্মুল

---

১. কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা—৬৭।

www.amarboi.org

মুমিনীনদের আরাম-আয়েশ এবং সম্মান ও মর্যাদার প্রতি অত্যন্ত খেয়াল রাখতেন।

মাদায়েন বিজিত হওয়ার পর যুদ্ধলব্ধ অর্থ আসলে হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে হাজার হাজার দিরহাম দিলেন। কিন্তু নিজের পুত্র হযরত আবদুল্লাহকে দিলেন মাত্র পাঁচশ দিরহাম। এতে হযরত আবদুল্লাহ আপত্তি জানিয়ে বললেন ঃ যখন তাঁরা দুইজন শিশু ছিলেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থেকে জিহাদ করেছি। জবাবে হযরত উমর (রা) বললেন ঃ

ঠিক আছে তাঁদের বাপের মত বাপ এবং মায়ের মত মা দেখাও। তাদের নানার মত তোমার নানা, তাঁদের নানীর মত তোমার নানী, তাঁদের চাচার মত তোমার চাচা, তাদের মামার মত তোমার মামা এবং তাঁদের খালার মত তোমার খালা নিয়ে এসো। অন্যথায় নিজেকে কখনো তাঁদের সমান মনে করো না। শুনে রাখো, তাঁদের পিতা আলী মুর্তাজা (রা), তাঁদের মা ফাতেমাতুয যাহরা (রা), তাদের নানা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁদের নানী খাদীজাতুল কুবরা (রা), তাঁদের চাচা জা'ফর (রা), তাদের মামা ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাদের খালা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম (রা)।

হযরত উমর (রা)-এর কাছে এটা ছিল রাসূলের (সা) আপনজনদের মর্যাদা। হযরত আলীর (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন ঃ

خير الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر رض

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর (রা) এবং তাঁর পর সর্বোত্তম হচ্ছেন উমর (রা)।"

www.amarboi.org

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান যিন নূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু

ফারুকে আযম হযরত উমর (রা)-এর দাফনের পর খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত উমর (রা)-এর অসীয়ত অনুসারে নিয়োজিত ছয় ব্যক্তি হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যুবায়ের (রা) এবং হযরত সা'দ (রা) পরামর্শের জন্য সমবেত হলেন। আলোচনা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হলো। হযরত আবদুর রহমান (রা) ছয়জনের মধ্য থেকে তিন জনের ওপর সমস্ত দায়দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব করলেন। অতএব প্রত্যেকেই তার মতে যাকে খিলাফতের অধিক উপযুক্ত বলে মনে করে সে তার নাম প্রস্তাব করবে। হযরত তালহা (রা) হযরত উসমান (রা)-এর নাম প্রস্তাব করলেন, হযরত যুবায়ের (রা) হযরত আলী (রা)-এর নাম প্রস্তাব করলেন এবং হযরত সা'দ (রা) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা)-এর নাম পেশ করলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) বললেন ঃ আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। অতএব বিষয়টি এখন হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমান (রা) এই দুই ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ দুইজনের মধ্যে যিনি আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের (সা)-এর সুন্নাত ও প্রথম দুই খলিফার নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দান করবেন তাঁর হাতে বাইআত করা হবে। এ আলোচনার পর পরামর্শ সভার সদস্যগণ নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেলেন এবং খলিফা নির্বাচনের ভার হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর ওপর পড়লো।

এটা ছিল হজ্জ পরবর্তী সময়। হজ্জ থেকে ফিরে বহু লোক মদীনায় এসে সমবেত হয়েছিলো। তাছাড়া হযরত উমর (রা)-এর ওফাতের কারণে বড় বড় সাহাবী (রা), সেনাপ্রধানগণ, বিভিন্ন এলাকার শাসকগণ এবং গোত্রসমূহের অধিপতিরাও মদীনায় সমবেত হয়েছিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) তিন দিন পর্যন্ত নীরবে মানুষের সাথে পরামর্শ করে জনমত জানতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে তৃতীয় রাতটি আসলো যে রাতের শেষে সকাল বেলা তিনি খিলাফতের ব্যাপারে ঘোষণা করবেন। উক্ত রাতে তিনি সর্ব প্রথম হযরত সা'দ (রা) ও যুবায়ের (রা)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। পরে স্বতন্ত্রভাবে হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর সাথে দীর্ঘ সময় আলোচনা করলেন। অবশেষে মুয়াযযিন ফজরের আযান দিলে সবাই মসজিদে গিয়ে সমবেত হলো। নামায শেষে হযরত আবদুর রহমান (রা) দীর্ঘ সময় দোয়া করলেন

www.amarboi.org

এবং একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। বিশেষ করে হযরত আলীকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি জনমত যাঁচাই করেছি। জনগণ উসমানের (রা) প্রতি আকৃষ্ট। তাই আপনি মনে দুঃখ নেবেন না। এরপর হযরত উসমানকে খলিফা ঘোষণা করে প্রথমে নিজে বাইআত করলেন। এরপরই বাইআতের জন্য হযরত আলী (রা) হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বাইআত করা মাত্রই উপস্থিত সবাই বাইআত করলেন। এভাবে ২৪ হিজরীর পহেলা মুহাররাম সোমবার দিন হযরত উসমান (রা) সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন।

ব্যক্তিগত জীবন

নাম উসমান (রা), উপনাম আবু আবদুল্লাহ ও আবু উমর এবং উপাধি যুন নূরাইন। পিতার নাম আফফান এবং মায়ের নাম আরওয়া। আরওয়া ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন ফুফু উম্মে হাকীম বিনতে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। তাঁর বংশধারা উর্ধতন পঞ্চম পুরুষ গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধারা আবদে মানাফের সাথে মিলিত হয়েছে। হযরত উসমানের (রা)-এর পরিবার জাহেলী যুগে অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষ উমাইয়া বিন আবদে শামস কুরাইশদের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁর সাথে সম্পর্কিত করে বনী উমাইয়া শাসকদেরকে উমাইয়া বলা হয়। কুরাইশদের মধ্যে শুধু বনী উমাইয়ারাই বনী হাশেমের (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের) সমকক্ষতা দাবী করতো।

হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের ছয় বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই লেখাপড়া শেখেন। বড় হয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং আল্লাহর পথে প্রচুর ব্যয় করেন। শেষ বয়স পর্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন। বদান্যতা, উত্তম নৈতিক চরিত্র ও সৌজন্যবোধের কারণে কুরাইশদের মধ্যে তিনি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। জাহেলী যুগেও সততা ও আমানতদারীতে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ أَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ رض - "উসমান (রা) সবার চেয়ে অধিক লজ্জাশীল।" (তিরমিযী)

তাঁর উচ্চতা ছিল মধ্যম, গাত্র বর্ণ ঈষৎ রক্তিম, নাসিকা উন্নত ও বক্র এবং গন্ডদেশ ছিল মাংসল। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। মুখমন্ডলে বসন্তের কয়েকটি দাগ ছিল। দাড়ি ছিল ঘন ও লম্বা। মাথায় ছিল বাবরি চুল। তিনি

www.amarboi.org

চুলে খিজাব ব্যবহার করতেন। দাঁতের বাঁধন ছিল ঘন সন্নিবিষ্ট উজ্জ্বল। তিনি দাঁতগুলো সোনার তার দিয়ে বেঁধে আরো মজবুত বানিয়ে নিয়েছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম প্রচার তৎপরতার ফলে চৌত্রিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (সা) তাঁকে নিজের জামাতার মর্যাদা দান করেন। পরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুইটি কন্যাকে বিয়ে করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এ কারণে যুন নূরাইন উপাধিতে ভূষিত হন।

ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের মত হযরত উসমান (রা)ও কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হন। ৫ হিজরীতে স্ত্রী সাইয়েদা রুকাইয়া (রা) বিনতে রাসূলের (সা) সাথে হাবশায় হিজরত করেন। মদীনায় হিজরত শুরু হলে তিনিও পরিবারবর্গের সাথে মদীনায় হিজরত করেন।

মদীনায় পৌঁছার পর মুহাজিররা সেখানে ভীষণ পানির কষ্টের সম্মুখীন হন। এক ইহুদীর বি'রে রুমা নামক একটি কূপ ছিল এবং গোটা শহরে এই একটি মাত্র কূপের পানি পানের উপযুক্ত ছিল। ইহুদী কূপটিকে তার জীবিকার মাধ্যম বানিয়ে রেখেছিল। মুহাজিরদের পানি কেনার সামর্থ ছিল না। হযরত উসমান (রা) ১৮ হাজার দিরহাম মূল্যে কূপটি খরিদ করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। অনুরূপ মসজিদে নববী অত্যন্ত স্বল্প পরিসর ছিল। হযরত উসমান (রা) মসজিদ সংলগ্ন জমি অনেক চড়া মূল্যে খরিদ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই পবিত্র মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। দুটি ক্ষেত্রেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।

বদর যুদ্ধের সময় হযরত উসমান (রা)-এর স্ত্রী সাইয়েদা রুকাইয়া বিনতে রাসূল (সা) যেহেতু ভীষণ অসুস্থ ছিলেন তাই তাঁর সেবা যত্নের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমানকে মদীনায় রেখে যান। কিন্তু তাঁকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং গনীমাতের মালের অংশও দেয়া হয়েছে। যাতুর রাকা' যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমানকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। সে কারণে তিনি এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। অবশিষ্ট সকল যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। অর্থ দ্বারা জিহাদের ক্ষেত্রে তিনি সকল সাহাবীদের মধ্যে অগ্রভাগে ছিলেন। অর্থ দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড় বড় খেদমত করে দোয়া লাভ করেছেন। নবী (সা) বলেন ঃ

www.amarboi.org

لِكُلِّ نَبِى رَفِيق و رَفِيقِى (يعنى) فى الجنة عثمان (ترمذى)

"প্রত্যেক নবীরই বন্ধু আছে। জান্নাতে আমার বন্ধু উসামন।"

(তিরমিযী)

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দূত হিসেবে মক্কার কাফেরদের কাছে প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কাবাসীরা হযরত উসমানকে (রা) শহীদ করেছে। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বৃক্ষের নীচে সাহাবীদের (রা) নিকট থেকে জীবন বাজি রেখে লড়াই করার জন্য বাই'আত গ্রহণ করেন। এই বাইআতে হযরত উসমানের (রা) পক্ষ থেকে তিনি নিজে তাঁর এক হাত আরেক হাতের ওপর রেখে বাই'আত করেন। এটা হযরত উসমানের (রা) ওপর চূড়ান্ত আস্থার বহির্প্রকাশ। এই বাইআতের নাম বাই'আতুর রিদওয়ান। কুরআন মজীদে এ বাই'আতের উল্লেখ করা হয়েছে। খাইবার যুদ্ধের সময় হযরত উসমান (রা) ক্যাম্পের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত উসমান (রা) তাঁর নিজের অর্থে দশ হাজার সৈনিককে সজ্জিত করে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া চাঁদা হিসেবে একহাজার উট, সত্তরটি ঘোড়া এবং এক হাজার দিনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশী হয়ে বলেছিলেন ঃ

مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ -

"উসমান (রা) যদি আজ থেকে আর কোন নেক কাজ নাও করে তবুও তার কোন ক্ষতি হবে না।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে তিনি অহী লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত উমর (রা) শাহাদাতের পর ৭০ বছর বয়সে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। বার দিন কম বার বছর খিলাফতের মসনদে সমাসীন থেকে ৮২ বছর বয়সে বিদ্রোহীদের হাতে নৃশংসভাবে শহীদ হন।

হযরত উসমানের (রা) প্রথম বিয়ে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা হযরত সাইয়েদা রুকাইয়ার (রা) সাথে। ২ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। একমাত্র সন্তান আবদুল্লাহ তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবেই মারা যান। অতপর ৩য় হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা সাইয়েদা উম্মে কুলসূমের (রা) সাথে বিয়ে হয়। তাঁর গর্ভে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি। ৬ষ্ঠ হিজরীতে সাইয়েদা উম্মে

www.amarboi.org

কুলসূমও (রা) ইনতিকাল করেন। পরে হযরত উসমান (রা) আরো কয়েকটি বিয়ে করেন এবং তাদের সবার গর্ভেই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে আবান ইবনে উসমান (রা) অধিক খ্যাতি লাভ করেন। বনী উমাইয়াদের শাসন যুগে তিনি অনেক সরকারী পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেন।

হযরত উসমানের (রা) খিলাফত

২৪ হিজরীর ১লা মুহাররাম থেকে ৩৫ হিজরীর ১৮ই যিলহাজ্জ,
৬৪৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর থেকে ৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন।

বাই'আতের পর হযরত উসমান (রা) বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। কিন্তু দায়িত্বানুভূতিতে এতই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, শুধু নিম্নোক্ত কথা বলেই বসে পড়লেন ঃ

"হে জনগণ, নতুন কোন সওয়ারীর পিঠে আরোহণ সহজ কাজ নয়। বক্তৃতার জন্য আজকের দিন ছাড়াও আরো বহুদিন আছে। যদি জীবিত থাকি তাহলে অন্য কোনদিন বক্তৃতা করবো।"

হযরত উসমান (রা) সমস্ত প্রদেশের গভর্নর ও সেনাধিপতিদের নামে ফরমান পাঠালেন। ফরমানে নির্দেশ দেয়া হলো, তারা যেন ন্যায় ও ইনসাফের দাবী অনুসারে কাজ করেন এবং আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার অনুসরণ করেন। মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য যেন না করেন। শত্রুদের সাথেও যেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না হয়। ইসলামী নেতৃবৃন্দের মর্যাদা হচ্ছে রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের মর্যাদা, তারা প্রজাকুলের প্রভু বা মনিব নয়।

হযরত উমরের শাহাদাত ছিল একটি ষড়যন্ত্রের ফল। এতে আবু লু'লু' ছাড়াও জাফিনা ও হরমুযান নামক দুইজন নওমুসলিমও জড়িত ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে। উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর বিষয়টি জানতে পেরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তিনি তাদের দু'জনকেই হত্যা করে ফেলেন। উবায়দুল্লাহ (রা) গ্রেফতার হন। হযরত উসমান খলিফা হওয়ার পর তাঁর দরবারে সর্ব প্রথম এই মোকদ্দমাটি পেশ করা হয়। বিষয়টি আলোচনার জন্য মজলিসে শুরায় পেশ করা হলে কেউ কেউ কিসাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কেউ আবার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। হযরত উসমান (রা) রক্তপণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ, নিহত দুই ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই বিষয়টি পুরোপুরি খলিফার এখতিয়ারাধীন ছিল। হযরত উসমান (রা) নিজে রক্তপণের অর্থ বায়তুল মালে জমা দেন। এ পন্থায় অতি উত্তমরূপে সমস্যাটির সমাধান হয়ে যায়।

www.amarboi.org

বিজয়সমূহ

হযরত উসমানের যুগের বিজয়সমূহ দুই ধরনের। একটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন বিজয়, আরেকটি ছিল হযরত উমর (রা)-এর সময় বিজিত যেসব এলাকা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো কিংবা শত্রুরা তার ওপর আক্রমণ করেছিল সেই সব এলাকা বিজয়। হযরত উসমান (রা) পুনরায় তা অধিকার করেন। দুই ধরনের বিজয় সম্পর্কেই এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

২৪ হিজরীতে হামদানবাসীরা বিদ্রোহ করে। হযরত মুগীরা (রা)-এর প্রচেষ্টায় তা পুনরায় বিজিত হয়। একই বছর রায়ের অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বারা ইবনে আযেবের মাধ্যমে তা পুনর্দখল করেন।

২৫ হিজরীতে আলেকজান্দ্রিয়াবাসীরা বিদ্রোহ করে। আমর ইবনুল আস (রা) এ বিদ্রোহ দমন করেন। এ বছরই হযরত আমীর মুআবিয়া রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে আমুদরিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌছেন।

২৬ হিজরীতে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। ওয়ালীদ বিন উকবার প্রচেষ্টায় তা পুনরায় অধিকারে আসে এবং ঐ বছরই আজারবাইজানের আশেপাশের এলাকসমূহও বিজিত হয়। একই বছর উত্তর আফ্রিকার ওপর আক্রমণ করা হলে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরের (রা) সাহসিকতা, বীরত্ব এবং যথার্থ ও দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে আলজিরিয়া ও মরক্কো বিজিত হয় এবং উত্তর আফ্রিকা মুসলিম অধিকারে আসে। এ যুদ্ধকে হারবুল আবাদিলা বলা হয়। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) ছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-ও এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

২৭ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া (রা) মিসর ও সিরিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান সাইপ্রাস দ্বীপের ওপর আক্রমণ করে তা দখল করেন। এটা ছিল মুসলমানদের প্রথম নৌযুদ্ধ। হযরত উসমানের (রা) অনুমতিক্রমে আবদুর রহমান ইবনে কায়েসের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী ও নৌবহর স্থায়ীভাবে প্রস্তুত করা হয়।

৩০ হিজরীতে সাইদ ইবনুল আসের (রা) বাহিনী জুরজান, খুরাসান ও তাবারিস্তান দখল করেন। এই বাহিনীতে হযরত হাসনাইন ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে উমর (রা), ইবনে যুবায়ের (রা) এবং ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-ও শরীক ছিলেন। একই বছর আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) হিরাত, কাবুল, সিজিস্তান, নিশাপুর এবং আশেপাশের সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল দখল করেন

www.amarboi.org

এবং মাওয়ারাউন নাহরের দিকে অগ্রসর হন। এভাবে ইরানের অবশিষ্ট সব অঞ্চলও মুসলমানদের দখলে চলে আসে।

৩১ হিজরীতে রোম সম্রাট কনস্টানটাইন ইবনে হিরাক্লিয়াস বিশাল এক নৌবহরের সাহায্যে আলেকজান্দ্রিয়ার ওপর আক্রমণ করেন। ইসলামী নৌবহর তার মোকাবিলা করে। প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে। কাইজার নিজে আহত হয়ে সেখান থেকে সিসিলি দ্বীপে চলে যান এবং সিসিলিবাসীদের হাতে নিহত হন।

৩২ হিজরীতে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর বিজয়াভিযান দার্দানেলিস প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ৩৩ হিজরীতে সাইপ্রাসবাসীরা বিদ্রোহ করলে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলমানরা পুনরায় তা দখল করে নেয়। এই সাথে আনাতোলিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল ও ভূমধ্য সাগরীয় বহু সংখ্যক দ্বীপ বিজিত হয়। এ সময় রোমান নৌবহরের সাথে পঞ্চাশটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং প্রতিটি যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করে। এ বছরই মুয়াবিয়া (রা) রোমের মূল ভূখন্ডে রওয়াত দুর্গ দখল করে নেন। খোরাসানবাসীরা বিদ্রোহ করে। আহনাফ ইবনে কায়েসের মাধ্যমে এ বিদ্রোহ দমন করা হয়।

৩৪ হিজরীতে তারাবেলসের অধিবাসীরা শান্তি ভঙ্গ করলে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ (রা) একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন এবং পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামে প্রথম ফিতনা ও
হযরত উসমানের (রা) শাহাদাত

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীর মুয়াবিয়ার (রা) বড় ভাই ইয়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ানকে সিরিয়া অভিযানের নেতৃত্ব অর্পণের সময় উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ

يَا يَزِيْدُ اِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ اَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْاِمَارَةِ وَذٰلِكَ اَكْبَرُ مَا اَخَافُ عَلَيْكَ

"হে ইয়াযীদ, তোমার বহু আত্মীয়স্বজন আছে। হয়তো তুমি তোমার নেতৃত্বের সুযোগে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেবে। আমি তোমার ব্যাপারে এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশী আশংকা করি।"[১]

১. মুসনাদে আহমদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৬।

www.amarboi.org

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ভবিষ্যতের জন্য যে আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে তাই বাস্তবে রূপ নেয়। হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে বনী আদীকে কোন বিশেষ সুযোগ দেননি।

হযরত উসমান (রা) প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও উদারমনা ছিলেন। আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি গুরুত্বারোপ তাঁর বিশেষ গুণ ছিল। তিনি বলেন ঃ

আমার হাতে যদি জান্নাতের চাবি থাকতো তাহলে আমি বনী উমাইয়ার সকলকে তাতে প্রবেশের অবাধ সুযোগ দিতাম।[১]

প্রথম দিকে হযরত উসমান (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর মত কোমলতা ও হযরত উমর ফারূকের (রা)-এর রাজনৈতিক পলিসি অনুসারে কাজ করে তাঁর উত্তম যোগ্যতার প্রমাণ দেন। কিন্তু এক বছর পরই কোন কারণে কিছু সংখ্যক গভর্নরকে পদচ্যুত করা হতে থাকে। অথচ তাঁরা ছিলেন বড় বড় সাহাবা। তাদের স্থানে হযরত উসমান (রা) তাঁর ঘনিষ্ঠ উমাইয়া আত্মীয়দেরকে তাদের কর্মকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে গভর্নর নিয়োগ করতে শুরু করেন।[২]

---

১. মুসনাদে আহমদ. প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬২।

২. এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, হযরত উমরের খিলাফতের শেষভাগে কুফার গভর্ণর ছিলেন হযরত মুগীরা (রা)। হযরত উমরের (রা) অসীয়ত অনুসারে হযরত উসমান (রা) তাঁর পরিবর্তে হযরত সাদকে (রা) কুফার গভর্নর করেন। ২৬ হিজরীতে হযরত সা'দ (রা) ও কোষাগার প্রধান হযরত ইবনে মাসউদের (রা) মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। তাই হযরত উসমান (রা) হযরত সাদকে পদচ্যুত করে নিজের বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ৩০ হিজরীতে ওয়ালীদ ইবনে উকবার বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাকেও পদচ্যুত করা হয় এবং তাঁর স্থানে হযরত উসমান (রা)-এর এক জ্ঞাতি ভাই সাঈদ ইবনুল আস (রা)-কে গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালের সূচনাতে হযরত আবু মূসা আশ'আরী বসরার গভর্ণর ছিলেন। ২৯ হিজরীতে লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে হযরত উসমান (রা) তাঁকে পদচ্যুত করে নিজের খালাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আমেরকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালের শেষ পর্যন্ত সেখানকার গভর্নর ছিলেন।

মিসরের গভর্নর ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস (রা)। কিন্তু সাইদে মিসর অঞ্চল হযরত উসমানের দুধ ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর শাসনাধীন থাকে। ২৭ হিজরীতে আমর ইবনুল আসকে (রা) পদচ্যুত করা হয়। তাঁর পরিবর্তে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে সমগ্র মিসরের গভর্নর নিয়োগ করা হয় এবং হযরত উসমানের (রা) শাহাদাত পর্যন্ত তিনি সেখানকার গভর্নর থাকেন। (অপর পৃঃ দ্রঃ)

www.amarboi.org

বনু উমাইয়ারা বিশেষভাবে খলিফার দরবার থেকে আনুকূল্য লাভ করে লাভবান হতে থাকে। বলা চলে তারা খিলাফতের ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করে। মারওয়ানের মত ব্যক্তি মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও প্রধান সচিব নিয়োজিত হয়। সাইয়েদেনা হযরত উসমানের (রা) সৎ নিয়তের প্রতি আদৌ সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে না। তবে প্রয়োজন ছিল গভর্নরদের ওপর হযরত উমর (রা)-এর মত কড়া তত্ত্বাবধান ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ। যেসব কারণে অভিযোগ সৃষ্টি হতে পারে তার প্রতিটি পথ কঠোরতার সাথে বন্ধ করা প্রয়োজন ছিল। তাহলে মানুষের জন্য গোলযোগ সৃষ্টি করার কোন সুযোগই থাকতো না। কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষে কঠোরতা অবলম্বন ছিল অসম্ভব। তাঁর কোমলতা গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ দেয়। নিম্নোক্ত আলোচনা থেকেই বিষয়টি জানা যায়ঃ

হযরত উসমান (রা) হযরত আলী (রা) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ দেশে বর্তমান গোলযোগের প্রকৃত কারণ কি? এবং তার নিরসনের উপায়ই বা কি? হযরত আলী (রা) অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বাধীনভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বললেন যে, বর্তমান অস্থিরতার সবটাই আপনার গভর্নরদের সীমা লংঘনের ফল। হযরত উসমান বললেনঃ গভর্নরদের নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত উমর ফারূক (রা) যেসব গুণাবলীর প্রতি লক্ষ রাখতেন গভর্নরদের নির্বাচনের ব্যাপারে আমিও সেসব গুণাবলী বিবেচনা করেছি। তা সত্ত্বেও আমি তাদের প্রতি এই গণঅসন্তোষের কোন কারণ বুঝতে পারছি না। হযরত আলী (রা) বললেনঃ আপনার কথা ঠিক। কিন্তু উমর (রা) সবার লাগাম নিজের হাতে রেখেছিলেন। তাঁর নিয়ন্ত্রণ এমন কঠোর ছিল যে, আরবের চরম বিদ্রোহী

সিরিয়ার গভর্নরকে আদৌ পরিবর্তন করা হয়নি। হযরত উসমানের (রা) জ্ঞাতি ভাই মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান (রা) হযরত উমরের (রা)-এর সময় থেকে হযরত উসমানের (রা) খিলাফতের শেষভাগ পর্যন্ত সিরিয়ার গভনরীতে বহাল থাকেন এবং তিনিই ছিলেন সেখানকার সর্বেসর্বা।

হযরত উসমানের (রা) জ্ঞাতি ভাই মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার পিতাসহ নবী (সা)-এর যুগ থেকে হযরত উমর ফারূকের (রা) যুগ পর্যন্ত তায়েফে নির্বাসিত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছেন বলে হযরত উসমান (রা) তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসেন এবং প্রধান সচিব ও মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। খলিফার সীলমোহর তার কাছেই থাকতো। হযরত উসমান (রা) তাকে জামাতা হিসেবেও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয় যে, লোকটি অত্যন্ত ফিতনাবাজ। এমনকি তার ফিতনাবাজির ফলেই হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়।

মারওয়ান সাহাবী ছিল না। তার অপরাধসমূহ জানার জন্য পড়ুন রাসায়েলুল আরকান, শারহু বাহরিল উলূম, ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়া, লিসানুল মীযান ও তাহযীব প্রভৃতি গ্রন্থ।

www.amarboi.org

দুর্জন ব্যক্তিও যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠতো। কিন্তু আপনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়। এই কোমলতার সুযোগ নিয়ে আপনার গভর্নরগণ স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি তা আদৌ জানতে পারেন না। জনগণ মনে করে আপনার গভর্নররা যা করছে তা আপনার নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে সমস্ত সীমা লংঘনের দায়দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে এসে পড়েছে।[১]

হযরত উসমানের (রা) খিলাফত কালের ছয় বছর পর্যন্ত সরকার ব্যবস্থা যথার্থ ছিল। এই সময় সামরিক তৎপরতা কম ছিল। উমাইয়া শাসকদের কারণে বিভিন্ন প্রদেশে অভিযোগ সৃষ্টি হতে থাকে। অভিযোগসমূহ খলিফার দরবারে পৌঁছানো হতো। হযরত উসমান (রা) তা নিরসনের চেষ্টা করতেন। কিন্তু মূল কারণ যথাস্থানে থেকেই যেতো। উমাইয়া প্রভাবের কারণে তা একেবারেই অসম্ভব ছিল। মোদ্দা কথা, সকল প্রদেশে বিশেষ করে মিসর, কুফা ও বসরায় অসন্তোষ ও বিরোধিতার আগুন জ্বলে উঠলো। মিথ্যা অভিযোগ ও অহেতুক প্রচার-প্রোপাগান্ডার সাহায্যে ইবনে সাবা বিদ্রোহের এই আগুনে আরো ইন্ধন যোগাতে থাকলো।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল ইয়ামানের অধিবাসী একজন ধূরন্ধর ইহুদী। সে মদীনায় এসে কপটভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া। সে এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাইলো এবং সে জন্য পন্থা উদ্ভাবন করলো এই যে, বনী উমাইয়া ও বনী হাশেমের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে দুটি প্রতিদ্বন্দী গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে হবে।

জাহেলী যুগে বনী হাশেম ও বনী উমাইয়া ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী। তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্যও বিদ্যমান ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু হাশেমী ছিলেন তাই নবুওয়াত লাভের পর বনী উমাইয়া গোষ্ঠীর কতিপয় পবিত্র হৃদয় ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত উসমান প্রমূখ ছাড়া বনী উমাইয়ার অধিকাংশ লোক ইসলাম বিরোধী ও ইসলামের নবীর (সা) শত্রু থেকে যায়। কারণ, ইসলামের উন্নতিকে তারা বনী হাশেমের উন্নতি মনে করতো। বদর যুদ্ধের পর মক্কার কাফেররা মদীনার ওপর যত আক্রমণ পরিচালনা করেছে তার নেতৃত্ব দান করেছেন হযরত মুয়াবিয়ার (রা) পিতা হযরত আবু সুফিয়ান (রা)। উহুদ যুদ্ধের দিন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা)-এর তাজা কলিজা চিবিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরোধ হ্রাসের লক্ষ্য সামনে রেখে আবু

১.তারিখে তাবারী।

www.amarboi.org

সুফিয়ানের কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর বনী উমাইয়া গোষ্ঠীর সমস্ত লোক সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই সময় থেকেই তারা ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে যান এবং সমস্ত মতবিরোধ পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইবনে সাবা একটি গোপন দল গঠন করে। এইদল বাহ্যত রাসূল (সা) ও আহলে বায়েতের প্রতি ভালবাসাকে তাদের দাওয়াত ও তাবলীগের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ বানায়। কিন্তু এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করে বনী হাশেমকে সমর্থনের সপক্ষে বক্তৃতা এবং বনী উমাইয়াকে গালাগালি ও অভিশাপ দিতে শুরু করে। এভাবে তারা জনগণকে হযরত উসমান (রা) ও তাঁর গভর্ণরদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে থাকে। তার তৎপরতার কেন্দ্র ছিল মিসর। অন্যান্য প্রদেশেও তার এজেন্ট ছিল। গভর্নরদের নির্যাতনের অসংখ্য চিঠিপত্র মদীনায় আসতে থাকে। লোকজন নিজেরাও স্বতন্ত্রভাবে এসে শোচনীয় দুঃখ দুর্দশার কথা বলে হৈ চৈ করতে শুরু করে।

সিরিয়ায় হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সুব্যবস্থার কারণে বিরোধিতা কম ছিল। কিন্তু সেখানেও আকস্মিকভাবে একটি ঘটনা ঘটে। হযরত আবু যর (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। হযরত আবু যর (রা) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তার মতবাদ ছিল, বায়তুলমালে অর্থ আসা মাত্রই তা বন্টন করে দিতে হবে। সম্পদ জমিয়ে রাখা যাবে না। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) মতামত ছিল যাকাত আদায়ের পর যত সম্পদই জমা হোক না কেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। জনকল্যাণের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে সঞ্চিত করা যায়। তার ওপর সরকার প্রধানের কর্তৃত্ব খাটানোর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। হযরত আবু যর (রা)-এর আন্দোলনের কারণে গরীবরা ধনীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং মুসলমানদের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের প্রশ্নে নতুন মতানৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ব্যাপারে হযরত উসমান (রা) ছিলেন নিরুপায়। তবে হযরত আবু যর (রা)-কে মদীনায় ডেকে পাঠানো হয়। সেখানেও তাঁর অবস্থান যুক্তিযুক্ত মনে হলো না। তাই তিনি মদীনা থেকে দূরে অবস্থিত রাবযা নামক স্থানে বসবাসের অনুমতি নিয়ে সেখানে গিয়ে নির্জনবাসী হয়ে যান। ৩২ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

গোলযোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৩৪ হিজরীতে হযরত উসমান (রা) সমস্ত গভর্নরদের এক পরামর্শ সভা আহবান করেন। মতানৈক্য নিরসনের পন্থা উদ্ভাবনই ছিল এই পরামর্শ সভার মূল লক্ষ্য। গভর্নরগণ সমবেত হন।

www.amarboi.org

অধিকাংশই বলেন কঠোরতা প্রদর্শন করা হোক। কিন্তু হযরত উসমান (রা) তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন ঃ

"আমার আশংকা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফিতনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এটা সেই ফিতনা না হয়ে দাঁড়ায়। এটা যদি সেই ফিতনাই হয় তাহলে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে আমি যথাসম্ভব কোমলতা ও ক্ষমাশীলতার সাথে চেষ্টা করবো যাতে সেই ফিতনার দরজা উন্মুক্ত না হয়।"

আমীরে মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে বললেন ঃ আপনি আমার সাথে সিরিয়া চলুন। অন্যথায় ভয়ানক বিপদ দেখা যাচ্ছে। তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার স্কন্ধ শিরা কর্তিত হলেও আমি রাসূলের প্রতিবেশী হওয়া থেকে বঞ্চিত হতে রাজি নই। আমীর মুয়াবিয়া বললেন ঃ নিরাপত্তা ফৌজ পাঠিয়ে দেই ? হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়াও আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। হযরত উসমান (রা) গভর্নরদের বিদায় করে দিলেন। এদিকে বিদ্রোহীরা ফন্দি এঁটেছিল যে, পরামর্শ সভা থেকে গভর্নররা ফিরে আসলে তারা তাদেরকে প্রদেশসমূহে প্রবেশ করতে দেবে না এবং এভাবে গণবিদ্রোহ শুরু করা হবে। কিন্তু তাদের কৌশল কাজে আসলো না। তবে উশতার নাখয়ী কুফার গভর্নর সাইদ ইবনুল আসকে (রা) কুফায় প্রবেশ করতে দিলেন না। হযরত উসমান (রা) কুফাবাসীদের ইচ্ছানুসারে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা)-কে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করলেন।

গভর্নরদের প্রত্যাবর্তনের পর খলিফার দরবার থেকে তদন্ত প্রতিনিধিদল পাঠানো হলো। কিন্তু একমাত্র মিসর ছাড়া অন্য সব প্রদেশের তদন্ত রিপোর্ট বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গেল। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটল। অকস্মাত মিসরের কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় এসে উপস্থিত হলো এবং মিসরের শাসক আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর নির্যাতনের বিরুদ্ধে হযরত উসমান (রা)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলো। হযরত উসমান (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে তিরস্কার করে চিঠি লিখলেন। এতে ক্ষমা প্রার্থনা বা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়ার পরিবর্তে সে অভিযোগকারীদেরকে বেদম প্রহার করলো। ফলে তাদের একজন মারা গেল। এ ঘটনার পরপরই মিসরের প্রায় সাতশ লোক মদীনায় গিয়ে হাজির হয় এবং মসজিদে নববীতে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করেন। একই সময় বসরা এবং কূফার বিদ্রোহীরাও এসে পৌছে। গোলযোগ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। হযরত উসমান (রা) ফিতনা ফাসাদ দমন এবং জনগণের যথার্থ অভিযোগের প্রতিবিধান করতে সব সময়ই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এই জনসমাবেশের খবর শুনে হযরত আলীকে (রা) ডেকে বললেন, আপনি এসব লোককে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে

www.amarboi.org

দিন। আমি তাদের বৈধ দাবীসমূহ মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। এখন থেকে আমি আর বনী উমাইয়াদের পক্ষপাতিত্ব করবো না। মারওয়ান, মুয়াবিয়া, ইবনে আমের, ইবনে আবী সারাহ্ এবং সাইদ ইবনুল আসের ইংগিতে কাজ করবো না। বড় বড় সাহাবা কিরাম (রা)-এর পরামর্শ অনুসারে খিলাফতের কাজকর্ম সম্পাদন করবো। সুতরাং তিনি মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সারাহকে পদচ্যুত করে মিসরীয় প্রতিনিধি দলের ইচ্ছানুসারে তার স্থানে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকরকে (রা) মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। মোট কথা হযরত আলী (রা)-এর মধ্যস্থতায় বিদ্রোহীরা ফিরে যায়। ঘটনা তদন্তের জন্য মুহাজির ও আনসারদের একটি দলও তাদের সাথে যাত্রা করে। জুমআর দিন হযরত উসমান (রা) মসজিদে বক্তৃতা করলেন এবং বিস্তারিতভাবে তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। লোকজন সবাই আনন্দিত হলো এই ভেবে যে, এখন বিরোধ ও বিপর্যয়ের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। একদিকে বনী উমাইয়াদের শক্তি খর্ব হবে অপর দিকে ফিতনা-ফাসাদের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এদিকে মিসরীয় প্রতিনিধি দলটি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে সবেমাত্র তিন মনযিল পথ অতিক্রম করেছে এমন সময় দেখা গেল একজন হাবশী দাস উটের পিঠে সওয়ার হয়ে অতিদ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সন্দেহ হওয়ায় তাকে পাকড়াও করা হলো। সে বললো ঃ আমীরুল মুমিনীন আমাকে মিসরের গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কার ক্রীতদাস ? জবাবে সে কখনো বলছিলো, আমি আমীরুল মুমিনীনের ক্রীতদাস। আবার কখনো বলছিলো মারওয়ানের ক্রীতদাস। দেহ তল্লাশী করা হলে তার নিকট আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর নামে লিখিত একখানা পত্র পাওয়া গেল। পত্রের ওপর হযরত উসমানের সীলমোহর লাগানো ছিল। পত্রের বিষয়গুলো ছিল এই যে, মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা) এবং তার সংগী-সাথীদের হত্যা করে ফেলো। এই পত্র দেখে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা) ও তার সংগী-সাথীরা উত্তেজিত হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত তালহা, যুবায়ের, সাদ ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের ডেকে পত্র দেখান। তারা সবাই পত্র, উটনী ও ক্রীতদাসকে নিয়ে হযরত উসমান (রা)-এর কাছে হাজির হলেন। হযরত উসমান (রা) কসম করে পত্র অস্বীকার করলেন। পরে জানা গেল পত্রদাতা হচ্ছে মারওয়ান। হযরত উসমান (রা)-এর ব্যাপারে সবাই সন্দেহ মুক্ত হলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা দাবী করে বসলো যে, মারওয়ানকে আমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। হযরত উসমান (রা) তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এই টানাপোড়েনের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে চললো। এবার বিদ্রোহীরা দাবী করে বসলো যে, হযরত উসমান (রা)কে খিলাফতের মসনদ থেকে সরে যেতে হবে। হযরত উসমান

www.amarboi.org

(রা) বললেন ঃ আমার মধ্যে জীবনের লেশমাত্র যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি আল্লাহর দেয়া খিলাত নিজ হাতে খুলে ফেলবো না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অছীয়ত অনুসারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করবো।

হযরত উসমান (রা)-এর অস্বীকৃতির কারণে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁর বাড়ী অবরোধ করে। অবরোধ চল্লিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময় তাঁর বাড়ীতে পানি পৌঁছানোও অপরাধ ছিল। হযরত আলী (রা) অতি কষ্টে কয়েকবার পানি পৌঁছান। হযরত উসমান (রা) কয়েকবার বিদ্রোহীদের বুঝানোর চেষ্টা করেন, মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের ওপর তার কোন প্রভাবই পড়ে না। ভক্ত অনুরক্ত এবং আনসার ও মুহাজিরগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা) তাদেরকে সে অনুমতিও দেন না। তিনি বলেন, আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে প্রথম রক্তপাতকারী খলিফা হতে চাই না। তিনি আরো বলেন ঃ আমি জনগণকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি তারা যেন আমার জন্য নিজেদের রক্তপাত না করে। হযরত আলী (রা), তালহা (রা), যুবায়ের (রা) ও সাদ (রা) প্রমূখ তাদের কর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না। কারণ, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি নেই। তাঁরা তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু খলিফার পদত্যাগ অথবা মারওয়ানকে হস্তান্তর ছাড়া তারা তাদের স্থান ত্যাগ করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বাধ্য হয়ে হযরত আলী (রা) হযরত হাসান (রা) ও হযরত হোসাইন (রা)কে সশস্ত্র অবস্থায় হযরত উসমান (রা)-এর বাড়ীর দরজায় মোতায়েন করলেন যাতে কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। হযরত তালহা (রা) এবং যুবায়েরও (রা) তাদের ছেলেদের একইভাবে মোতায়েন করলেন। প্রতিরোধ করতে গিয়ে হযরত ইমাম হাসান আঘাত প্রাপ্ত হলেও আপন জায়গায় অনড় থাকলেন, কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলেন না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তার শাহাদাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই হযরত উসমান (রা) নবী (সা)-এর এ উপদেশ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। শাহাদাত লাভের দিনটি ছিল জুমআর দিন এবং ঐ দিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। স্বপ্নে দেখলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর (রা) তাঁর সামনে উপস্থিত। তাঁরা তাঁকে বলছেন ঃ উসমান (রা) জলদি করো। আমরা তোমার ইফতারের অপেক্ষায় আছি। ঘুম

www.amarboi.org

থেকে জেগে উপস্থিত সবাইকে স্বপ্নের কথা শুনিয়ে বললেন ঃ আমার শাহাদাতের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। এরপর তিনি পাজামা পরলেন, বিশজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করলেন এবং কুরআন শরীফ খুলে তিলাওয়াত করতে থাকলেন।

বিদ্রোহীরা দেখলো, হজ্জের মওসুম শেষ হয়েছে। লোকজন অচিরেই মদীনায় ফিরে আসবে এবং সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তাই তারা তাঁকে হত্যার জন্য পরামর্শ শুরু করলো এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে উপনিত হলো। মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকরের সাথে চারজন বিদ্রোহী অগ্রসর হয়। দরজা দিয়ে প্রবেশ অসম্ভব ছিল। হযরত হাসান (রা), হুসাইন (রা) প্রমূখ উন্মুক্ত তরবারি হাতে দরজায় প্রস্তুত ছিলেন। তাই তারা দরজা ছেড়ে প্রাচীর টপকিয়ে ছাদে ওঠে। অগ্রভাগে ছিল মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর। এরা সবাই হযরত উসমান (রা)-এর কাছে গিয়ে পৌছে। মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর অগ্রসর হয়ে হযরত উসমান (রা)-এর দাড়ি ধরে সজোরে টান দেয়। হযরত উসমান (রা) বলেন ঃ ভাতিজা, তোমার পিতা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে এ দৃশ্য মোটেই পসন্দ করতেন না। একথা শোনামাত্র সে ফিরে যায়। অন্য দুরাচাররা অগ্রসর হয়ে হামলা করে। একজন লৌহদন্ড দিয়ে আঘাত করলে তিনি একপাশে পড়ে যান। 'বিসমিল্লাহি তাওয়াককালতু আলাল্লাহ' মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। দ্বিতীয়জন বর্শা দিয়ে আঘাত করে। কুরআন মজিদ খোলা ছিল। 'ফাসা ইয়াকফী কাহুমুল্লাহ' আয়াতাংশের ওপর রক্তের ছিটা পড়ে। তৃতীয়জন তরবারি দিয়ে আঘাত করে। বিশ্বস্ত স্ত্রী নায়েলা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করেন। তাঁর তিনটি আঙুল কেটে পড়ে। তরবারির দ্বিতীয় আঘাত যুননুরাইনের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করে দেয়। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

৩৫ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ জুম'আর দিন আসরের সময় সাইয়েদেনা উসমান (রা) শাহাদাত লাভ করেন। লাশ দুইদিন পর্যন্ত দাফনহীন অবস্থায় থাকে। রাসূলের হারাম পবিত্র মদীনায় যেন কিয়ামত সংঘটিত হলো। এই সময় বিদ্রোহীরাই ছিল দন্ডমুন্ডের অধিকারী। তাদের ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে দাফন কাফনের সাহসও পায়নি। শনিবার দিন দিবাগত রাত্রে কতিপয় মুসলমান জীবন বাজি রেখে জানাযা আদায় করে। কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত ভূখন্ডের শাসকের জানাযা পড়ে মাত্র সতের জন মানুষ। অতপর জান্নাতুল বাকীর পেছনে হাশ্‌শে কাওকাবে তার পবিত্র দেহকে সমাহিত করা হয়।

মুসলমান কর্তৃক মুসলমানের ওপর তরবারির আঘাত এটাই প্রথম। উম্মতের মধ্যে সৃষ্ট এটাই প্রথম ফিতনা। এই ফিতনা নবুওয়াতের কল্যাণের

www.amarboi.org

ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে ফেলে। এভাবে ইসলামী ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি হয়।

হযরত আলী (রা) মসজিদ থেকে বেরিয়ে হযরত উসমান (রা)-এর বাড়ীর দিকে যাওয়ার সময় পথিমধ্যেই তাঁর শাহাদাতের খবর পান। হযরত আলী (রা) দুই হাত তুলে বলেন ঃ হে খোদা, আমি উসমানের (রা) রক্তপাত থেকে মুক্ত। বিদ্রোহীদের দেখামাত্র তিনি বললেন تَبًّا لَّكُم اخِرَ الدَّهرِ (এখন থেকে সব সময় তোমাদের মধ্যে ধ্বংসকারিতা চলতে থাকবে।) সাহেবে আসরার হযরত হুযায়ফা (রা) মন্তব্য করলেন ঃ আফসোস ! উসমানের (রা) হত্যার কারণে ইসলামে এমন ফাটল সৃষ্টি হলো যা কিয়ামত পর্যন্তও আর বন্ধ হবে না। আহলে কিতাবদের পন্ডিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেন, ঃ উসমান (রা) শহীদ হলেন। এখন ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে সব সময় খুন খারাবি চলতে থাকবে। রাসূলের (সা) দরবারের কবি কা'ব ইবনে মালেক বলেন ঃ

يا قاتل الله قوما كان امرهم - قتل الا مام الزكى الطيب الردن
ما قتلوه على ذنب الم به - الا الذى نظقوا زورا و لم يكن-

"আল্লাহ্ সেইসব লোকদেরকে ধ্বংস করুন যারা পবিত্র ও নিষ্কলুষ ইমামকে হত্যা করেছে। তিনি কোন গোনাহ্ করেননি যে কারণে তারা তাকে হত্যা করেছে। তারা তাঁকে হত্যা করেছে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে।"

খিলাফত ব্যবস্থা, কৃতিত্ব ও সংস্কার কার্যাবলী

খলিফা হিসেবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত সফল ছিলেন। তাঁর খিলাফতের সূচনাপর্বে বিজিত অঞ্চলসমূহে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয় কিন্তু হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবলের সাথে সেসব বিদ্রোহ দমন করে বিজিত এলাকাসমূহের আয়তন আরো বৃদ্ধি করেন। তিনি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করে তার সাহায্যে বড় বড় দ্বীপ অধিকার করেন। বিজিত দেশসমূহে সরকারের ভিত্তি এমন মজবুত করেছিলেন যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘাতের সময়ও বিদ্রোহ ঘোষণার সাহস তাদের হয়নি।

কিতাব ও সুন্নাতের গন্ডির মধ্যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী সরকারের সূচনা হয়। হযরত ফারুকে আযম (রা) তাকে পূর্ণতা দান ও সুসংগঠিত করেন। হযরত উসমান (রা)-ও তাঁর খিলাফত যুগের প্রথম দিকে এই আদর্শ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখেন। কিন্তু শেষ দিকে বনী উমাইয়াদের আধিপত্য

www.amarboi.org

নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। হযরত উসমান (রা)-এর সরলতার অবৈধ সুযোগ নিয়ে মারওয়ান খিলাফতের কাজকর্মে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। তা সত্ত্বেও কোন ব্যাপারে হযরত উসমান (রা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সাথে তার প্রতিকারের চেষ্টা করতেন। খিলাফতের শেষ দিকে মজলিসে শুরা ব্যবস্থা যদিও অবশিষ্ট ছিল না তথাপি নিজেদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ এবং গভর্নরদের সমালোচনা করার অধিকার জনগণের ছিল। জনমতের প্রতিও গুরুত্ব দেয়া হতো।

দেশে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বার্থে হযরত উসমান (রা) গভর্নরদের একটি মজলিসে শুরা গঠন করেছিলেন। এই মজলিসের সদস্যদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত মতামত চাওয়া হতো। রাজধানীতে নিয়মিত এর বৈঠকও বসতো।

ব্যাপক বিজয়ের কারণে প্রদেশসমূহকে আরো অধিক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। সিরিয়াকে ত্রিশটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। সাইপ্রাস, আর্মেনিয়া ও তাবারিস্তান স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা লাভ করেছিল। সর্বাপেক্ষা বড় প্রদেশ ছিল পাঁচটি। এসব স্থানে সামরিক কেন্দ্রও ছিল। অন্যান্য প্রদেশ ছিল এসব প্রদেশের অধীন। সমস্ত প্রদেশেই আলাদা আলাদা গভর্নর থাকলেও এই পাঁচটি প্রদেশের শাসকগণ গভর্নর জেনারেলের মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন। এসব প্রদেশ ও তার গভর্নরদের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

সিরিয়া—মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান
মিসর—আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ
বসরা—আবদুল্লাহ ইবনে আমের
কুফা—আবু মূসা আশআরী
কানসারীন—মাসলামা ফাহরী

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত যুগে বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক উকবা ইবনে আমের এবং বিচারক ছিলেন যায়েদ ইবনে সাবেত। গভর্নরদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত তদন্ত প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা), ইবনে উমর (রা) ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা)। প্রথম প্রথম গভর্নরদেরকে কঠোর তত্ত্বধানে রাখা হতো।

হযরত উমর (রা) দেশের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য যে কর্মপ্রণালী বিধি প্রণয়ন করেছিলেন হযরত উসমান (রা) তা অবিকল বহাল রাখেন। ভিন্ন ভিন্ন যেসব বিভাগ ও দফতর কায়েম ছিল সেগুলোকে সুবিন্যস্ত করে আরো উন্নত করেন। শুল্ক যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তিনি জনগণের বেতন ভাতাও বৃদ্ধি করেন।

www.amarboi.org

হযরত উসমান (রা)-এর সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। সাধারণভাবে দেশ ছিল সচ্ছল। জনগণ বিভিন্ন স্থানে বড় বড় জায়গীর প্রতিষ্ঠিত করেছিলো।

দেশে নির্মাণ তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রদেশসমূহে বিভিন্ন দফতরের জন্য ইমারাত নির্মিত হয়েছিল। পুল, মসজিদ, মুসাফিরখানা ও মেহমানখানা নির্মাণ করা হয়েছিলো। কোন কোন সময় খায়বারের দিক থেকে মদীনার দিকে মারাত্মক বন্যার পানি প্লাবণের আকারে আসার কারণে অত্যন্ত কষ্ট হতো। হযরত উসমান (রা) মদীনা থেকে কিছু দূরে বাঁধ নির্মাণ করেন। ফলে প্লাবনের গতিপথ পাল্টে যায়। এটির নাম ছিল মাহজুর বাঁধ। ২৯ হিজরীতে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মসজিদে নববী পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ জন্য আশপাশের ভূমি ক্রয় করেন। দশ মাসের ক্রমাগত চেষ্টার পর ইট, চুন ও পাথরের সমন্বয়ে একটি মজবুত ইমারত নির্মিত হয়। মজবুত ও সৌন্দর্যমন্ডিত করার সাথে সাথে তার আয়তনও বৃদ্ধি করা হয়। সামরিক ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা) প্রবর্তিত ব্যবস্থা বহাল রেখে তার উন্নয়ন সাধন এবং সেনা ছাউনির সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। সেনাবাহিনীর ঘোড়া ও উটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে চারণ ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটানো হয়। ইসলামী শাসনযুগে হযরত উসমান (রা)-এর সময়ই সর্ব প্রথম নৌবহর গঠন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি ও খলিফা হিসেবে হযরত উসমান (রা)-এর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। যেসব যুদ্ধবন্দী আসতো খলিফা নিজে তাদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। মুসলমানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে হযরত উসমান (রা) নিজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। তিনি জনগণকে ফিকাহর মাসয়ালা বলতেন এবং নিজে কার্যত তা শিক্ষা দিতেন। নিজে ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে হিসেব নিকেশের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের (রা) সহযোগিতায় তিনি ফারায়েজ শাস্ত্র যথারীতি বিন্যস্ত করেন।

হযরত উসমান (রা)-এর সব চাইতে বড় কৃতিত্ব হলো কুরআন মজীদকে মতানৈক ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা ও তার ব্যাপক প্রচার। ৩০ হিজরীতে আজারবাইজান ও বাবু আবওয়াব বিজিত হওয়ার পর বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চলের সেনাদের একত্র সমাবেশ ঘটলে তাদের কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে অদ্ভুত পার্থক্য দেখা দেয়। মিরসীয়, ইরাকী ও সিরীয়দের উচ্চারণভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে কিরায়াতেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়। উপরন্তু প্রত্যেকেই নিজের কিরায়াত বিশুদ্ধ এবং অন্যদের কিরায়াতকে ভুল মনে করতে থাকে। এ অবস্থা

www.amarboi.org

দেখে হযরত হুযায়ফা (রা) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি হযরত উসমান (রা) কে ঘটনা জানালে তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) সাথে পরামর্শ করলেন। অতপর সবার মতামতের ভিত্তিতে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, হযরত ইবনে যায়েদ এবং সাইদ ইবনুল আসকে দিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সময়ে লিখিত মাসহাফের আটটি কপি করিয়ে তার এক একটি কপি বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে কুরআনের নির্ভরযোগ্য কপি প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সাথে সাথে হযরত উসমান (রা) এ নির্দেশও জারী করেন যে, যেসব মাসহাফ জনগণ নিজেরা লিপিবদ্ধ করেছে তা ভূপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। এ নিদের্শ সাথে সাথে পালন করা হয়। একথা সুস্পষ্ট যে, যদি এই মতভেদ দূর করার চেষ্টা করা না হতো তাহলে তাওরাত, ইনযীল ও অন্যান্য আসমানী সহীফাসমূহের যে অবস্থা হয়েছে কুরআনেরও সেই একই অবস্থা হতো।

অভ্যাস, চরিত্র ও মর্যাদা

হযরত উসমান (রা) ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম, ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এবং ফকীহ সাহাবী। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা ও ফুফুর দৌহিত্র। জন্মগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, পবিত্র, সত্যবাদী, দীনদার ও পরহেযগার। জাহেলী যুগেও কখনো তিনি মদ্যপান, মিথ্যা ও পাপাচার দ্বারা নিজেকে কলুষিত করেননি। লজ্জাশীলতা ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। আল্লাহর ভয়ে সব সময় তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত থাকতো।

হযরত উসমান (রা)-এর চরিত্রে সৎনিয়ত, দয়ামায়া ও সৌজন্যবোধের প্রভাব ছিল প্রবল। সমসাময়িক কালে আরবে হযরত উসমানের মত ধনী আর কেউ ছিল না। এই অস্বাভাবিক ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের কারণে তাঁকে গনী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিলো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও উদার।

হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। তাই উমরের (রা) মত মোটা ও সাধারণ কাপড় পরিধান এবং সাদামাটা খাবার খেতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি কখনো আমীরানা ঠাটবাটে জীবন যাপন করেননি কিংবা কখনো সাজগোজের উপকরণও ব্যবহার করেননি। তবে তিনি নরম, হালকা ও সহজে হজমযোগ্য খাদ্য গ্রহণ করতেন। সর্বদা বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের সাথে নিয়ে খাবার খেতেন। উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। তাও আবার খুব কমই চার পাঁচ দিরহাম মূল্যের হতো। অর্থহীন লৌকিকতা থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। আতর ব্যবহার করতেন। মেজাজে ছিল পরিচ্ছন্নতা। প্রতিদিন গোসল করতেন। তাঁর মধ্যে নম্রতা ও

www.amarboi.org

সরলতা এত অধিকমাত্রায় ছিল যে, বাড়ীতে স্ত্রী ও দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও নিজের কাজ নিজেই করতেন। কখনো কখনো মসজিদে শুয়ে পড়তেন। ফলে পাঁজরে পাথরের দাগ পড়ে যেতো। কেউ কটূবাক্য ব্যবহার করলেও তাকে নম্র ভাষায় জবাব দিতেন। অন্যকে অগ্রাধিকার দান ছিল তাঁর আরো একটি বিশেষ গুণ। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর অন্যদের স্বার্থকে সব সময় অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁর খিলাফতকালে তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বায়তুল মাল থেকে একটি কপর্দকও গ্রহণ করেননি। নিজের জন্য নির্ধারিত ভাতাও অন্য মুসলমানদের জন্য ব্যয় করেছেন।

বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টকে হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত ধৈর্য ও প্রশান্তির সাথে সহ্য করতেন। শাহাদাত লাভের সময় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি যে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তার কোন তুলনা নেই। তিনি সেই সময় এমন কোন কথা বলেননি যা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারতো। শত শত ক্রীতদাস, আনসার ও সহযোগী জীবনপাত করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তিনি মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে রক্তপাতের অনুমতি দিতে কখনো রাজি হননি।

দিনের অধিকাংশ সময় তার খিলাফতের কর্মকান্ডে ব্যয়িত হতো এবং রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদাত ও সাধনায় কেটে যেতো। কখনো কখনো সারা রাত জাগতেন এবং এক রাকআত নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ খতম করতেন। কখনো গোটা মাস রোযা রাখতেন। প্রতি বছর হজ্জ করতেন। তবে শাহাদাত লাভের বছর অবরুদ্ধ থাকার কারণে হজ্জে যেতে পারেননি। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর কোন একব্যক্তি হযরত আলী (রা)কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ। উসমান (রা) আল্লাহর বাণী ঃ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ –

“(যারা ঈমান এনে আল্লাহকে ভয় করেছে এবং সৎকাজ করেছে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।”-এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর (রা), উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম। পাহাড় কাঁপতে থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পা দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ হে উহুদ, স্থির হয়ে যাও। তোমার ওপরে এক নবী (স), এক সিদ্দীক ও দুই শহীদ (রা) আরোহণ করেছেন। (বুখারী)

www.amarboi.org

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী মুর্তাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর খিলাফতের মসনদ তিন দিন পর্যন্ত শূন্য থাকে। এই সময় বহিরাগত লোকজন বিশেষ করে যারা মিসর, কুফা ও বসরা থেকে মদীনায় আগমন করেছিলো এবং ফিতনায় অংশ নিয়েছিলো তারা এই পদটি গ্রহণ করার জন্য হযরত আলী (রা)কে ভীষণভাবে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত মুহাজির এবং আনাসারদের অধিকাংশের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে তিনি এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে ৩৫ হিজরীর ২১ শে যিলহাজ্জ সোমবার দিন হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের অনুকূলে বাইআত অনুষ্ঠিত হয়।

সে সময় মদীনাতে যেসব আনসার ও মুহাজির সাহাবী ছিলেন তাদের অধিকাংশই বাই'আত করলেন। তবে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা), ইবনে উমর (রা)[১] ও আনসারদের কতিপয় ব্যক্তি বাই'আত করলেন না। তবে সবাই নিশ্চয়তা দিলেন যে, তারা বিরোধিতা করবেন না। বরং সবাই বাই'আত করলে আমরা বাই'আত করবো।[২] গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন ও জায়গীরের কারণে বনী উমাইয়াদের অধিকাংশই মদীনার বাইরে ছিলেন। যারা মদীনায় ছিল তারা সবাই হযরত আলীর (রা) বাই'আত করা থেকে পাশ কাটিয়ে মদীনা ছেড়ে সিরিয়ার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর কাছে চলে যায়। সিরিয়ায় উমাইয়াদের প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক ছিল। তারা হযরত উসমান (রা)-এর রক্তমাখা জামা এবং তাঁর স্ত্রী নায়েলার কর্তিত আঙুলও সাথে করে নিয়ে যায় যাতে মানুষকে উত্তেজিত করে হযরত আলী (রা) বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়।

---

১. উমাইয়া শাসনযুগে হযরত ইবনে উমর (রা) এজন্য আফসোস করে বলতেন ঃ কোন ব্যাপারে আমার অনুশোচনা থাকলে শুধু এজন্য অনুশোচনা আছে যে, আমি আলী (রা)-এর সাথে থেকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিনি। (মু'জামে কাবীর)

২. সম্মানিত এসব ব্যক্তিবর্গ বাইআত বিলম্বিত করার কারণ হিসেবে বলেন, মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আশংকা বিদ্যমান। এখনই বাই'আত গ্রহণের অর্থ হবে আমরা যে গৃহযুদ্ধ এড়াতে চাচ্ছি তাতে শরীক হওয়া। হাঁ, গৃহযুদ্ধ না হলে আমরা সবাই বাই'আত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। তাদের মধ্যে কেউ-ই হযরত আলী (রা)-এর বিরোধী ছিলেন না। হযরত তালহা (রা) ও যুবায়ের (রা)-ও বাই'আত বিলম্বিত করতে চাইলেন। কিন্তু বহিরাগত গোলযোগকারীরা তাদেরকে তা করার অনুমতি দেয়নি। ফলে তাদেরকে বাই'আত করতে হয়। এটি ব্যাপকভাবে বর্ণিত রেওয়ায়েত। মুসতাদরাক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবনে উমর বাই'আত করেছিলেন। কানযুল উম্মালে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত তালহা (রা) ও যুবায়ের (রা)-ও সন্তুষ্ট চিত্তে বাই'আত করেছিলেন।

www.amarboi.org

ব্যক্তিগত জীবন

নাম আলী, উপাধি আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুর্তাজা, উপনাম আবুল হাসান ও আবু তুরাব, পিতার নাম আবু তালেব[১] আবদ মানাফ এবং মায়ের নাম ফাতেমা[২]। তিনি পিতা মাতা উভয় দিক থেকে উচ্চবংশজাত তথা হাশেমী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাতো ভাই ছিলেন।

হযরত আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে জন্ম লাভ করেন। তাঁর পিতা খাজা আবু তালেব ছিলেন একটি বড় পরিবারের প্রধান। তাঁকে সাহায্য করার মানসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা)কে প্রতিপালনের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। এরপর থেকে তিনি নবী (সা)-এর পরিবারের সদস্য হিসেবে তাঁর কাছে থাকেন।

হযরত আলী (রা)-এর বয়স যখন দশ বছর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন। বাড়ীতে একদিন হযরত আলী (রা) দেখেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) সিজদায় পড়ে আছেন। তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটা কি ? নবী (সা) তাঁকে বললেন ঃ আমরা লা-শারীক আল্লাহর ইবাদাত করছি। আমরা তোমাকেও এ ইবাদাত করার দাওয়াত দিচ্ছি। হযরত আলী (রা) তাঁর মুরব্বীর এ নির্দেশনা মনে প্রাণে গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও সালমান ফারেসীর (রা) বক্তব্য অনুসারে তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) পর সর্বপ্রথম[৩] ঈমান গ্রহণকারী।

---

১. আবু তালেব ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচা। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছেন, তাঁর জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন এবং তাঁর বিপদে বুক পেতে দিয়েছেন।

২. ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশেম। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ফুফু। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর হিজরতও করেছিলেন। নবীর (সা) সামনেই তিনি ইনতিকাল করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চাচা আবু তালেব ছাড়া তার চেয়ে আর কেউ আমার সাথে ভাল আচরণ করেনি।

৩. কোন কোন রেওয়ায়াতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন রেওয়ায়াতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-কে, কোন রেওয়ায়াতে হযরত আলী (রা)-কে, কোন রেওয়ায়াতে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা(রা)কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক আলেম এই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন এভাবে যে, নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা), বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম আলী (রা), স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

www.amarboi.org

তিনি কুফর ও শিরক, জাহেলী কাজকর্ম এবং নিষিদ্ধ কাজকর্মের সংস্পর্শেও কোনদিন আসেননি।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হলো যে, মেহমানদারীর আয়োজন করো। আবদুল মুত্তালিবের খান্দানের সমস্ত লোক সমবেত হলে খাওয়া দাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি যা দীন ও দুনিয়া উভয়টির জন্যই যথেষ্ট। আপনাদের মধ্যে থেকে কে আমাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন ? উপস্থিত সবাই চুপচাপ থাকলো। হঠাৎ হযরত আলী (রা) উঠে বললেন ঃ যদিও আমার বয়স সবার চেয়ে কম, পা দুটি দুর্বল এবং আমি চোখের পীড়ায় আক্রান্ত তথাপি আমিই আপনাকে সাহায্য করবো।

মদীনায় হিজরতের সময় এক পর্যায়ে অধিকাংশ মুসলমানই যখন হিজরত করেছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। এদিকে কাফেররা সলাপরামর্শ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন এবং তিনি মদীনায় যাওয়ার নির্দেশ পেলেন। কাফেররা যাতে সন্দেহ না করে সে জন্য নবী (সা) হযরত আলী (রা) মুর্তাজাকে তার বিছানায় ঘুমানোর নির্দেশ দিয়ে সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু (রা)-কে সাথে বেরিয়ে পড়লেন। সময়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক। হযরত আলী (রা) আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক হয়ে সানন্দে প্রাশান্ত মনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন যদি এভাবে জীবন দিতেও হয় তাহলে এর চেয়ে অধিক সৌভাগ্য আর কি হতে পারে। খুব ভোরে কাফেররা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পায় যে, তাঁর স্থলে তাঁরই এক আত্মত্যাগী অনুসারী নিজের জীবন কুরবানী দিতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এভাবে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায় এবং হযরত আলী (রা) আল্লাহর মেহেরবানীতে রক্ষা পেয়ে যান।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পর হযরত আলী (রা) তিন দিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেসব লোকের আমানত ছিলো তিনি হযরত আলী (রা)-কে তার দায়িত্ব অর্পণ করে মদীনা রওয়ানা হয়েছিলেন।

হিজরতের দ্বিতীয় বছরে হযরত আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। নবীর (সা) একান্ত প্রিয় কন্যা সাইয়েদা ফাতেমা যাহরার (রা) সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

www.amarboi.org

হযরত আলী (রা) তাবুক ছাড়া সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেন এবং এসব যুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। তাবুক যুদ্ধের সময় নবী (সা) তাকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে রেখে যান। সেই সময় তিনি বলেছিলেন ঃ

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

"মূসার পক্ষ থেকে হারূনের যে মর্যাদা ছিল আমার পক্ষ থেকে তোমার মর্যাদাও তাই।"

হিজরী ৭ম সনে খায়বার আক্রমণ করা হয়। খায়বারে ইহুদীদের অত্যন্ত মজবুত কয়েকটি দূর্গ ছিল। দূর্গগুলো অধিকার করার জন্য প্রথমে হযরত আবু বকর (রা) ও পরে হযরত উমর (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হয় কিন্তু সফলতা আসে না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আগামীকাল আমি এমন এক মহাবীরের হাতে ঝান্ডা তুলে দেব, যে আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রিয়পাত্র। তার হাতেই এসব দূর্গের পতন অবধারিত হয়ে আছে। পরদিন প্রত্যুষে প্রত্যেকেই আকাংখা পোষণ করেছিলো যেন সেই সে মর্যাদা লাভে ধন্য হয়। কিন্তু নবী (সা) অকস্মাত হযরত আলী (রা)-এর নাম বললেন এবং তাঁর হাতেই দূর্গগুলো বিজিত হলো।

৯ম হিজরীতে মুসলমানদের ব্যবস্থাপনায় সর্বপ্রথম ইসলামী হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর (রা) আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত হন। কিন্তু ইতিপূর্বে কাফেরদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে বাতিল ঘোষণা করার জন্য হযরত আলী (রা)-কে পাঠানো হয়।

১০ম হিজরীতে ইয়ামানে ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে হযরত খালেদ সাইফুল্লাহ (রা) আদিষ্ট হন। কিন্তু ক্রমাগত ছয় মাস পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালিয়েও সফলতা অর্জিত না হওয়ায় তিনি ফিরে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী আসাদুল্লাহ (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান। তিনি যাতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন সে জন্য দোয়া করেন এবং পবিত্র হাতে তাঁর মাথায় পাগড়ি বাঁধেন। হযরত আলী (রা) ইয়ামানে গিয়ে উপস্থিত হন। কয়েকদিনের শিক্ষাদানের পর সমস্ত ইয়ামানবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং গোটা হামদান গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ, আলীকে না দেখা পর্যন্ত যেন মৃত্যু না আসে।" সুতরাং বিদায় হজ্জের সময় হযরত আলী (রা) ইয়ামান থেকে এসে হাযির হন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর আত্মীয়-পরিজন তাঁর লাশ কাফন দাফনের কাজ আঞ্জাম দেন। হযরত আলী (রা) নবী

www.amarboi.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোসল দেন। সমস্ত আনসার ও মুহাজির বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। একজন আনসারও[১] অংশগ্রহণের মর্যাদা লাভ করেন।

হযরত আলী (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের একজন সদস্য। তিনি নবী (সা)-এর শিক্ষাগার থেকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِىٌّ بَابُهَا

"আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা।" (তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) ছিলেন কুরআনের হাফেজ ও কুরআনের তাফসীরের বড় পন্ডিত। কিছু সংখ্যক হাদীসও সংগ্রহ করেছিলেন। ফিকহ্‌শাস্ত্র, ইজতিহাদ এবং বিভিন্ন মোকদ্দমার ফায়সালার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে তিনি কাতেবে অহী ও ফরমান লেখক ছিলেন। অত্যন্ত বাগ্মী এবং উচ্চ পর্যায়ের বক্তা ও কবি ছিলেন। তিনি আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করেন। পূর্বসুরী তিনজন খলিফার যুগে তাঁর জ্ঞানগত দূরদৃষ্টির দ্বারা বহু সংখ্যক জটিল বিষয়ের সমাধানে সাহায্য হয়েছে। হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ আমাদের মধ্যে হযরত আলী (রা)-ই মোকদ্দমাসমূহের ব্যাপারে উত্তম সিদ্ধান্ত দাতা ছিলেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ اَقْضَاهُمْ عَلِى رض "সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক আলী (রা)।" (হাকেম প্রভৃতি) সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি এমন পারদর্শী ছিলেন যে, হযরত উমর (রা) বার বার বলতে বাধ্য হয়েছেন ঃ لَوْلاَ عَلِىٌّ رض لَهَلَكَ عُمَرُ رض "আলী (রা) না থাকলে উমর (রা) ধ্বংস হয়ে যেতো।" সাহসিকর্তা, বীরত্ব ও তরবারী চালনায় সমস্ত সাহাবীর মধ্যে তিনি এমন অগ্রগামী ছিলেন যে, বীরত্বে আজ পর্যন্ত হযরত আলী (রা) কিংবদন্তী হয়ে আছেন।

হযরত আলী (রা) ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি হযরত আবু বকর (রা) ও উমরের (রা) সময় উজীর ও পরামর্শদাতা ছিলেন। হযরত উসমান (রা)-ও অধিকাংশ সময় তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তদনুযায়ী কাজ[১] করতেন। ফিতনার সময় তাঁকে রক্ষা ও সাহায্যের তৎপরতায় বেশী করে অংশগ্রহণ করেছেন। খলিফা নির্বাচনের

১. তার নাম আওস বিন খাওলী (রা)। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
২. মারুজুয যাহাব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠ-২

www.amarboi.org

জন্য হযরত উমর (রা)-এর প্রস্তাবিত পরামর্শ কমিটিতে তিনিও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস সফরে যাওয়ার সময় হযরত উমর (রা) তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।

হযরত আলী (রা) ছিলেন মধ্যমদেহী। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল ঈষৎ রক্তিম ও চোখ ছিল বড় বড়। তিনি সর্বদা হাসিমুখ থাকতেন। তাঁর চেহারা ছিল আকষর্ণীয় ও সুন্দর। বক্ষ ছিল প্রশস্ত ও দেহ ছিল খাট। গালভরা লম্বা ও চওড়া দাড়ি ছিল। তিনি মাথায় চুল রাখতেন না।

প্রথম বিয়ে হয় খাতুনে জান্নাত সাইয়েদা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে। তাঁর জীবদ্দশায় আর কোন বিয়ে করেননি। তাঁর গর্ভে তিন পুত্র হাসান (রা), হুসাইন (রা) ও মুহসিন (রা) এবং দুই কন্যা যায়নাব (রা) ও উম্মে কুলসুম জন্ম গ্রহণ করেন। মুহসিন (রা) শৈশবেই ইনতিকাল করেন।

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমার (রা) সাথে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সদস্য হিসেবে ছিলেন। জীবন যাপনের জন্য চিন্তার প্রয়োজন ছিল না। সাইয়েদা ফাতেমার (রা) সাথে বিয়ের পর আলাদা বাড়ীতে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু দরিদ্রদের রাজা অর্থ পাবেন কোথায় ? শ্রম ও মজদুরী ও যুদ্ধলব্ধ অর্থ দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করতেন। অন্য সাহাবীদের (রা) মত তিনিও জায়গীর হিসেবে একখন্ড ভূমি লাভ করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে ফাদাক নামক স্থানের বাগানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁকে সোপর্দ করেছিলেন। সব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের বেতন ভাতা বাইতুলমাল থেকে নির্ধারিত হলে হযরত আলীর (রা) জন্যও পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারিত হয়। তৃতীয় খলিফার পর নিজে খলিফা নির্বাচিত হলে নিজের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দৈনিক ভাতা নির্ধারণ করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের ছয় মাস পরে খাতুনে জান্নাত সাইয়েদা ফাতেমার (রা) ইনতিকাল হয়। তাঁর ইনতিকালের পর হযরত আলী (রা) কয়েকটি বিয়ে করেন। সেই সব স্ত্রীদের একজন ছিলেন আমামা বিনতে আবিল আস (রা) অর্থাৎ সাইয়েদা যায়নাব (রা) বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা। তাঁর গর্ভে আওসাত নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবেই ইনতিকাল করেন।

হযরত আলী (রা) বহু সংখ্যক সন্তানের পিতা ছিলেন। তাবারীর বর্ণনা অনুসারে তাঁর চৌদ্দটি পুত্র ও সতেরটি কন্যা সন্তান ছিল। ওয়াকেদীর বর্ণনা

www.amarboi.org

অনুসারে শুধু পাঁচজন পুত্র সন্তান অর্থাৎ হাসান, হুসাইন, মুহাম্মাদ (ইবনুল হানাফিয়া), আব্বাস এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বংশধারা চালু রয়েছে।

হযরত আলীর (রা) খিলাফাত

৩৫ হিজরীর ২৪শে যিলহাজ্জ থেকে ৪০ হিজরীর ১৭ই রমযান
৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন থেকে ৬৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারী।

বাইয়াতের পর হযরত আলী (রা) একটি উন্নত ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে ঐক্য ও সংহতির উপদেশ দেন। খিলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার পর তার প্রথম কাজ ছিল হযরত উসমান (রা)-এর খুনীদের খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়া। হযরত আলী (রা) সর্বপ্রথমেই এদিকে মনযোগ দেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় এই যে, হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের সময় শুধু তাঁর স্ত্রী নায়েলা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এর অধিক আর কিছুই বলতে পারেননি যে, মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা) দুই ব্যক্তির সাথে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। ঐ দুই ব্যক্তিকে তিনি চিনতেন না। হযরত আলী (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা)-কে পাকড়াও করলে সে কসম করে বলে যে, সে অবশ্যই হত্যার নিয়তে প্রবেশ করেছিলো। কিন্তু হযরত উসমান (রা) যখন বললেন ঃ ভাতিজা তোমার পিতা জীবিত থাকলে এই দৃশ্য কখনো পছন্দ করতেন না। তখন আমি লজ্জিত হয়ে ফিরে আসি। তবে অন্য দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে। আমি নিজেও তাদেরকে চিনি না। নায়েলাও (রা) তার কথা সমর্থন করে বললেন যে, মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা) হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ করেনি। মোটকথা, সে সময় খুনীদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। সেই সময় আরো অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল। তাই তদন্ত কাজ পরবর্তী সময়ের জন্য মুলতবী করা হয়, যাতে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করা যায় এবং গোলযোগ অবিলম্বে বন্ধ হয়। হযরত তালহা (রা) ও যুবায়ের (রা) এই শর্তে বাই'আত করেছিলেন যে, হযরত উসমান (রা)-এর খুনীদের খুঁজে বের করতে হবে। তাই তাঁরা উভয়ে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যে, সর্বপ্রথমে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার ফয়সালা করতে হবে। সুতরাং খুনীদের খুঁজে বের করে কিসাস নেয়া হোক। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ কিছুটা অনুসন্ধান তো সম্পন্ন হলো। ভবিষ্যতে অবস্থা অনুকূল হওয়া মাত্রই আমরা এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেবো। হযরত যুবায়ের (রা) ও তালহা (রা) আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মক্কায়

www.amarboi.org

চলে গেলেন। এখান থেকেই মতানৈক্য শুরু হয় যা ভবিষ্যতে মুসলমানদেরকে তিন দলে বিভক্ত করে দেয়। এক, হযরত আলী (রা)-এর অনুসারী দল। তারা হযরত আলী (রা)-এর সাথে ছিলেন। দুই, হযরত উসমান (রা)-এর অনুসারী দল। তারা হযরত উসমান (রা)-এর কিসাসের দাবীদার ছিলেন। তিন, নেতৃবৃন্দ, যারা ছিলেন নিরপেক্ষ।

হযরত আলী (রা) হত্যা মামলার তাৎক্ষণিক যাচাই বাছাই ও অনুসন্ধানের পর দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি মনোনিবেশ করেন। গোলযোগের মূল কারণ ছিল হযরত উসমান (রা)-এর বিশেষ কয়েকজন গভর্নর। হযরত আলী (রা) হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর যুগের পুণর্জাগরণ ঘটিয়ে সেই সব গভর্নরের পদচ্যুতি ফরমান জারী করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত মুগীরা (রা) প্রমূখ যুক্তি দেখিয়ে বললেন যে, এ সময় এধরনের পদক্ষেপ যুক্তি ও রাজনীতির পরিপন্থী। তারা বললেন ঃ এসব গভর্নর কালবিলম্ব না করে হযরত উসমান (রা)-এর কিসাসের বাহানা খাড়া করে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। তা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা) কারো মতামতই গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলের উম্মতদের ওপর এমন সব লোকদের শাসক বানিয়ে রাখতে পারি না যারা মুসলিম উম্মার অনৈক্যের কারণ। এ পরিস্থিতিতে এরূপ কর্মনীতি গ্রহণকে আমি ঈমান ও ইয়াকীনের পরিপন্থী বলে মনে করি। সুতরাং তিনি নিম্নোল্লেখিত পাঁচজন গভর্নরকে নিয়োগ করে সংশ্লিষ্ট প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন ঃ

আবুদল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে ইয়ামানে
আমারা ইবনে শিহাব (রা)-কে কুফায়
কায়েস বিন সাদ (রা)কে মিসরে
সাহল ইবনে হানীফ (রা)-কে সিরিয়ায়
উসমান ইবনে হানীফ (রা)-কে বসরায়

ইয়ামান, মিসর ও বসরার গভর্ণরগণ তাদের দায়িত্ব বুঝে নিতে সক্ষম হন। কিন্তু কুফার গভর্নর তার দায়িত্ব বুঝে নিতে পারেন না। জনগণ তাকে বাধা দান করে। তবে সেখানকার প্রাক্তন গভর্নর আবু মূসা আশ'আরী (রা) হযরত আলী (রা)-কে অবহিত করেন যে, আমি আপনার বাই'আত গ্রহণ করেছি। আপনি নিশ্চিত থাকুন, জনগণের থেকেও বাইয়াত গ্রহণ করবো।

সাহল ইবনে হানিফ (রা) সিরিয়ায় রওয়ানা হন। তাবুকের সন্নিকটে পৌছে জানতে পারেন যে, সিরিয়ার পরিস্থিতি অন্য সব প্রদেশ থেকে ভিন্ন। সেখানকার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়া (রা) ক্ষমতা ছাড়তে প্রস্তুত নন। তিনি বরং হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান। হযরত

www.amarboi.org

উসমান (রা)-এর রক্তমাখা জামা এবং নায়েলা (রা)-এর কর্তিত আঙুলসমূহ দেখিয়ে জনগণকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করা হয়। ফলে হাজার হাজার সিরীয় শপথ নিয়েছে যে, উসমানের হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের তরবারী কোষবদ্ধ হবে না।

সাহল (রা) যখন দেখলেন যে, আমীর মুয়াবিয়া (রা) এবং সিরিয়ার অধিবাসীরা হযরত আলী (রা)-এর চরম বিরোধী এবং তারা তাঁকে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারী ও গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের পৃষ্টপোষক বলে মনে করে তখন তিনি সেখানে যাওয়া নিরাপদ নয় মনে করে ফিরে এসে হযরত আলী (রা)-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন।

হযরত আলী (রা) বাই'আত গ্রহণ সম্পর্কে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে পত্র যোগাযোগ শুরু করলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হলো না। তবে জানা গেল যে, আমীর মুয়াবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিশাল সেনাদল সংগ্রহ করছেন এবং প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত আছেন। হযরত আলী (রা) ও তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়ার অধীনে সৈন্যদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত ইমাম হাসানের (রা) মত কেন্দ্র ছেড়ে বাইরে গিয়ে কোন গভর্নরের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সামরিক অভিযান পরিচালনার পক্ষে ছিল না। কিন্তু হযরত আলী (রা) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। কারণ, হযরত উসমান (রা)-এর সময় দুষ্কৃতিকারীদের মদীনায় চড়াও হওয়ার দৃশ্য তিনি নিজ চোখে দেখেছিলেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর সেনাবাহিনীও যদি লুটপাট করতে করতে মদীনায় এসে প্রবেশ করে তবে তা হবে রাসূল (সা)-এর হারামের চরম অমর্যাদা।

গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী প্রস্তুতের পর হযরত আলী (রা) ৩৬ হিজরীতে তামাম ইবনে আব্বাস (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। কতিপয় সাহাবী (রা) ছাড়া অধিকাংশ মদীনাবাসী সহযাত্রী হন। রাস্তায় খবর পাওয়া যায় যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়ের (রা)-এর নেতৃত্বে মক্কাবাসীগণ[১] তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হযরত উসমান (রা)-এর খুনের বদলা দাবী করছে। হযরত আলী (রা) তাই মক্কা যাওয়ার সংকল্প করলেন।

১. এসব সম্মানিত ব্যক্তিগণ হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত অস্বীকারকারী ছিলেন না। তাদের দাবী ছিল শুধু এই যে, কিসাস গ্রহণের ব্যাপারটির মীমাংসা সর্বপ্রথম করতে হবে।

www.amarboi.org

জামাল যুদ্ধ

হযরত উসমানের (রা)-এর শাহাদাতলাভের বছরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), উম্মে সালামা (রা) ও হাফসা (রা) হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় তাঁরা হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের খবর পান। মারওয়ান এবং পদচ্যুত আরো কয়েকজন উমাইয়া গভর্নরও সেখানে পৌছেছিলো। সম্ভবত মারওয়ান ও অন্যদের বুঝানোর কারণে হযরত আয়েশা (রা) হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধের দাবী সমর্থন করেন। হযরত যুবায়ের (রা) এবং তালহাও (রা) তাঁর সাথে যোগদান করেন। (ওয়াল্লাহু আলাম) কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন এবং মদীনায় ফিরে পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-কে অবহিত করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং হযরত তালহা (রা) ও যুবায়ের (রা) দেড় হাজার সৈন্য নিয়ে হযরত আলীর (রা) মোকাবিলার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু তার পূর্বেই বসরায় গিয়ে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য লাভ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। ৩৬ হিজরীর রবিউস সানী মাসে এই বাহিনী বসরায় পৌছে। সেখানে হযরত আলীর গভর্নর উসমান ইবনে হানীফ তাদের মোকাবিলা করে পরাজিত এবং বন্দী হন। হযরত আয়েশা (রা) বসরা অধিকার করে নেন। বসরার যেসব লোক হযরত উসমান (রা)-এর হত্যা সম্পর্কিত গোলাযোগে অংশগ্রহণ করেছিলো তাদের হত্যা করা হয়। এ ঘটনা ঘটে ২৪শে রবিউস সানীতে। ইসলামী শরীয়াতের বিধান বহির্ভূতভাবে রাজনৈতিক কারণে কোন মুসলমানের নিহত হওয়ার এটাই সর্বপ্রথম ঘটনা।

এদিকে হযরত আলী (রা)-ও আর্থিক ও সামরিক সাহায্যলাভের আশায় মক্কার পরিবর্তে বসরায় রওয়ানা হন। কূফায় উপনীত হলে হযরত আবু মূসা আশ'আরী সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে কা'কা' ইবনে আমর (রা) প্রমুখের প্রচেষ্টায় নয় হাজার কূফাবাসী হযরত আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর সেনাবাহিনী বসরার নিকটবর্তী হলে তিনি জানতে পারেন যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) আগেভাগেই বসরা অধিকার করে নিয়েছেন। এ কারণে হযরত আলী (রা) যিকার নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। কা'কা' ইবনে আমরের (রা) মাধ্যমে আপোষ আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু কপটভাবে হযরত আলী (রা)-এর দলে ভিড়ে যাওয়া সাবায়ী দলের লোকজন এ আলোচনাকে সফল

www.amarboi.org

হতে দেয় না। ফলে বসরার সন্নিকটস্থ খারীবা নামক স্থানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে। ইসলামের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম অকল্যাণকর দিন যেদিনে সাহাবা কিরাম (রা) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়। অথচ তাঁরা ছিলেন পরস্পর رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (একে অপরের প্রতি দয়াদ্র হৃদয় ও স্নেহবান)-এর মূর্ত প্রতীক।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে হযরত আলী (রা) অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ময়দানে এসে হযরত যুবায়েরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু আবদুল্লাহ, তোমার কি সেদিনের কথা স্মরণ আছে, যেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ তুমি কি আলীকে ভালবাস ? তুমি বলেছিলে ঃ হাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ কিন্তু একদিন তুমি আলীর (রা) বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ করবে। হযরত যুবায়ের (রা) বললেন ঃ অবশ্যই মনে পড়ছে। তাছাড়া তিনি এও দেখতে পেলেন যে, হযরত আম্মার (রা) আলীর (রা)-এর সেনাবাহিনীতে অগ্রভাগে রয়েছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একটি বিদ্রোহী দল আম্মার (রা)-কে হত্যা করবে। এবার হযরত যুবায়ের (রা)-এর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, তিনি ইজতিহাদী ভুল করে ফেলেছেন। তৎক্ষণাৎ তিনিএ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার সংকল্প নিয়ে তাঁর অবস্থান স্থলে ফিরে গেলেন। হযরত তালহা (রা)[১] এবং হযরত আয়েশাও (রা) যুদ্ধ না করাই শ্রেয় মনে করলেন। এ অবস্থা দেখে সমঝোতা হবে বলে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো। কিন্তু এই আপোষ-

---

১. মুসতাদরিক ৩য় খন্ডের ৩৭১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, হযরত আলী (রা) হযরত তালহাকেও (রা) ডেকে বলেন ঃ হে তালহা, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ من كنت مولاه فعلى مولاه (আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু) হযরত তালহা (রা) হাঁ সূচক জবাব দিলেন। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ তাহলে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছো কেন ? তিনি বললেন ঃ আমার মনে ছিল না। ২৭৩ পৃষ্ঠায় আরেকটি বর্ণনায় আছে, হযরত তালহা (রা) আহত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো অতিক্রম করছিলেন ঠিক সেই সময় হযরত আলীর (রা) একজন সৈন্যকে দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে তার হাতে হযরত আলীর (রা) অনুকূলে নতুন করে বাই'আত করেন এবং এরপর তার মৃত্যু হয়। রাদিয়াল্লাহু আনহু। একথা শুনে হযরত আলী (রা) তাকবীর পাঠ করেন এবং বলেন ঃ ابى الله ان يدخل طلحة الجنة الا وبيعتى فى عنقه (আল্লাহ চাননি আমার বাই'আত গ্রহণ ছাড়া তালহা জান্নাতে প্রবেশ করুক।) (আমীমুল ইহসান)

www.amarboi.org

সমঝোতা ছিল সাবায়ী ফির্কার জন্য মহাবিপদ[১] স্বরূপ। তাই এই পথভ্রষ্ট দলের লোকেরা রাতের অন্ধকারে হযরত আয়েশা (রা) বাহিনীর ওপর অকস্মাত আক্রমণ করে বসে। হযরত তালহা (রা) ও যুবায়ের (রা) বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এসব শোরগোল কিসের ? সৈন্যরা বললো ঃ আলী (রা)-এর বাহিনী আক্রমণ করেছে। তাঁরা বললেন ঃ "আফসোস ! আলী (রা) মুসলমানদের রক্তপাত থেকে বিরত রইল না।" এদিকে হযরত আলী (রা) ও তাঁর লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন। এ কিসের চিৎকার ? কয়েকজন সাবায়ী বলল ঃ তালহা (রা) ও যুবায়ের (রা)-এর লোকজন আক্রমণ করে বসেছে। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ আফসোস ! তালহা (রা) ও যুবায়ের (রা) মুসলমানদের রক্তপাত থেকে বিরত রইলো না। এরপর উভয় পক্ষ থেকে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

যুদ্ধ শুরু হতেই হযরত যুবায়ের (রা) যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে বসরায় রওয়ানা হয়ে যান। হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীর এক সৈনিক উমর ইবনে হারমুয তার সাথে যোগ দেয়। তাঁরা পরস্পরকে নিরাপত্তা দান করে। কিন্তু সেবা' উপত্যকায় উপনীত হওয়ার পর উমর ইবনে হরমুয মনে করে যে, সে যদি যুবায়ের (রা)-কে হত্যা করে তাহলে হযরত আলী (রা)-এর প্রিয়পাত্র হতে পারবে। তাই আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম পবিত্র রুকন সাইয়েদেনা যুবায়ের (রা) যখন নামাযরত তখন সে তাঁকে শহীদ করে এবং খুশী মনে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা)-এর কাছে গিয়ে এ সংবাদ জানায়। হযরত আলী (রা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ আমি যুবায়ের (রা)-এর খুনীকে জাহান্নামের সুসংবাদ দান করছি। একথা শুনে সে দুঃখিত হয় এবং আত্মহত্যা করে। এদিকে হযরত যুবায়ের (রা)-কে সরে যেতে দেখে হযরত তালহা (রা)-ও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। তিনিও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। মারওয়ান বিষয়টি জানতে পারে।[২]সে হযরত তালহাকে (রা) লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করে। ফলে আশারায়ে মুবাশশারার এই পবিত্র রুকনও শাহাদাত লাভ করেন। এ সময় যুদ্ধের ময়দানে কেবলমাত্র উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ম পরিহিতাবস্থায় উটের পিঠে হাওদার মধ্যে বসেছিলেন। উটের লাগাম ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর হাতে। তিনিও আহত হন। একাধারে সাতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। বসরার কাজী কাব ইবনে সাওর উম্মুল মু'মিনীন হযরত

---

১. তারা মনে করতো যে, সমঝোতা হয়ে গেলে হযরত উসমানের (রা) ব্যাপারে অবশ্যই তদন্ত শুরু হবে। অতপর সাবায়ীদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়বে।

২. মিযানুল ইতিদাল, পৃষ্ঠা-১৫৯।

www.amarboi.org

আয়েশার (রা) কাছে গিয়ে আরজ করেন যে, অযথা রক্তপাত হচ্ছে। আপনি যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিন। হযরত আয়েশা (রা) তাকে যুদ্ধ মুলতবী ঘোষণা করার আদেশ দেন। তিনি অগ্রসর হলে এক সাবায়ী এগিয়ে গিয়ে তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে। রাসূলের (সা) পবিত্র স্ত্রীর হাওদা সামনে দেখে পরাজয় সত্ত্বেও তাঁর সৈন্যরা স্বস্ব স্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে থাকে। তারা একের পর এক নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলো কিন্তু পশ্চাদপসরণ করছিলো না। যুদ্ধ বন্ধের কোন উপায় দেখা যাচ্ছিল না । হযরত আলী (রা) বুঝতে পারলেন যে, যতক্ষণ হযরত আয়েশা (র)-এর উটকে বসিয়ে দেয়া না যাবে ততক্ষণ রক্তপাত বন্ধ হবে না। তাই তিনি তাঁর উটের পা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এক ব্যক্তি তরবারি দ্বারা উটের পায়ে আঘাত করলে উট চিৎকার করে বসে পড়লো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর লোকেরা অত্যন্ত আদবের সাথে এমন যত্ন সহকারে হযরত আয়েশার (রা) হাওদা উঠিয়ে নিলো যে, তিনি কোন প্রকার কষ্ট বা আঘাত পেলেন না। এভাবে উটওয়ালাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। প্রায় দশ হাজার মুসলমান এ যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। যুদ্ধ শেষে হযরত আলী (রা) ঘোষণা করলেন ঃ কোন পলায়নরত ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করবে না। কোন আহতকে হত্যা করবে না বা বন্দী করবে না। কারো নিকট থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নেবে না।

যুদ্ধ শেষে হযরত আলী (রা) যুদ্ধের ময়দানে চক্কর দিলেন। কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে রক্ত ও কাদার মধ্যে পড়ে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। হযরত তালহার (রা) লাশ দেখে কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর প্রশংসা করলেন। উভয় পক্ষের নিহতদের জানাযা পড়লেন এবং তাদেরকে দাফনের নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র বসরার জামে মসজিদে পাঠিয়ে এই মর্মে ঘোষণা করিয়ে দিলেন যেন, মালিকগণ এসে তাদের নিজ নিজ জিনিস নিয়ে যায়।

৩৬ হিজরীতে হযরত আলী (রা) বসরায় প্রবেশ করলেন। তাকওয়া ও দারিদ্রের বাদশাহ গভর্নরের প্রাসাদে অবস্থান করার পরিবর্তে খোলা মাঠে অবস্থান করাই পছন্দ করলেন। জুমআর দিন জামে মসজিদে উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে পরহেজগারী এবং বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের উপদেশ দিলেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) যদিও হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন কিন্তু সাইয়েদেনা হযরত আলী মুর্তাজা (রা) তাঁর প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন। মায়ের মত সম্মান ও মর্যাদা

www.amarboi.org

দেখালেন এবং মর্যাদার সাথে নিজের তাঁবুতে রাখলেন। একে অপরের জন্য মাগফিরাত কামনা করলেন। তারপর উপহার উপঢৌকন সহ তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা)-এর সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বসরার গভর্নর এবং যিয়াদ ইবনে সুমাইয়া (রা)-কে ভূমিকর কর্মকর্তা নিয়োজিত করে হযরত আলী (রা) কুফায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। সেখানে যেহেতু সমর্থকদের সংখ্যা বেশী ছিল তাই তিনি মদীনার পরিবর্তে কুফাকেই রাজধানী হিসেবে বেছে নিলেন। কুফাকে রাজধানী হিসেবে বেছে নেয়ার একটি কারণ এও ছিল যে, হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার সময়ের ফিতনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হারাম মদীনার যে অবমাননা হয় তা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এ ঘটনা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কেন্দ্রকে জ্ঞান ও ধর্মীয় কেন্দ্র থেকে আলাদা করতে হযরত আলী (রা)-কে বাধ্য করে।

জামাল যুদ্ধের পর শুধু সিরিয়া ছাড়া সমস্ত ইসলামী প্রদেশ হযরত আলীর (রা) অধিকারে আসে এবং খলিফা কর্তৃক সমস্ত প্রদেশে গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

জামাল যুদ্ধ সংঘটিত হয় দুর্ঘটনাক্রমে। আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর ব্যাপারে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করাই ছিল আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর মূল লক্ষ্য। অতএব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি শেষে নব্বই হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর উদ্দেশ্যে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন।

সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ

সিরিয়ার প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা সবসময় বনী উমাইয়াদের হাতে ছিল। ফলে সেখানে এই খান্দানের বিরাট প্রভাব ছিল। আমীর মুয়াবিয়া (রা) প্রায় বাইশ বছর পর্যন্ত সেখানকার গভর্নর ছিলেন। তিনি ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় সমস্ত খান্দানের অন্যান্য লোকদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ভাল সংগঠক, সুচতুর, ভাল প্রশাসক ও সুবিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন। শা'বীর মতে, মুয়াবিয়া (রা), আমর ইবনুল আস (রা), মুগীরা (রা) ও যিয়াদ ইবনে সুমাইয়া (রা) এই চার ব্যক্তি ছিলেন পার্থিব বিচারে আরবের সর্বাপেক্ষা চতুর ও বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ।

হযরত উসমান (রা) ও আমীর মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন একই দাদার অধস্তন সন্তান এবং উভয়েই উমাইয়া বংশোদ্ভূত। হযরত উসমান (রা)-এর

www.amarboi.org

শাহাদাত ছিল ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি বেদনায়দায়ক ঘটনা। এ ঘটনায় আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক। হযরত উসমান (রা)-এর পর মদীনাবাসীরা হযরত আলী (রা)-এর হাতে বাই'আত করে। আমীর মুয়াবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করতেন না। কিন্তু হযরত উসমানের শাহাদাতের ঘটনায় জড়িত মিসর ও কূফার গোলযোগকারীদের একটি দল হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীতে বর্তমান ছিল। বিশেষ করে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা) হচ্ছেন হযরত আলী (রা)-এর দক্ষিণ হস্ত। তিনি হযরত উসমানকে (রা) হত্যা না করলেও তাঁকে হত্যার ইচ্ছায় বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করেছিলেন। এসব দেখে হযরত মু'আবিয়া (রা) এ বিভ্রান্তির শিকার হন যে, উসমান (রা)-এর হত্যাকান্ডে আলী (রা)-এর হাত না থাকলেও তিনি অবশ্যই হত্যাকারীদের সাহায্যদাতা ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল।[১] তাই তিনি ইচ্ছা করেই কিসাস গ্রহণের ব্যাপারটি এড়িয়ে যাচ্ছেন। অতএব তাঁকে প্রথমে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার কিসাস গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করতে হবে। তাঁর কিসাস গ্রহণের পর তিনি অন্য কোন ব্যাপারে চিন্তা করবেন। এ পরিস্থিতির পাশাপাশি এও বুঝা যায় যে, হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের পর আমীর মুয়াবিয়ার (রা) মনেও খিলাফত ও সালতানাত লাভের আকাংখা সৃষ্টি হয়েছিল।(যা পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে স্বতই বুঝা যায়)। কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর বিশাল ব্যক্তিত্বের মোকাবিলায় তা প্রকাশ্যে দাবী করা এমনিতেই কঠিন ছিল।[১] দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক তাঁকে সমর্থন করলে তো কোন প্রশ্নই আসে না। তাই আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর রাজনীতির দাবাই এই ছিল যে, উসমান (রা)-এর রক্তের

---

১. এ কারণে হযরত আলী (রা)-এর বাইয়াতের দাবী নিয়ে যে দূত আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গিয়েছিলো সে ফিরে এসে যখন আমীর মুয়াবিয়ার (রা)-এর এই অভিযোগের কথা উল্লেখ করে তখন হযরত আলী (রা) দুই হাত তুলে বললেন ঃ

اللهم اني ابتراء اليك من دم عثمان رضـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে হযরত উসমানের (রা) হত্যার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত বলে নিজেকে ঘোষণা করছি।"

২. যুরকানির শারহে মাওয়াহিব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, আমীর মুয়াবিয়া (রা) হযরত আলী (রা) কে যে পত্র দেন তাতে লিখেন ঃ

ان لي فضائل انا صهر رسول الله صلي الله عليه وسلم و كاتبه

"আমি অনেক মর্যাদার অধিকারী। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালক এবং কাতেবে অহী।" তাঁর ঐ পত্রের জবাবে হযরত আলী (রা) নীচের কবিতাটি লিখে পাঠান ঃ (অপর পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য)

www.amarboi.org

প্রতিশোধের দাবীর বিষয়টি সামনে রেখে হযরত আলী (রা)-এর শক্তিকে দুর্বল করতে হবে। সে সুযোগও পুরোপুরি ছিল। আমীর মুয়াবিয়ার (রা)-এর চারপাশে উমাইয়া খান্দানের লোকজন সমবেত হয়েছিলো। বনী উমাইয়া ও বনী হাশেমের পুরনো ভুল বুঝাবুঝি আবার জাগ্রত হয়ে উঠেছিলো। মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য হযরত উসমানের (রা) রক্তমাখা জামা ও নায়েলার (রা)

محمد النبی اخی و صهری – وحمزة سید الشهداء عمی
وجعفر الذی یضحی ویمشی – یطیر مع الملئکة ابن عمی
وبنت محمد سکنی و عرسی – مشوب لحمها بدمی و لحمی
و سبطا احمد ابنای منها – فمن منکم له سهم کسهمی
سبقتکم الی الاسلام طراً – صغیرا ما بلغت او ان حلمی

"আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ভাই ও শ্বশুর। সাইয়েদুশ শুহাদা হামযা আমার চাচা। জাফর যিনি সকাল বিকাল ফেরেশতাদের সাথে বেহেশতের মধ্যে উড়ে বেড়ান তিনি আমার চাচার সন্তান। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা আমার স্ত্রী ও মনের প্রশান্তি। তাঁর রক্ত মাংস আমার রক্ত মাংসের সাথে মিশে আছে। তাঁর গর্ভজাত আমার দুই সন্তান নবী আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি। অতএব তোমাদের মধ্যে কে আমার মত মর্যাদার অধিকারী? আমি ইসলাম গ্রহণে তোমাদের অগ্রগামী। এমন বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছি যখন খুব ছোট ছিলাম।"

এ জবাব পাঠ করে আমীর মুয়াবিয়া (রা) পত্রখানা তাঁর ক্রীতদাসের হাতে ছিঁড়ে ফেলার জন্য দেন যাতে তা দেখে সিরিয়াবাসী আলীর (রা)-এর পক্ষে চলে না যায়। নাহজুল বালাগা গ্রন্থে আছে যে, আমীর মুয়াবিয়া (রা) একটি পত্রে হযরত আলী (রা) কে লিখেন ঃ

اما شرفك فی الاسلام وقرابتك من النبی صلی الله علیه و سلم فلست ادفعه الخ

"ইসলাম গ্রহণে আপনার মর্যাদা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আপনার আত্মীয়তা আমি অস্বীকার করি না।"

তবে সিফফীন যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারার কারণে আমীর মুয়াবিয়া (রা) নিজেকে খিলাফতের হকদার বলে দাবী করতে থাকেন। কিন্তু কেন তা শুনুন ঃ

قدم معاویة رضـ مکة او المدینة فاتی المسجد فقعد فی خلفة فیها ابن عمر و ابن عباس و عبد الرحمن بن ابی بکر فاقبلوا علیه و اعرض عنه ابن عباس فقال و انا احق بهذا الامر من هذا المعروض و ابن عمه (ابی علی رضـ) فقال ابن عباس ولم تقدم فی الاسلام ام

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.amarboi.org

কর্তিত আঙুলসমূহ তাঁর কাছে পূর্বেই পৌছেছিলো যা জামে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় প্রদর্শন করা হতো। তাঁর অধিকারে ছিল সিরিয়ার বিশাল সেনাবাহিনী। তাছাড়া অঢেল সম্পদ তো প্রথম থেকেই হস্তগত ছিল। সৌভাগ্যবশত আমর ইবনুল আস (রা) ও হযরত মুগীরা (রা)-এর মত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ সাহাবীও সিরিয়ায় পৌছে তাঁর একান্ত সহযোগী হয়েছিলেন। হরমুযানের হত্যাকারী উবায়দুল্লাহ বিন উমর ও হযরত উসমান (রা) যার থেকে কিসাস গ্রহণ করেছিলেন—হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের পক্ষ থেকে বিপদ হবে বুঝতে পেরে পালিয়ে সিরিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর শাহী দান-দক্ষিণা বহু সংখ্যক আরব গোত্রকেও তার সমর্থক ও সহযোগী বানিয়ে দেয়। মোটকথা, হযরত মুয়াবিয়া

سابقة مع الرسول او قربة منه قال لا و لكن ابن عم المقتول (ابى عثمان رض) قال فهذا احق به بريد ابا بكر قال ان اباه مات موتا فقال فهذا احق به يريد ابن عمر قال ان اباه قتله كافر قال فذاك او هن لحجتك ان كان المسلمون عتلوا على ابن عمك فقتلوه (تاريخ الخلفاء)

"মুয়াবিয়া (রা) মক্কা অথবা মদীনায় আগমন করলেন এবং মসজিদে গিয়ে একটি দলে গিয়ে বসলেন যেখানে ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর (রা) ছিলেন। সবাই তাঁর প্রতি মনোযোগী হলেন কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মুয়াবিয়া (রা) বললেন ঃ আমি এই ব্যক্তি ও তার চাচাতো ভাই [অর্থাৎ আলী (রা)]-এর চেয়ে খিলাফতের অধিক হকদার। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ আপনি তো ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিংবা রাসূল (সা)-কে সাহায্যের ব্যাপারে অগ্রগামী নন কিংবা তাঁর সাথে আপনার কোন নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তিনি বললেন ঃ তবে আমার নিহত চাচাত ভাই [উসমান (রা)]-এর কারণে। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ তাহলে তো আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর (রা) অধিক হকদার। মুয়াবিয়া বললেন ঃ তাঁর পিতা তো স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন। ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তাহলে ইবনে উমর (রা) অধিক হকদার। মুয়াবিয়া (রা) বললেন ঃ তার পিতাকে তো একজন কাফের হত্যা করেছে। ইবনে উমর বললেন ঃ একথা তো তোমার নিজের যুক্তিকেই দুর্বল করে দিচ্ছে। কারণ, তোমার চাচাত ভাই উসমানকে (রা) মুসলমানগণ বিদ্রোহ করে হত্যা করেছে।" তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা-১৩৬। বায়হাকী ইমাম আহমাদের মত উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

لم يكن احد حق بالخلافة فى زمان على من على ضى الله عنه -(عميم الاحسان)

"আলী (রা)-এর সময়ে তাঁর চেয়ে খিলাফতের অধিক হকদার আর কেউ ছিল না।" (আমীমুল ইহসান)

www.amarboi.org

(রা)-এর খিলাফত লাভের আকাংখা থেকে থাকলে সে আকাংখা পূরণের জন্য এর চেয়ে আর কোন উত্তম সুযোগ লাভ করা সম্ভব ছিল না। একথা সুস্পষ্ট যে, এই সুযোগ হাতছাড়া করা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিপন্থী ছিল। অবকাশও যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল। প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছিল। তাই আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলীর (রা) আগমনের সংবাদ পেলে আমীর মুয়াবিয়া (রা)ও আশি হাজার সিরীয় সৈন্য সংগে নিয়ে মোকাবিলার জন্য বের হলেন।

৩৬ হিজরীতে ফোরাত নদীর তীরবর্তী সিফফীন নামক স্থানে উভয়ের সেনাবাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর সৈন্যদেরকে ফোরাত নদীর তীরে সমাবেশ করে পানি দখল করেন এবং হযরত আলী (রা)-এর সৈন্যদের জন্য পানি বন্ধ করে দেন। পানি নেয়ার অনুমতির জন্য হযরত আলী (রা) আমীর মুয়াবিয়া (রা)-কে বলে পাঠালে তিনি তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তখন বাধ্য হয়ে হযরত আলী (রা) তাঁর সেনাপতি মালেক আশতারকে শক্তি প্রয়োগ করে পানি দখল করার নির্দেশ দেন। পানি আমীরুল মু'মিনীনের দখলে আসে। কিন্তু তিনি আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর সৈন্যদেরকে পানি নেয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

হযরত আলী (রা) বাশির ইবনে উমরের নেতৃত্বে একটি এবং জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালীর (রা) নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধিদল আমীর মুয়াবিয়ার কাছে প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি দল দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে হযরত উসমানের খুনীদের হস্তান্তরের জন্য পীড়াপীড়ি চলতে থাকে। এদিকে হযরত আলী (রা) ছিলেন নিরূপায়।[১] শেষ পর্যন্ত আমীর মুয়াবিয়া (রা) প্রতিনিধিদলকে বলেন ঃ তোমরা চলে যাও। আমার ও তোমাদের মধ্যেকার বিবাদের ফয়সালা করবে তরবারি। তারপর তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সমঝোতা এবং গৃহযুদ্ধ রোধের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) বাধ্য হয়ে তরবারির বাঁটে হাত রাখেন। এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শুরু করার আগে হযরত আলীর (রা) পক্ষ থেকে সৈন্যদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দান করা হয় ঃ

---

১. নিম্নে বর্ণিত ঘটনা থেকে হযরত আলী (রা)-এর এই নিরূপায় অবস্থা অনুমান করা যায়। বিখ্যাত দুই সাহাবী আবুদ দারদা (রা) ও আবু উমামা বাহেলী (রা) মুয়াবিয়া (রা)-এর কাছে যান এবং তাদের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয় ঃ

আবুদ দারদা ঃ তুমি আলীর বিরুদ্ধে লড়াই করছো কেন ? তিনি কি তোমার চেয়ে ইমামতের জন্য অধিক উপযুক্ত নন ?

মুয়াবিয়া (রা) ঃ আমি উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে লড়াই করছি।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

www.amarboi.org

"তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু না করা পর্যন্ত তোমরা লড়াই করবে না। তোমরা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করবে না। যুদ্ধে তারা পরাজিত হলে পালায়নরতদের পশ্চাদ্ধাবন করবে না। আহতদের মাল ছিনিয়ে নেবে না। কাউকে উলংগ করবে না। কারো মাল নেবে না।" প্রথম দিকে কয়েক মাস পর্যন্ত ছোটখাট যুদ্ধ চলতে থাকে। ৮৫টি সাধারণ সংঘর্ষ হয়। মুহাররাম মাসে যুদ্ধ পুনরায় মুলতবী হয়ে যায়। হযরত আলী (রা) আপোষ-আলোচনার জন্য বহু প্রতিনিধি দল পাঠান। কিন্তু সবগুলো প্রতিনিধিদলই বিফল হয়ে ফিরে আসে। অবশেষে সফর মাস থেকে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। উভয় পক্ষের এক একটি গোত্র ব্যূহ ছেড়ে বাইরে চলে আসতো এবং পরস্পরের মোকাবিলা করতো। হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীতে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী সাহাবা কিরামের অন্যতম। হিজরতের পর মসজিদে নববী নির্মাণের সময় পাথর বহনের ক্ষেত্রে তিনি যখন বেশী করে অংশগ্রহণ করছিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ ويح عمار تقتله الفئة الباغية (بخارى) "আফসোস ! আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।" পঞ্চম দিনে হযরত আম্মার (রা) ব্যূহ ছেড়ে বাইরে আসলেন এবং আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর সৈন্যদের মোকাবিলা শুরু করলেন। তুমুল যুদ্ধ হলো এবং তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর শাহাদাতে হযরত আলী (রা) অত্যন্ত বেদনাহত হলেন। মুয়াবিয়াও (রা) আফসোস করলেন। আমর ইবনুল আস (রা) তো বলেই ফেললেন ঃ আহ ! আমি যদি বিশ বছর আগে মারা যেতাম তাহলে কতইনা ভাল হতো। তাঁর শাহাদাত লাভে হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীতে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। রাবীয়া, মুদের এবং হামাদান গোত্র জীবনের পরোয়া না করে মুয়াবিয়া (রা)-এর বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুয়াবিয়া (রা) বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে থাকলো। এদিকে হযরত আলী (রা)

আবুদ দারদা ঃ উসমান (রা) কে কি আলী (রা) হত্যা করেছেন ?

মুয়াবিয়া (রা) ঃ তিনি হত্যা করেননি। কিন্তু হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছেন। তাদেরকে আমার হাতে তুলে দিলে আমি সবার আগে বাইয়াত করতে প্রস্তুত আছি।

তাঁরা উভয়েই আমীরুল মুমিনীন আলী (রা) কে বিষয়টি জানালেন। এ খবর শুনে সেনাবাহিনী থেকে প্রায় বিশ হাজার সৈনিক বেরিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকলো ঃ আমরা সবাই উসমান (রা)-এর হত্যাকারী। হযরত আলী (রা) তাঁদের দুজনকে বললেন ঃ আপনারা বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমার নিরুপায় অবস্থা দেখছেন। একথা শুনে তারা সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন এবং উপকূলীয় এলাকার দিকে চলে যান।

www.amarboi.org

-এর বাহিনীর উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পেলো। হযরত আলী (রা) নিজে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর বাহিনীর ঝান্ডাবাহী নিহত হলো। এই ভয়ানক যুদ্ধ কাদেসিয়ার লাইলাতুল হারীরের মত রাত্রিবেলাও চললো। আমীর মুয়াবিয়া (রা) যখন দেখলেন যে, এখন যুদ্ধ বন্ধ হওয়া অসম্ভব কিন্তু পরাজয় নিশ্চিত তখন তিনি তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও অবস্থান বহাল থাকার শর্তে আপোস-আলোচনার জন্য যোগাযোগ করতে শুরু করলেন। হযরত আলী (রা) শর্তযুক্ত আপোসে অস্বীকৃতি জানালেন আমর্ ইবনুল আস (রা) আমীর মুয়াবিয়া (রা)-কে এমন একটি কৌশল অবলম্বন করতে বললেন যাতে যুদ্ধ আপনা থেকেই বন্ধ হবে। অর্থাৎ তাদের সিরীয় সৈন্যরা হযরত উসমান (রা)-এর মাসহাফ সহ অন্য সব মাসহাফ নিজ নিজ বর্শাগ্রে বেঁধে একথা ঘোষণা করতে করতে যুদ্ধের ময়দানে এসে হাযির হবে যে, আসুন ! কুরআন আমাদের ও আপনাদের মধ্যেকার বিরোধের মীমাংসা করবে। সুতরাং পরদিন সকালে সিরীয় সৈন্যরা একটি অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করে যুদ্ধের ময়দানে আবির্ভূত হলো। সম্মুখ ভাগে দামেশকের বিশাল মাসহাফ খানা পাঁচটি বর্শার মাথায় বাঁধা ছিল এবং পাঁচ ব্যক্তি তা উচ্চে তুলে ধরেছিলো। তা ছাড়াও যার কাছে যে মাসহাফ ছিল সে তা বর্শার মাথায় বেঁধে তুলে ধরেছিলো। হযরত আলীর (রা) বাহিনীর পক্ষ থেকে আশতার নাখয়ী তার ওপর আক্রমণ করলে বাহিনীর মধ্যভাগ থেকে ফযল ইবনে আদহাম ও অন্যান্য সর্দারগণ চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ আল্লাহর এই কিতাব আমাদের ও তোমাদের বিবাদের ফয়সালাকারী। আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর পক্ষের জেনারেল আবুল আ'ওয়ার সালমা নিজের মাথার ওপর কুরআন শরীফ নিয়ে একথা বলতে বলতে হযরত আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর একদম নিকটে পৌছে গেল। আশতার নাখয়ী তার সৈন্যদেরকে বললেন, এটা একটা চক্রান্ত। তারপর তিনি প্রচন্ড আক্রমণ চালালেন। কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর সৈনাদলের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল। আশ'আস ইবনে কায়েস, মিস'আর ইবনে ফাদাক, ইবনুল কাওয়া এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য নেতৃবর্গ বলতে লাগলেন ঃ আমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহবান করা হচ্ছে আর আমরা তা অস্বীকার করবো এটা কি করে হতে পারে ? হযরত আলী (রা) তাদেরকে বুঝালেন যে, এটা শঠতা ও প্রতারণা এবং তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বার বার বলতে থাকলে তারা বললো ঃ আপনি যুদ্ধ বন্ধ করুন এবং আশতারকে প্রত্যাহার করুন। অন্যথায় হযরত উসমান (রা)-এর যে পরিণতি হয়েছিলো আপনারও সেই একই পরিণতি হবে। এই পরিস্থিতি দেখে হযরত আলী (রা) বেদনাহত হয়ে বললেন ঃ "যা ইচ্ছা তোমরা করো।" সাথে সাথে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আশতার নাখয়ীকেও নির্দেশ দিলেন। আশতার নাখয়ী প্রথমে যুদ্ধ বন্ধ করতে যদিও দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলের মতানুসারে তাকে যুদ্ধ বন্ধ করতে হলো।

www.amarboi.org

সালিশী

যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে, বিতর্কিত বিষয়ের ফায়সালার ভার দুই পক্ষের মনোনীত বিচারকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। তারা কুরআন ও "সুন্নাতে আদেলা" অর্থাৎ প্রচলিত নীতি ও প্রথা অনুসারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। সিরীয়রা হযরত আমর ইবনুল আসের (রা) নাম পেশ করলো। হযরত আলী (রা)-এর অনুসারীদের পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা আশ'আরীর (রা)-এর নাম পেশ করা হলো। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) যেহেতু অত্যন্ত চালাক ও আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর একান্ত বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। তাঁর বিপরীতে হযরত আবু মূসা আশ'আরীর (রা) মত নিতান্তই সহজ সরল বুযর্গ ব্যক্তির নাম ছিল বেমানান ও বেখাপ্পা। তাই হযরত আলী (রা)-এর কাছে মনপুত হলো না। তিনি ইবনে আব্বাস (রা) অথবা মালেক আশতারের নাম প্রস্তাব করলেন। কিন্তু ইরাকীরা তাতে সম্মত হলো না। তিনি আহনাফ ইবনে কায়েসকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে তারা এ প্রস্তাবেও রাজি হলো না। হযরত আলী (রা) যখন দেখলেন যে, তাঁর অনুসারীরা আবু মূসা আশ'আরী (রা) ছাড়া আর কারো ব্যাপারে মোটেই সম্মত নয় তখন তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে বললেন ঃ "যাকে ইচ্ছা সালিশ নিয়োগ করো এ ব্যাপারে আমার কোন বক্তব্য নেই। শেষ পর্যন্ত হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) ও হযরত আমর ইবনুল আস (রা) সালিশ নিযুক্ত হলেন। দূত পাঠিয়ে হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে (রা) ডেকে আনা হলো। উভয় পক্ষের লোকজন মিলে চুক্তিনামা প্রস্তুত করলো। চুক্তিনামার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ

এই চুক্তিপত্র যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কূফাবাসী এবং তাদের সংগী সাথীদের পক্ষ থেকে আলী ইবনে আবী তালেব (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) ইবনে আবী সুফিয়ান (রা) তাঁর সহযোগী ও সিরীয়দের পক্ষ থেকে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমরা দুইজন শুধুমাত্র আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা) এবং আল্লাহর বাণীর ফয়সালাকে গ্রহণ করবো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কিতাবই হবে আমাদের মধ্যে ফায়সালাকারী। আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে যে আদেশ দেবে তা আমরা মাথা পেতে নেব এবং যে নিষেধ করবে তা থেকে বিরত থাকব। আবু মূসা (রা), আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস ও আমর ইবনুল আসকে সালিশ নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুসারেই ফায়সালা করবেন। যদি আল্লাহর কিতাবে কোন বিষয় না পাওয়া যায় তাহলে "সুন্নাতে আদেলায়ে জামেয়া গায়ের মুখতালেফ ফীহা" অর্থাৎ প্রচলিত সর্বজনগ্রাহ্য নীতি ও প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করবে। ফয়সালা যদি

www.amarboi.org

আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে আদেলার পরিপন্থী হয় তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না। সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পুনরায় যুদ্ধ করার এখতিয়ার থাকবে। ফায়সালার জন্য রমযান পর্যন্ত অবকাশ দেয়া যাচ্ছে। তারা ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী কোন স্থানে তাদের ফয়সালা ঘোষণা করবেন।

উভয় পক্ষের কিছু সংখ্যক দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, দুইজন সালিশ 'দাওমাতুল জানদাল' অথবা আযরুহ নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। চুক্তিপত্রে ৩৭ হিজরীর ১৩ই সফর তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়।

সিফফীন যুদ্ধে উভয় পক্ষ তিন মাস বিশ দিন অবস্থান করে। তাদের মধ্যে নব্বইটি সংঘর্ষ হয় এবং এতে আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)-এর ২৫ হাজার এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুসারীদের ৪৫ হাজার লোক নিহত হয়। চুক্তিপত্র পূর্ণাঙ্গ করার পর সিফফীনের ময়দানে সত্তর হাজার যোদ্ধাকে চির নিদ্রায় শায়িত করে উভয় পক্ষ সেখান থেকে বিদায় হয়। এ যুদ্ধে নিহত মুসলমানদের সংখ্যা এ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত সমস্ত যুদ্ধে নিহতদের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও অধিক। আমীর মুয়াবিয়া (রা) তার সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের সাথে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) তাঁর অধিকাংশ সংগী-সাথীদের সাথে তাঁর রাজধানীতে পৌঁছলেন।

ফয়সালার সময় নিকটবর্তী হলে হযরত আলী (রা) শুরাইহ ইবনে হানী (রা) ও ইবনে আব্বাসের (রা) নেতৃত্বে চারশ লোকের একটি দলের সাথে হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে 'দাওমাতুল জানদাল' প্রেরণ করেন। কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া (রা) নিজে চারশ লোকের একটি দল সহ তাঁর সালিশ আমর ইবনুল আসের (রা) সাথে দাওমাতুল জানদালে যাত্রা করেন। কিছু সংখ্যক নিরপেক্ষ সাহাবী যেমন ঃ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) প্রমূখও এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানার জন্য সেখানে হাজির হন। উভয় সালিশ নিজ নিজ দলবল সহ সেখানে পৌঁছার পর বিশেষ মজলিসে আলোচনা করতে বসেন। আলোচনার শুরু হলে প্রথমে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে হযরত উসমান (রা)-এর নিকট অভিভাবক বানিয়ে কিসাস দাবী করার অধিকারী এবং তাঁকেই খিলাফতের হকদার বলে মেনে নেয়ার ব্যাপারে আবু মূসা আশ'আরী (রা)-কে সম্মত করতে চেষ্টা করেন। গভর্নরী দানের লোভও দেখান। কিন্তু আবু মূসা আশ'আরী (রা) তাতে মোটেই সম্মত হন না। তিনি বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের বাদ দিয়ে কোনক্রমেই মুয়াবিয়া (রা)-কে খিলাফত দেয়া যেতে

www.amarboi.org

পারে না। এ বিচারে আলী (রা) খিলাফত লাভের অধিকারী। তবে এই গৃহযুদ্ধের কারণে আলী (রা)-কে সরিয়ে রাখতে হলে ইবনে উমর (রা)-কে মনোনীত করতে হবে। কারণ, তিনি বিবাদের বাইরে অবস্থান করছেন। কিন্তু আমর ইবনুল আস তাতে সম্মত হলেন না। অবশেষে উভয়ে এ বিষয়ে একমত হলেন যে, আলীকে (রা) খিলাফত থেকে এবং মুয়াবিয়া (রা)-কে ইমারত থেকে অপসারণ করা হবে। তারপর গোটা উম্মাহ নতুনভাবে খলিফা নির্বাচনের অধিকার লাভ করবে, তারা যাকে ইচ্ছা খলিফা নির্বাচিত করে নেবে। এই ঐকমত্যের পর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য তারা দুইজন জনসমাবেশে হাজির হলেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা)-কে বললেন ঃ যেহেতু আপনি বয়সে বড় এবং সৎব্যক্তি হিসেবে আমার চেয়ে উত্তম তাই প্রথমে আপনি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করুন। তিনি প্রস্তুত হলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন ঃ আপনি এ সময় আগে কিছু করবেন না। এর মধ্যে আমর ইবনুল আসের (রা) চাতুর্য আছে বলে মনে হয়। প্রথমে তাকে বলতে দিন। কিন্তু আবু মূসা আশ'আরী (রা) তাঁর কথা না মেনে সিদ্ধান্ত শুনানোর জন্য দাঁড়ালেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর বললেন ঃ আমরা উভয়ে বিষয়টি সম্পর্কে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) দুইজনকেই অপসারণ করতে হবে যাতে মুসলিম উম্মাহ্ নতুন করে খলিফা নির্বাচনের অধিকার লাভ করে। এ কারণে আমি দুইজনকেই পদচ্যুত করছি। এখন গোটা জাতি পুনরায় খলিফা নির্বাচনের অধিকারী। আবু মূসা (রা)-এর পর আমর ইবনুল আস (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আবু মূসা আশ'আরী (রা) তাঁর লোককে পদচ্যুত করলেন। আমিও তা সমর্থন করছি এবং আলী (রা)-কে পদচ্যুত করছি। তাঁর পরিবর্তে মুয়াবিয়া (রা)-কে অধিক যোগ্য বিবেচনা করে খলিফা নিয়োগ করছি।

এই মিথ্যা বিবৃতিতে আবু মূসা আশআরী (রা) অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন এবং চিৎকার করে বললেন ঃ এটা কি ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ? এরপর তাদের দুইজনের মধ্যে তিক্ত বাকবিতন্ডা শুরু হলো। উভয় পক্ষের লোকজনই উত্তেজিত হয়ে উঠলে অন্যেরা মধ্যস্থতা করে নিরস্ত করলো। এ ঘটনায় হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) এতটা অপমানবোধ করলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন এবং তারপর সারা জীবন মানব সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে বাস করেছেন। সকল লোকজন প্রত্যাবর্তন করলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-কে খবর দেয়ার জন্য তাঁর দলসহ যাত্রা করলেন। এদিকে এ সিদ্ধান্তের পর হযরত আমর ইবনুল আস (রা) ও সিরীয়রা আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর বাই'আত করলেন। ফায়সালার দিন থেকে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর শক্তি হ্রাস

www.amarboi.org

পেতে থাকে। আমীর মুয়াবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-এর শাসনাধীন প্রদেশসমূহের ওপর ধ্বংসাত্মক আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করলেন।

হযরত আলী (রা) দাওমাতুল জানদালের ফায়সালা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন ঃ যেহেতু উভয় সালিশই আল্লাহর কিতাব ও 'সুন্নাতে আদেলা' মোতাবেক ফয়সালা করার শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তাদের ফায়সালা গ্রহণযোগ্য নয়, বরং পুনরায় যুদ্ধের এখতিয়ার আছে। তিনি কূফার জামে মসজিদে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করলেন এবং সিরিয়ার ওপর পুনরায় আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। কারণ, তাঁর মতে দুই সালিশের ফায়সালা সঠিক ছিল না।[১] ইতিমধ্যেই খারেজীদের বিদ্রোহের খবর জানার পর হযরত আলী (রা) সেদিকে মনযোগ দিতে বাধ্য হন।

---

১. এই সালিশী ফায়সালার ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা আছে এবং দুটিতেই হযরত আলী (রা)-এর পদচ্যুতির কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি মত হচ্ছে, ফায়সালার সময় দুই সালিশের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিলো। ঐতিহাসিকগণ সাধারণত এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। অপর মতটি বর্ণনা করেছেন ঐতিহাসিক মাসউদী। তাঁর মতে ফায়সালা লিখিতভাবে হয়েছিল। সালিশদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য ছিল না যে, হযরত আলী (রা) ও আমীর মুয়াবিয়া (রা) দুইজনকেই পদচ্যুত করা হয়েছে এবং উম্মাহকে নতুনভাবে খলিফা নির্বাচনের অধিকার দেয়া হয়েছে। মোট কথা, ফায়সালা যেভাবেই হয়ে থাকুক না কেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুসারে সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক বিচার ক্ষমতা সম্পন্ন সাহাবী সাইয়েদেনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর মতে, এ ফায়সালা কিতাব ও 'সুন্নাতে আদেলা'র পরিপন্থি হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ সম্পর্কে বাবু মাদীনাতিল ইলম (জ্ঞানের শহরের দরজা) অর্থাৎ হযরত আলী (রা) কি যুক্তি পেশ করেছিলেন তা জানা যায়নি। তবে আমার মতে এভাবে তার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে-যে, হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত বিতর্কের বিষয় ছিল না, বরং আমীর মুয়াবিয়া (রা) হযরত উসমান (রা)-এর কিসাসের দাবী করছিলেন সেটিই ছিল বিতর্কের বিষয়। তাঁর বক্তব্য ছিল, আলীর (রা) সেনাদলে হযরত উসমানের (রা)-এর খুনী ও গোলযোগ সৃষ্টিকারীরা বিদ্যমান। তাদেরকে মুয়াবিয়া (রা)-এর হাতে তুলে দেয়া হোক। তিনি তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। হযরত আলী (রা)-এর বক্তব্য ছিল, মুয়াবিয়া (রা) প্রথমে আমার বাইয়াত করুক। কারণ, আমার খিলাফত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, মদীনাবাসীরা আমার বাইয়াত করেছে। বাইয়াতের পর হযরত উসমান (রা)-এর কিসাসের বিষয় উত্থাপন করুক। এ অবস্থায় প্রয়োজন ছিল এই বিতর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে উভয় সালিশ কর্তৃক একটি সিদ্ধান্ত দেয়া। কিন্তু তাঁরা মূল বিষয়বস্তু থেকে বিচ্যুত হয়ে খিলাফত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়ে বসেছিলেন। তাও আবার এভাবে যে, একজন সালিশ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রা)-এর বিরোধিতা এবং আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতি পক্ষপাতিত্বকে তার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে নেয় এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

www.amarboi.org

খারেজী

সিফফীন যুদ্ধের সমাপ্তিকালে যারা হযরত আলী (রা) কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সালিশ মানতে বাধ্য করে এবং এই বলে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে বিচারক মানা বৈধ নয় এবং কূফা যাওয়ার পরিবর্তে তারা হাররে ওয়ারা চলে যায়। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় বার হাজার।

তাছাড়া এ ক্ষেত্রে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর খিলাফতের প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা তিনি খিলাফতের দাবী করেননি কিংবা তাঁর খিলাফতের জন্য বাই'আতও অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং বলা যায়, তাঁর দেয়া শর্ত পূরণ হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের অনুকূলে বাই'আত করতে প্রস্তুত ছিলেন। এরপর থাকে সিরিয়ার গভর্নরী থেকে বরখাস্ত করার বিষয়। এ সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা তাদের আলোচনার বিষয়বস্তুই ছিল না। হযরত আলী (রা) তাঁকে যে সময় পদচ্যুত করেছিলেন তিনি তখনই পদচ্যুত হয়েছিলেন। মোট কথা, উল্লেখিত পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর একথাই বলা যাবে যে, কুরআনের আয়াত ঃ

وَاَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا- فَاِنْ بَغَتْ احداَ هُمَا عَلَى الاُخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتّٰى تَفِىْءَ اِلَى امرِ الله- فَاِنْ فَاءَتْ فَاصلِحُوابَيْنَهُمَا بِالعدلِ و اقسطُوا ط -(سورة حجرات - اية ٩)

(মুমিনদের দুটি দল লড়াইয়ে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। এরপরেও তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা এবং সুবিচার করবে। (সূরা হুজুরাত, আয়াত-৯) এর পরিপন্থি ফায়সালা হয়েছিল। অর্থাৎ ন্যায় ও সুবিচারের শর্ত পূরণ করা হয়নি। এভাবে ফয়সালাটি সুন্নাতে আদেলারও পরিপন্থি হয়েছিল। সুন্নাতে আদেলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হচ্ছে, সেই সময় পর্যন্ত তিনজন খলিফা অতিবাহিত হয়েছিলেন। প্রথমে মদীনার বনী সায়েদার লোকজন প্রথম খলিফার বাই'আত গ্রহণ করে এবং তাঁর পরে গণবাই'আত অনুষ্ঠিত হয়। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা) শেষ পর্যন্ত তার বাই'আত গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয় খলিফার খিলাফতের ব্যাপারে প্রথম খলিফা মদীনার বড় বড় সাহাবী (রা)-এর সাথে পরামর্শের পর চুক্তিনামা লেখেন এবং তারপর গণবাই'আত অনুষ্ঠিত হয়। সা'দ বিন উবাদা (রা) তার বাই'আতও গ্রহণ করেন না। তা সত্ত্বেও উভয় খলিফার খিলাফতই সর্বজন স্বীকৃত বলে মর্যাদা পায়। তৃতীয় খলিফার নির্বাচন হয় এভাবে যে, শুরার সদস্যদের সাথে পরামর্শের পর খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে আদিষ্ট হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) মদীনাবাসীদের পরামর্শ গ্রহণের পর তৃতীয় খলিফার হাতে বাই'আত হন। এরপরই তৃতীয় খলিফার হাতে গণবাই'আত অনুষ্ঠিত হয়। মোট কথা, সুন্নাতে আদেলা ছিল এই যে, গণবাই'আতের জন্য প্রথমে মদীনাবাসীদের বাই'আতই যথেষ্ট। এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠের বাই'আত অনুষ্ঠানের পর কোন ব্যক্তি বিশেষের বাই'আত না করা খিলাফতের জন্য আদৌ কোন ক্ষতিকর ব্যাপার ছিল না। অতএব মদীনাবাসী এবং অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

www.amarboi.org

তারা আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা), আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা), আমীর মুয়াবিয়া (রা) এবং আমর ইবনুল আস (রা) সবারই বিরোধী ছিল, বরং তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ এবং হত্যা করা বৈধ বলে মনে করতো (নাউযুবিল্লাহ)। প্রথম দিকে তাদের মৌলিক নীতি ছিল, আল্লাহ ছাড়া কারো ফায়সালা মানা কিংবা কাউকে বিচারক বানানো কুফরী। প্রতিটি গোনাহই কুফরী। গোনাহ করে তাওবা করে না এমন প্রত্যেক গোনাহগারকে হত্যা করা বৈধ। ইসলামে এটাই ছিল সর্বপ্রথম বিদআতী ফিরকা। নিজেদের কল্পিত ধর্মমতে তারা ছিল চরম গোঁড়া। তারা কঠোরভাবে তাদের ধর্মমত মেনে চলতো। মুসলমানদের রক্তপাতে তারা ছিল অত্যন্ত নির্দয়। তারা নিজেদের ছাড়া যেকোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ মনে করতো। কুফাতেও তাদের হাংগামা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রাসেবীর বাড়ীতে খারেজীদের সমাবেশ হতে থাকে। খারেজীরা সব সময় ঘোষণা করে বেড়াতো

জনগোষ্ঠী যখন হযরত আলী (রা)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে তখন পূর্ববর্তী তিনজন খলিফার খিলাফতের ন্যায় তাঁর খিলাফতও সর্বজন স্বীকৃত খিলাফতের মর্যাদা লাভ করে। এভাবে খিলাফত লাভের পূর্ণাংগ যোগ্যতা থাকাবস্থায় তা পরিপূর্ণতা লাভ করার পর কোন এক ব্যক্তির বিরোধিতার কারণে খলিফাকে পদচ্যুত করা সুন্নাতে আদেলার পরিপন্থী। এ কারণে তৃতীয় খলিফাকে তাঁর বিরোধীরা পদচ্যুত করতে চাইলেও তা করতেসক্ষম হয়নি। কারণ, তা তাদের এখতিয়ারের বিষয় ছিল না। ফলে তারা বাধ্য হয়ে তৃতীয় খলিফার কাছে তাঁর পদত্যাগ দাবী করেছিল। কেননা এ ক্ষেত্রে পদত্যাগই ছিল খলিফাকে অপসারণের একমাত্র উপায়। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করেন। এ থেকে জানা যায় যে, সুন্নাতে আদেলা হচ্ছে, খিলাফতের যোগ্যতা থাকাবস্থায় নির্বাচিত খলিফা পদত্যাগ না করলে পদচ্যুত হতে পারেন না। এমতাবস্থায় সালিশদের হযরত আলী (রা)-কে পদচ্যুত করা যে নিসন্দেহে সুন্নাতে আদেলার পরিপন্থী কাজ ছিল শুধু তাই নয় বরং তা ছিল স্থায়ীভাবে একটি ফাসাদের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া। অর্থাৎ খিলাফতের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যখনই কোন খলিফার বিরোধিতা হবে তখনই পদচ্যুত করা। মতানৈক্য তো থাকবেই। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার সাথে সা'দ ইবনে উবাদার মতানৈক্য ছিল। তৃতীয় খলিফার সাথেও কূফা, বসরা এবং মিসরের একটি দলের বিরোধ ছিল। তারা খলিফাকে পদচ্যুত করতে চাইলে জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহ আমাকে সম্মানের যে জামা পরিয়েছেন নিজ হাতে আমি তা খুলে ফেলতে পারিনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীয়ত অনুসারে আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবো।" (ইবনে সা'দ) সত্য বলতে কি, এ বিরাট বিপর্যয়কে রোধ করার জন্য তৃতীয় খলিফা শাহাদাত বরণ করেছেন কিন্তু এই দরজা উন্মুক্ত হতে দেননি। এটাই সর্বসম্মত সুন্নাতে আদেলা। একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত আলী (রা) সুন্নাতে আদেলায় পরিপন্থী কোন ফায়সালা কিভাবে মেনে নিতে পারতেন ? (আমীমুল ইহসান)

www.amarboi.org

যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নির্দেশই অনুসরণযোগ্য নয়। কিন্তু তারা বাধ্য হয়েই ৩৭ হিজরীর শাওয়াল মাসে নিজেদের নীতির বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবকে তাদের নেতা মনোনীত করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) একদিন মসজিদে খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় তারা মসজিদের আশেপাশে দাঁড়িয়ে এই বলে শ্লোগান দিতে শুরু করে যে, আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশই অনুসরণযোগ্য নয়। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ আল্লাহু আকবার ! একটি সত্য কথার এতটা ভ্রান্ত অর্থ করা হয়েছে। এসব লোক কূফা ছেড়ে নাহরওয়ানের পুলের নিকট একত্রিত হয় এবং সে স্থানকেই নিজেদের কেন্দ্র বানায়। এভাবে খারেজীরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং ফিতনা ফাসাদে লিপ্ত হয়। প্রথম দিকে হযরত আলী (রা) তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি তাদেরকে বুঝানোর জন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এবং কায়েস ইবনে সা'দকে (রা) প্রেরণ করেন। তারা তাদেরকে বুঝাতেও সক্ষম হন। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারা সঠিক পথে ফিরে আসে না। মুসলমানদের ওপর তাদের অত্যাচারের মাত্রা অত্যাধিক বেড়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে হাবাব নামক একজন সৎ বুজর্গ ব্যক্তি স্ত্রীসহ তাদের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় তারা তাঁকে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করে এবং তাঁর গর্ভবর্তী স্ত্রীর পেট ফেড়ে ফেলে। কারণ, তিনি হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলীর (রা) প্রশংসা করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলীর (রা) সহযোগী ও সংগী-সাথীরা সিরিয়া যাত্রার পূর্বে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই ফিতনার মূলোৎপাটনের ওপর জোর দিলেন। সকল সাহাবা কিরামের (রা) মতেও খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছিল একটি অতীব প্রয়োজনীয় কাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ফিতনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং এই যুদ্ধের জন্য তাগিদ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী মোতাবেক হযরত আলী (রা) খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধের পূর্বে তিনি আবুদুল্লাহ ইবনে হাবাবের নিহত হওয়ার ঘটনার তদন্তের জন্য হারেস ইবনে মুররাকে খারেজীদের কাছে প্রেরণ করেন। জালেমরা তাকেও হত্যা করে ফেলে। এরপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর সেনাবাহিনী নাহরওয়ান গিয়ে উপনীত হয়। প্রথম দিকে আমীরুল মু'মিনীন সদুপদেশ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, যারা কুফায় চলে যাবে তারা নিরাপদে থাকবে। অধিকাংশ খারেজীদের ওপর এ ঘোষণার ভাল প্রভাব পড়ে। প্রায় পাঁচশত লোক তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হযরত আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীতে শামিল হয় এবং কিছু সংখ্যক লোক কুফায় চলে যায়।

www.amarboi.org

এরপর খারেজীদের দলে চার হাজার লোক অবশিষ্ট থাকে। হযরত আলী (রা)-এর সেনাবাহিনী হামলা করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। নাহরওয়ানের পরাজয়ের পর যদিও খারেজীদের শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়, তথাপি প্রাণে বেঁচে যাওয়া কিছু লোক শেষ পর্যন্ত এমনভাবে ফিতনা ফাসাদে লিপ্ত থাকে যে, তারা আমীরুল মু'মিনীন (রা)-কে কখনো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তাদেরই এক বদবখতের হাতে আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) শহীদ হন।

সাবায়ী

সাবায়ী দলের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। খারেজীদের বিদ্রোহের সময় ইবনে সাবা আরো একটি ফিতনার জন্ম দেয়, অর্থাৎ সে হযরত আলী (রা)-এর উলুহিয়াত বা হযরত আলী (রা) খোদা এই আকীদা প্রচার করতে থাকে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) একথা জানতে পেরে তাকে গ্রেফতার করিয়ে তওবা করাতে প্রয়াস পান। কিন্তু সে তওবা না করায় সবাইকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। (বুখারী)

হযরত আলী (রা)-কে খারেজীদের সাথে সংঘাতে ব্যস্ত দেখে আমীর মুয়াবিয়া (রা) সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন না তা কি করে হতে পারে? অতএব তিনি হযরত আলী (রা)-এর শাসনাধীন প্রদেশ ও এলাকাসমূহের ওপর মারাত্মক আক্রমণ শুরু করেন।

৩৮ হিজরীতে তিনি আমর ইবনুল আস (রা)-এর নেতৃত্বে মিসরে সৈন্য প্রেরণ করেন। সেখানে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা) ছিলেন হযরত আলীর গভর্নর। মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা করেন। ফলে আমর ইবনুল আস (রা) সাহায্যের জন্য মুয়াবিয়া (রা) ইবনে খাদীজকে ডাকতে বাধ্য হন। অন্যদিকে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে মালেক আশতারের সাথে সাহায্যকারী সৈন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে শত্রুরা প্রতারণার মাধ্যমে বিষ প্রয়োগ করে তাদেরকে হত্যা করে। ফলে আমর ইবনুল আস (রা)-এর জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে যায়। মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রা) পরাজিত হন এবং নৃশংসভাবে নিহত হন। মুহাম্মাদ ইবনে খাদীজ মৃত গাধার চামড়ায় জড়িয়ে সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর (রা)-এর পুত্রকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। এবার গোটা মিসর তার অধিকারে আসে। তিনি আমীর মুয়াবিয়ার জন্য বাই'আত গ্রহণ করেন এবং প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেখানকার গভর্নরী লাভ করেন।

৩৮ ও ৩৯ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর সৈন্যদের ছোট ছোট ইউনিট গঠন করে হিজায, ইরাক ও আরব উপদ্বীপের অবশিষ্ট অংশে ছড়িয়ে দেন যাতে তারা হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে আমীরুল মু'মিনীন আলীর (রা)-এর

www.amarboi.org

অস্থিরতা ও অসুবিধা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর আক্রমণকারী সেনাদলসমূহকে অধিকৃত এলাকা থেকে বহিষ্কার করলেও তার মাধ্যমে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে।

কিরমান ও ফারেসের অনারবরা বিদ্রোহ করে বসে। হযরত আলী (রা) যিয়াদ ইবনে সুমাইয়া (রা)-কে তা দমন করতে নির্দেশ দেন। তিনি অতি দ্রুত কিরমান, ফারেস এবং সমগ্র ইরানে শান্তি শৃংখলা ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনেন।

৪০ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া (রা) হারামাইন এবং ইয়ামান নিয়েও সংঘাত শুরু করেন। তার সৈন্যরা ঐসব স্থানেও জুলুম-নির্যাতন শুরু করে। আমীরুল মু'মিনীন (রা) তা প্রতিরোধের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই সময়েই তাঁকে শহীদ করা হয়। কিন্তু তাবারীতে বলা হয়েছে যে, আমীর মুয়াবিয়া (রা) সেই বছরের শেষ ভাগে হযরত আলী (রা)-কে লিখেন যে, রক্তপাত বহু হয়েছে। এখন আমাদের জন্য নিজ নিজ দখলভুক্ত এলাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাটাই উত্তম। এতে হযরত আলী (রা)ও চুপ থাকেন এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধ হয়ে যায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। والله اعلم কিন্তু এই শান্তি দেখার জন্য শাহে বেলায়েত হযরত আলী (রা) বেশী দিন জীবিত ছিলেন না।

বিজয়সমূহ

আমীরুল মুমিনীন আলী (রা)-কে গৃহ বিবাদ দমনের ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছিলো তাতে ইসলামী বিজয়ের পরিসর বৃদ্ধি করার অবকাশ তিনি পাননি বললেই চলে। শুধুমাত্র দুটি দিকে কিছু করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি কাবুলে এবং অপরটি সিস্তান এলাকায়। এখানে কিছু সংখ্যক আরব স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলো। তিনি তাদেরকে পরাস্ত করে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। অপরদিকে ৩৮ হিজরীতে তাগের ইবনে দাউরের নেতৃত্বে নৌপথে হিন্দুস্তানের ওপর আক্রমণ করার জন্য মুসলমানদের অনুমতি প্রদান করেন। সিন্ধু অঞ্চলে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে।[১] হারেস ইবনে মুররা কোকেনের (বোম্বাই) ওপর আক্রমণ করেন। তিনিও বিজয় লাভ করেন। তিনি আরো সামনে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই সাইয়্যেদেনা আলী (রা)-এর শাহাতাদের খবর পৌঁছলে বিজয়ের এই ধারা বন্ধ হয়ে যায়।

১. মুরুজুয যাহাব, ২য় খন্ড।

www.amarboi.org

হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত যুগে ভারতের সিন্ধুর ওপর হামলা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এভাবেই যেন ভারত বর্ষে বিজয়ের তালা খুলে যায়। হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে বাইরের কোন দেশের সাথে জিহাদ হয়নি বলে যে অভাববোধ হতে পারতো এই হামলা সেই অভাব পূরণ করে দেয়।

শাহাদাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বেই হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ হে আলী (রা) পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগা ছিল সেই ব্যক্তি যে সালেহ আলাইহি সালামের উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিলো এবং পরবর্তীকালের লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগা সেই যে তোমার মাথার রক্তে তোমার দাড়ি রঞ্জিত করবে। খারেজীদের ওপর নাহরোয়ানের যুদ্ধের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এই যুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাদের তিন ব্যক্তি আবদুর রহমান ইবনে মালজাম, উমর ইবনে বকর আতভামীমী এবং বারাক ইবনে আবদুল্লাহ হঠাত মক্কায় সমবেত হয়। ইসলামী জগতের খুন-খারাবির কথা স্মরণ করে অনুতাপ করতে থাকে এবং নাহরোয়ানে নিহতদের স্মরণ করে অশ্রুপাত করে। অতপর তারা পরামর্শ করে যে, আলী (রা), মুয়াবিয়া (রা) ও আমর ইবনুল আস (রা)-কে হত্যা করা প্রয়োজন যাতে ইসলামী জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে এবং আমরা নাহরোয়ানের নিহতদের প্রতিশোধ নিতে পারি। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ইবনে মালজাম বললো, আমি আলী ইবনে আবী তালিবকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। বারাক বললো, আমি মুয়াবিয়াকে খতম করবো। উমর ইবনে বকর আততামীমী বললো, আমি আমর ইবনুল আসকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দেবো। নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে নেয়ার পর তারা পরস্পর অংগীকারে আবদ্ধ হলো এবং ৪০ হিজরীর রমযান মাসের সতের তারিখে তিন জনকে হত্যার জন্য নির্দিষ্ট করলো। নিজেদের মধ্যে অংগীকারের পর এই তিন শয়তান সেখান থেকে যাত্রা করলো। ইবনে মালজাম কূফা গিয়ে উপস্থিত হলো এবং অন্য দুইজন যথাক্রমে সিরিয়া ও মিসরে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু তারা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ ও নিহত হলো। কিন্তু ইবনে মালজাম তার দুর্ভাগ্যের লক্ষ্যে সফলতা লাভ করলো।

৪০ হিজরীর ১৭ই রমযান জুম'আর দিন শেষ রাতে আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) তাঁর পুত্র ইমাম হাসান আলাইহিস সালামকে ঘুম থেকে জাগিয়ে

www.amarboi.org

বললেন ঃ আজ রাতে এই মাত্র আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনার উম্মত দ্বারা আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের জন্য বদদোয়া করো। তখন আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ, তাদের পরিবর্তে আমাকে ভাল লোক দান করো। আর আমার পরিবর্তে তাদেরকে খারাপ লোক দান করো।[১] এসব কথাবার্তা হচ্ছিলো ইতিমধ্যে সকাল হয়ে গলে। মুয়াযযিন আযান দিলে তিনি মসজিদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন।[২] অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস ছিল। যাওয়ার সময় রাস্তায় আস সালাত ! আস সালাত !! উচ্চারণ করতেন। সেই দিন ইবনে মালজাম তার দুই সহযোগী শাবীব ও দুর্দানের সাথে বিষ মাখা তরবারি নিয়ে লুকিয়ে ছিল। হযরত আমীরুল মুমিনীন (রা)কে দেখামাত্র অন্ধকারেই তাঁর পবিত্র ললাট লক্ষ করে তরবারির আঘাত করে। তরবারি মগজ পর্যন্ত বসে যায়। শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায় এবং পবিত্র দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। লোকজন চারদিকে থেকে ছুটে আসে। ইবনে মালজাম ধৃত হয় কিন্তু তার সহযোগীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। হযরত আলী (রা) তাঁর সামনে ইবনে মালজামকে হত্যা করতে দেননি। তিনি বলেন ঃ তাকে যত্নের সাথে রাখো। আমি যদি বেঁচে উঠি তাহলে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেয়ার বিষয়টি হবে আমার এখতিয়ারাধীন। তবে আমি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হই তাহলে সে যেমন আমাকে একটি আঘাত করেছে তোমরাও তাকে একটি মাত্র আঘাতই করবে।

যখন বেঁচে থাকার আশা আর থাকলো না তখন ছেলেদের ডেকে তাকওয়া, উত্তম আমল এবং দীনের খেদমতের জন্য অন্তিম উপদেশ দান করলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, আমরা কি আপনার পরে হযরত হাসানের (রা) বাইয়াত গ্রহণ করবো ? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। তোমরা নিজেরাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অবশেষে পরদিন রাতের বেলা খোদার প্রতি আত্মনিবেদনের মূর্ত প্রতীক হযরত আলী (রা) ইনতিকাল করেন এবং এভাবে খিলাফতে রাশেদার মহাকল্যাণের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

---

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ।

২. রাওদাতুল আহবাব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, শাহাদাতের রাতের বেশীর ভাগ সময় হযরত আলী (রা) আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করেন। ভোরে যে সময় তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হচ্ছেন সেই সময় গৃহে পালিত হাঁসগুলো তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে জড়িয়ে ধরতে থাকলো যেন যেতে দিতে চাচ্ছিলো না। অন্যেরা সেদিকে সরিয়ে দিতে চাইলে হযরত আলী (রা) নিষেধ করে বললেন ঃ তাকে মিলিত হতে দাও, সে তার মালিককে বিদায় জানাচ্ছে। (মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান)

www.amarboi.org

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত হযরত আলী মুর্তাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়সও তেষট্টি বছর হয়েছিলো। তিন দিন কম পাঁচ বছর খিলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন। হযরত ইমাম হাসান (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়েন এবং কুফার দারুল ইমারায় দাফন করেন। তবে মশহুর বর্ণনা মতে তাঁর পবিত্র মাযার নযফ আশরাফে অবস্থিত।

বকর ইবনে হাম্মাদ হযরত আলী (রা)-এর বেদনাদায়ক শাহাদাত সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেছিলেন ঃ

قل لابن ملجم والا قدار غالبة – هدمت ويلك لاسلام اركانا

قتلت افضل من يمشي على قدم – واول الناس اسلاما و ايمانا

واعلم الناس بالقران ثم بما – سن رسولنا شرعا وتبيانا–

صهر النبي و مولاه وناصره – اضحت مناقبة نورا وبرهانا

وكان منه على رغم الحسود له – ما كان هارون من موسى بن عمرانا

وكان في الحرب سيفا صار ما ذكرا – ليثا اذا لقى اقران اقرانا–

যদিও 'তাকদীর' অখণ্ডনীয় তবুও ইবনে মালজামকে বলো, তুমি ধ্বংস হও, তুমি ইসলামের স্তম্ভসমূহকে ধ্বংস করেছো। পৃথিবীতে যারা চলাফেরা করতেন তাদের সর্বোত্তম মানুষটিকে তুমি হত্যা করেছো; আর যিনি ছিলেন ইসলাম ও ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে সর্বপ্রথম ব্যক্তি।

তাছাড়া কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ সুস্পষ্ট ও সবিস্তারে জানতেন।

যিনি ছিলেন রাসূলের জামাতা, তাঁর বন্ধু ও সাহায্যকারী যার গুণাবলী প্রমাণ ও আলোক বর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাঁর প্রতি ঈর্ষা পোষণকারী থাকা সত্ত্বেও রাসূলের সাথে তার সম্পর্ক ছিল ঠিক তাই যা ছিল মূসা ও হারূনের মধ্যে।

যুদ্ধের ময়দানে যখন সমানে সমানে মোকাবিলা হতো তখন তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণধার তরবারি ও সিংহের ন্যায়।

খিলাফত ব্যবস্থা, কৃতিত্ব ও সংস্কার

আমীরুল মু'মিনীন সাইয়েদেনা আলী মুর্তাজার (রা) গোটা খিলাফতকালই গৃহযুদ্ধ, গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু শেষ

www.amarboi.org

মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যে অসাধারণ সাহসিকতা, ব্যক্তিত্ব এবং নজীরবিহীন দৃঢ় সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে ন্যায় ও সত্যের জন্য সমস্ত কঠোর পরিস্থিতি ও বিপদাপদের মোকাবিলা করেছেন তা পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি নিজে বলেন ঃ

عهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتال الناكثين و القاسطين والمارقين (بخارى)

"যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, জুলুম ও বিদ্রোহ করে এবং যারা দীনের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তাগিদ দিয়েছেন।"

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত সিদ্দীকে আকবরের শাসনকালেও ইসলামী রাষ্ট্র অত্যন্ত বিপদসংকুল অবস্থার মধ্যে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। হযরত আবু বকর (রা)-এর সহযোগী সবাই ছিলেন বড় বড় সাহাবা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ও শিক্ষা যাদেরকে দুর্জেয় শক্তি ও অফুরন্ত উদ্দীপনার উৎস বানিয়ে দিয়েছিলো। তাঁরা ছিলেন সরলতা, নিষ্ঠা ও ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। তাদের প্রতিপক্ষ ছিল ন্যায় ও সত্য থেকে বহুদূরে এবং দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতাও ছিল তাদের কম। পক্ষান্তরে তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যেমন ঃ রাসূলের (সা) স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা), হাওয়ারিয়ে রাসূল (সা) সাইয়েদেনা যুবায়ের (রা), আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম রুকন সাইয়েদেনা তালহা আলখায়ের, উম্মুল মু'মিনীর হযরত উম্মে হাবীবার (রা) ভাই আমীর মুয়াবিয়া (রা), মিসর বিজেতা হযরত আমর ইবনুল আস (রা) প্রমূক হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তারা প্রত্যেকেই নিজেকে ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করেছিলেন। হযরত আলীর (রা) সাথে বড় বড় সাহাবী ও সৎ লোকেরা অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং সাবায়ী জামায়াত তাঁর জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হযরত আলী (রা)-এর রাজনৈতিক ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ ছিল এই যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা) ও উমরের (রা)-এর মত তাকওয়া পরহেজগারী, দীনদারী ও আমানত, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সময় তাঁর অনুকূলে ছিল না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। একদিকে আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর পক্ষের লোকদের জন্য

www.amarboi.org

বায়তুল মালের অর্থ ইচ্ছেমত খরচ করছিলেন।[১] অপর দিকে হযরত আলী (রা) সবার থেকে প্রতিটি কানাকড়িরও হিসেব সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করতেন। তিনি বায়তুলমালের অর্থকে আল্লাহর মাল এবং তাতে সমস্ত মুসলমানের অধিকার আছে বলে মনে করতেন। এ কারণে তাঁর সমর্থকরাও[২] বিরক্ত হয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। তাঁর প্রিয়জনরা[৩] পর্যন্ত তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে থাকে। কিন্তু সত্য সত্যই এবং মিথ্যা মিথ্যাই। হযরত আলী (রা) যদি এরূপ না করতেন তাহলে রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনি অবশ্যই সফল হতেন। কিন্তু খিলাফতের পদে তিনি নিসন্দেহে ব্যর্থ হতেম।

---

১. সিফফীন যুদ্ধের সময় হযরত আবু হুরাইরা (রা) হযরত আলীর (রা) সাথে ছিলেন। কিন্তু তিনি আমীর মুয়াবিয়ার (রা) কাছে গিয়ে খাবার খেতেন। আমীর মুয়াবিয়ার (রা) দরবারে অত্যন্ত মূল্যবান খাবার তৈরী করা হতো। একদিন হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আপত্তি করা হলে তিনি বললেন : আলী (রা) সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত তাই তাঁর পক্ষে লড়াই করি। তাঁর পেছনে নামায ভাল হয় তাই সেখানে নামায আদায় করি। আর এখানকার খাদ্য উত্তম ও বৈচিত্রপূর্ণ হয় তাই এখানে এসে খাবার গ্রহণ করি। (তাতহীরুল জিনান) এ প্রসংগে আল ইয়াফেয়ী, ১ম খন্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরাইরার (রা) এই বিখ্যাত উক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে যে : سماط معاوية دسم والصلوة خلف على افضل (আমীমুল ইহসান)

২. মুসকিলার গভর্নর আর্দশীর বায়তুলমাল থেকে ঋণ গ্রহণ করে পাঁচশ দাসদাসী খরিদ করে তাদেরকে মুক্তিদান করেন। হযরত আলী (রা) কঠোরভাবে এই অর্থ দাবী করলে তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ ! এই পরিমাণ অর্থ ছেড়ে দেয়া উসমানের (রা) জন্য কোন ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু এঁকে তো দেখছি প্রতিটি কানাকড়িরও হিসেব নিতে চান। এরপর তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) আশ্রয়ে চলে যান। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী এ কথা শুনে বললেন : আল্লাহ তাঁর অকল্যাণ করুন। সে কাজ করেছে প্রভুর মত, কিন্তু পালিয়ে গিয়েছে ক্রীতদাসের মত এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পাপীদের মত। (তাবারী, পৃষ্ঠা-৩৪৪১)

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আলীর (রা) চাচাত ভাই এবং বসরার গভর্নর ছিলেন। তিনি বায়তুলমাল থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আলী (রা) উক্ত ঋণের অর্থ দাবী করলে তিনি ভীত হয়ে বসরা থেকে মক্কায় চলে যান, যদিও হিসেব চুকিয়ে দেয়ার পর ফিরে আসেন। (তাবারী, পৃষ্ঠা-৩৪৫১) একবার হযরত আলীর (রা) ভাই আকীল (রা) তাঁর কাছে এসে বায়তুলমাল থেকে কিছু অর্থ দাবী করলেন। হযরত আলী (রা) বললেন : থামো । যখন অন্যদেরকে দেব তখন তোমাদেরকেও তাদের সমান দেব। তিনি অনেক অনুরোধ ও কাকুতি মি-নতি করলে হযরত আলী (রা) বললেন : তুমি বরং বাজারে গিয়ে তালা ভেঙে মানুষের মাল চুরি করে নিয়ে যাও, সেটাই ভাল। আকীল (রা) বললেন : আপনি আমাকে চোর বানাতে চাচ্ছেন। হযরত আলী (রা) বললেন : তুমি তো আমাকে মানুষের কাছে চোর বানাতে চাচ্ছো। তুমি চাচ্ছো মুসলমানদের মাল মুসলমানদেরকে না দিয়ে তোমাকে দিয়ে দেই। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে আকীল আমীর মুয়াবিয়ার (রা) কাছে গিয়ে তার প্রয়োজনের কথা বলেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা) তৎক্ষণাৎ বায়তুলমাল থেকে তাকে এক লাখ দিরহাম দিয়ে বললেন-: মিম্বরে উঠে ঘটনাটা একটু বর্ণনা করুন। আকীল মিম্বরে উঠে বললেন : আমি আলীর (রা) কাছে এমন জিনিস চেয়েছিলাম যা তাঁর দীনের ক্ষতি করতো। তাই তিনি তাঁর দীনকেই আঁকড়ে থাকলেন। আমি মুয়াবিয়ার (রা) কাছে একই জিনিস প্রার্থনা করলাম। তিনি তাঁর দীনের চাইতে আমাকে অগ্রাধিকার দিলেন। (তারীখুল খুলাফা)

www.amarboi.org

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ফারুকে আযম হযরত উমর (রা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাইতেন। তাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন সাধন করেননি। গভর্নরদের তত্ত্বাবধান এবং তাদের কর্মপদ্ধতি যাঁচাই বাছাইয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। কোন গভর্নর নিয়োগকালে তাকে ডেকে উপদেশ দিতেন, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসলে অত্যন্ত কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের সময় তাঁর শাসনাধীন এলাকাসমূহে নিম্নোক্ত গভর্নরগণ নিয়োজিত ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বসরায়, উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইয়ামানে, যিয়াদ ইবনে সুমাইয়া ফারেসে, কাতাম ইবনে আব্বাস মক্কায় ও তায়েফে এবং আবু আইয়ুব আনসারী মদীনায়। গভর্নরদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো কা'ব ইবনে মালেককে। প্রজাসাধারণের জন্য হযরত আলী (রা) ছিলেন রহমতের নিদর্শন স্বরূপ। দরিদ্র ও মিসকীনদের জন্য বায়তুলমালের দরজা উন্মুক্ত ছিল। বায়তুলমালে যে অর্থ আমদানী হতো তা ন্যায় ও ইনসাফের সাথে অভাবী ও হকদারদের দিয়ে দেয়া হতো। বায়তুলমালের তত্ত্বাবধান নিজেই পুরোপুরি করতেন। বনাঞ্চলের ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হযরত আলীর (রা) ই আবিষ্কার। এভাবে আরো অনেক ক্ষেত্রে বহু সংস্কার সাধন করেছেন।

শেরে খোদা হযরত আলী (রা) নিজে ছিলেন যোদ্ধা বীরপুরুষ। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেনাবাহিনীতে তিনি সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি দেশের সিরিয়া সংলগ্ন অঞ্চলে সামরিক ছাউনি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ইরানে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ ও সামরিক প্রয়োজনে ফোরাত নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ করেন যা তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মধ্যে অন্যতম।

জাতির নৈতিক ও শারয়ী তত্ত্বাবধানের প্রতি হযরত আলীর অসীম মনযোগ ছিল। এক ব্যক্তি বর্ণনা করছে ঃ আমি দেখলাম হযরত আলী (রা) তালি দেয়া লুঙ্গি পরিধান করে চাদর গায়ে জড়িয়ে কোঁড়া হাতে একাকী বাজারের মধ্যে লোকজনকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং বাজারের তত্ত্বাবধান করছেন।

অপরাধ নির্মূলের জন্য হযরত আলী (রা) তা'যীর হিসেবে অপরাধীদেরকে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলো। ইরান ও আর্মেনিয়ায় কিছু সংখ্যক নও-মুসলিম মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা) তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেছিলেন। তারা পরে তাওবা করে পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে।

www.amarboi.org

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী খারেজী ও সাবায়ীদের মূলোৎপাটন করেন। এটা ছিল ইসলামের বিরাট খেদমত। সমস্ত সাহাবা কিরাম তাঁর এ কাজকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে মনে করেন।

হযরত আলী (রা) নিজে দীনি ইলমের অত্যন্ত উঁচুদরের পন্ডিত, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক ছিলেন। ফলে মুসলিম উম্মাহ তাঁর থেকে দীনি ইলম এবং শরীয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক বেশী উপকৃত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র (ইলমে নাহ্) আবিষ্কার দ্বারা তিনি মুসলমানদের যারপর নাই কল্যাণ সাধন করেছেন।

অভ্যাস, চরিত্র ও মর্যাদা

হযরত আলী মুর্তাজা (রা) আপাদমস্তক দীনদারী ও আমানতদারীর মূর্ত প্রতীক ও আল্লাহর অত্যন্ত ইবাদাতগুজার বান্দা ছিলেন। মাত্র দশ বছর বয়স থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করেন এবং তারপর থেকেই তাকওয়া, পরহেজগারী, ন্যায় ও সত্যের অনুসরণ এবং সত্যবাদিতাই তার স্বভাব ছিল।

মিথ্যা, পার্থিব প্রদর্শনী এবং পৃথিবীর স্বল্পকালীন ভোগবিলাসকে হযরত আলী (রা) সব সময় ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তিনি গোটা জীবন কৃচ্ছ্রতার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। খলিফা থাকাকালেও কৃচ্ছ্রতা ও স্বল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রে পিছপা হননি। প্রথম দুই খলিফার (রা) মতই মোটা পরিধেয় এবং শুকনো খাদ্যকে নিজের জন্য নিয়ামত মনে করেছেন। তাঁর দরজায় পাহারাদার বা দারোয়ান থাকতো না। আমীরানা ঠাটবাট বা জাঁকজমকও ছিল না। খলিফা থাকাকালেও কোন কোন সময় না খেয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু ধৈর্য ধারণ করেছেন।

আর্থিক দিক দিয়ে তিনি কোন সময়ই সচ্ছল ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মন ছিল ধনী। ভুখা থাকতে হলেও তিনি কখনো কোন প্রার্থীকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দেননি। সরলতা ও বিনয় ছিল হযরত আলী (রা)-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট। নিজের হাতে বাড়ীর কাজ করতেন। মেহনত মজদুরীতে তিনি কোন প্রকার লজ্জা বা অপমান বোধ করতেন না। যখনই কেউ তার কাছে কোন বিষয়ে জানার জন্য আসতো তখনি দেখতে পেতো তিনি জুতায় পট্টি লাগাচ্ছেন, উট চরাচ্ছেন কিংবা মাটি কাটছেন। তাঁর মেজাজে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। তাই অনেক সময় শুধু মাটির উপরেই শুয়ে পড়তেন। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত 'আবু তুরাব' উপাধি তাঁর গৌরবের কারণ হয়। খিলাফতের মসনদে সমাসীন থাকাকালেও তাঁর এই সরলতা বিদ্যমান ছিল।

www.amarboi.org

তিনি ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল। বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত হাসিখুশি ও খোশ মেজাজের অধিকারী। তিনি শত্রুদের সাথেও ভাল ব্যবহার করতেন। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ পালনের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের বেলায় তিনি কারো পরোয়া করতেন না।

তিনি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের ভালবাসতেন। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সরলতাপূর্ণ। ছোট আস্তিন বিশিষ্ট জামা এবং পায়ের নলার উপরে তুলে লুঙ্গি পরিধান করতেন। কোন কোন সময় চাদর এবং লুঙ্গিই যথেষ্ট মনে করতেন এবং এই অবস্থায়ই খিলাফতের দায়িত্ব পালনে করতে বেরিয়ে পড়তেন। পাগড়ি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। কাল পাগড়ি এবং কোন কোন সময় সাদা টুপি পরিধান করতেন।

তাসাউফের ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক উর্ধে। বাতেনকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাসাউফের অধিকাংশ ধারাই হযরত আলীর (রা)-এর বক্ষের নূর দ্বারা আলোকিত। হযরত জুনাইদ (র) বাগদাদী বলেন ঃ

উসূল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হযরত আলী (রা) হচ্ছেন আমাদের 'শায়খুশ শুয়ূখ'।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন ঃ হাদীস থেকে হযরত আলীর (রা) যত মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে আর কোন সাহাবীর তা হয়নি।[১]

انَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ اهلَ البَيتَ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيرًا-

"হে রাসূলের আহলে বায়েত, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সবার থেকে অপবিত্রতা ও কলুষ-কালিমা দূর করে তোমাদেরকে উত্তমরূপে পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিতে চান) সূরা আহযাবের এই আয়াত নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়েদা ফাতেমাতুয যাহরা (রা), সাইয়েদেনা হাসান (রা), সাইয়েদেনা হুসাইন (রা) ও সাইয়েদেনা আলী (রা)-কে ডেকে সবাইকে তাঁর কম্বলের নীচে নিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ এরা সবাই আমার আহলে বায়েত। তাদের থেকে কলুষ-কালিমা ও অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং তাদেরকে উত্তমরূপে পাক-সাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও। (তিরমিযী)

---

১. তারীখুল খুলাফা

www.amarboi.org

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়েদেনা হাসান ও সাইয়েদেনা হুসাইন (রা)-এর হাত ধরে বললেন ঃ যে আমাকে, এই দুইজনকে এবং এদের পিতামাতা আলী (রা) ও ফাতেমা যাহরাকে ভালবাসলো কিয়ামতের দিন সে আমার সাথে আমার সমপর্যায়ে থাকবে। (তিরমিযী)

نغمه ال مصطفى جاذب لطوف نوالمنن- باعث حسن
خاتمه جذبه عشق ينجتن-

اللهم صل على سيدنا محمد و على الفه سيدنا محمد و
بارك وسلم -

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের সুকৃতি প্রচার মহান আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহ লাভের কারণ এবং পাঞ্জাতনের (নবী (সা), ফাতেমা, আলী, হাসান ও হুসাইন (রা) প্রতি ভালবাসা হুসনে খাতেমার (উত্তম মৃত্যু) কারণ। হে আল্লাহ, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর বংশধর ও অনুসারীদের ওপর রহমত বরকত ও শান্তি নাযিল কর।"

www.amarboi.org

খিলাফতে[১] রাশেদার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যেসব বিপ্লব হয়েছে এবং সরকার পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার একটা সামগ্রিক চিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বাহ্নেই বলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ

ان هـذا الامـر بـدأ رحـمـة ونـبـوة ثـم يـكـون رحـمـة و خـلافـة ثـم كـان مـلـكـا عـضـوضـاً ثـم كـائـن عـتـوا جـبـريـة و فـسـاداً فـى الارَض يـسـتـحـلـون سـتـحـلـون الـخـمـر والـحـريـر والـفـروج ويـرزقـون عـلـى ذلـك ويـنـصـرون جـتـى يـلـقـوا ربـهـم [২]

---

১. খিলাফতে রাশেদার সরকার পদ্ধতি ঃ খিলাফতে রাশেদার সরকার পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন খলিফা নিজে। হুকুমতে ইলাহিয়ার সরকার প্রধান হিসেবে তিনি ছিলেন কিতাব ও সুন্নাতের মুখপাত্র ও তার বাস্তবায়নকারী। এই মর্যাদা নিয়ে তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তারা সবাই ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সদস্য। তাঁদের ও অন্য সব মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রথম খলিফা নির্বাচিত হওয়া মাত্রই নিম্নোক্ত ভাষায় খিলাফতের সীমারেখা বর্ণনা করেছিলেন ঃ

"হে জনগণ, আমি শরীয়াতের বিধি-বিধান মেনে চলবো, নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা আবিষ্কার করবো না। অতএব যখন আমি সঠিক পথে চলবো তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। আর আমি যদি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হই তাহলে আমাকে সংশোধন করে দেবে।"

বর্তমান বিশ্বের সরকার সমূহ দুই ধরনের। একটি হচ্ছে ব্যক্তি শাসন বা রাজতন্ত্র। এতে সরকারের সব রকম সম্পর্ক থাকে রাজার ব্যক্তি সত্তার সাথে। তাঁর মুখের কথাই আইন। তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। অপরটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় আইন রচনার এখতিয়ারসমূহ থাকে জনগণের হাতে। জনগণের নির্বাচিত আইন পরিষদ আইন রচনা করে এবং জনগণের রায়েই সরকার নির্বাচিত হন। এই সরকার প্রধান তার উপদেষ্টাদের সহযোগিতায় দেশের শাসন পরিচালনা ও আইন শৃঙ্খলা বিধান করে। তার সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু খিলাফতে রাশেদা বা হুকুমতে ইলাহিয়ায় সরকারের সম্পর্ক থাকে শুধু আল্লাহর সাথে। তাঁর নাযিলকৃত শরীয়াতই হচ্ছে আইন যা পূর্বেই রচিত ও বিন্যস্ত। খলিফা এ আইন বাস্তবায়নকারী মাত্র। আল্লাহর আইনে সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধনের অধিকার খলিফা বা জনগণের নেই। আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খলিফা যদি উপযুক্ত ভূমিকা পালন না করেন তাহলে উম্মাহর প্রতিটি সদস্য তাকে প্রকাশ্যে বাধা দিতে পারে। খলিফা এবং জনগণ উভয়কেই আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। (অঃ পৃঃ দ্রঃ)

www.amarboi.org

ইসলামের সূচনা হয়েছে রহমত ও নবুওয়াতের মাধ্যমে। অতপর তা হবে রহমত ও খিলাফত। অতপর হবে জালেম সরকার। তারপর আসবে বিদ্রোহ, স্বৈরাচারিতা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সরকার যখন মুসলমান বাদশাহরা রেশম ও শরাবকে হালাল করে নেবে, যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হবে, সেজন্য তারা অবকাশও লাভ করবে এবং এ অবস্থায়ই তারা তাদের রবের সাথে মিলিত হবে (মৃত্যু বরণ করবে)। (বায়হাকী)

খিলাফতে রাশেদায় কারো পারিবারিক অধিকার বা উত্তরাধিকার ছিল না। কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়ার শর্ত ছিল বটে, কিন্তু বাস্তবের আলোকে তা ছিল ভেবে দেখার মত। চারজন খলিফাই অবশ্য কুরাইশ গোত্রীয় হলেও তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন পরিবারের লোক। খিলাফত লাভের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমী ও আমলী পূর্ণতার উত্তরাধিকারিত্ব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পরে আহলে বায়েতের কেউ-ই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হননি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর ছেলেকে স্থলাভিষিক্ত করেননি। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হযরত উমর (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করে যাননি। বরং তাঁর খিলাফত লাভের অধিকারকে চিরদিনের জন্য নস্যাত করেছেন এই বলে যে, এই দায়িত্বের জবাবদিহির বোঝা বৃদ্ধির জন্য খাত্তাব পরিবারের এক ব্যক্তিই যথেষ্ট। হযরত উসমান ও (রা) কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেননি। ইমাম হাসান (রা) সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বিষয়টি উম্মাহর মতামতের ওপর ছেড়ে দেন।

শরীয়তের আইন সঠিকভাবে বুঝার ও তা বাস্তবায়নে খলিফা রাশেদদের সাহায্য করার জন্য একটি মজলিসে শুরা থাকতো। প্রয়োজনে কেন্দ্রের মুসলিম জনসাধারণের মতামতও গ্রহণ করা হতো। সংশ্লিষ্ট এলাকার নেতৃবৃন্দ, জ্ঞানীগুণী এবং গভর্নরদের পরামর্শও নেয়া হতো। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল খলিফার হাতে।

খুলাফায়ে রাশেদীনদের জীবনে শাহী ঠাটবাটের কোন দখল ছিল না। তাঁদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং সাজ-সরঞ্জাম ছিল একান্ত সাদামাটা। তাদের দরবারে দারোয়ান বা রক্ষী কিছুই ছিল না। উম্মতের একজন সাধারণ মানুষের মতই ছিল তাদের জীবন যাপন প্রণালী। তাঁদের দরবারে আমীর ও গরীব সমান মর্যাদা লাভ করতো। তবে ইলম ও তাকওয়ার মর্যাদা অবশ্যই ছিল। তাদের দৃষ্টিতে আদর্শিক ও রাষ্ট্রীয় খেদমত ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অতি মামুলি কাজও তারা নিজে করতেন।

খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেদেরকে জনগণের সেবা পাওয়ার যোগ্য মনে করতেন না। বরং সেবক মনে করতেন। তাঁরা সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন থাকার চেষ্টা করতেন। রাজধানীতে নিজেরাই নামাযের জামায়াতে ইমামতি করতেন এবং হজ্জের ইমারতের দায়িত্ব পালন করতেন। এভাবে তাঁরা সাধারণ মুসলমানদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেতেন এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন ও অভিযোগ তাদের কাছে তুলে ধরতে পারতো। সাধারণভাবে এ ঘোষণা দেয়া ছিল যে, কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যেকোন ব্যক্তিই তার অভিযোগ হজ্জের সময় এসে যেন বর্ণনা করে। গভর্নরদের প্রতিও নির্দেশ ছিল তারা যেন হজ্জের সময় এসে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দান করেন। (অঃ পৃঃ দ্রঃ)

www.amarboi.org

নিম্নোক্ত হাদীসটিতে রহমত ও খিলাফতের উত্থান পতন সম্পর্কে পাঠ করুন ঃ

عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ قَالَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنِّى رَأَيْتُ دَلْوًا اُدْلِىَ مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ رضـ فَاَخَذَ بِعَرَا قَيْهَا فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيْفًا ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رضـ فَاَخَذَ بِعَرَا قَيْهَا فَشَرِبَ حَتّٰى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رضـ فَاَخَذَ بِعَرْ قَيْهَا فَشَرِبَ حَتّٰى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عَلِىٌّ رضـ فَاَخَذَ بِعَرِ قَيْهَا فَانْتَشَطَتْ وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْئٌ ٢

"সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আসমান থেকে একটি বালতি নামিয়ে দেয়া হয়েছে। আবু বকর (রা) এসে তার রশি বাঁধা দন্ডের দুই দিক ধরে তা থেকে দুর্বলভাবে পান করলেন। তারপর উমর (রা) এসে তার রশি বাঁধা দন্ডের দুই প্রান্ত ধরে তা থেকে এতটা পান করলেন যে, তাঁর দুই পাজর স্ফীত হয়ে উঠলো। তাঁর পরে উসমান (রা) আসলেন। তিনিও দন্ড ধরে এতটা পান করলেন যে, তাঁর দুই পাঁজর স্ফীত হয়ে উঠলো। অতপর আলী (রা) আসলেন। তিনি দন্ড ধরলে বালতিটা কাত হলো এবং কিছু পানি ছিটকে তার গায়ে পড়লো।"

খলিফা রাশেদগণ বায়তুলমালকে গোটা জাতির মালিকানা মনে করতেন। জাতির সমস্ত সদস্য যেন তা দ্বারা উপকৃত হয় সেটাই ছিল তাদের লক্ষ্য। নির্দিষ্ট ভাতা ছাড়া নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আরাম-আয়েশের জন্য তাঁরা বায়তুলমাল থেকে কানাকড়িও গ্রহণ করতেন না। হযরত উসমান (রা) পরিবারের জন্য দূরের কথা নিজের জন্যও একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি। বায়তুলমালের ব্যাপারে গভর্নরদেরকে কঠোর তত্ত্বাবধানে রাখা হতো এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো। খলিফা রাশেদগণ খলিফা হিসেবে যেসব দায়িত্ব পালন করতেন তার মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল জনসাধারণের শরীয়তসম্মত তত্ত্বাবধান, শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তিসমূহ কার্যকরী করণ, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অর্থ-সম্পদের তত্ত্বাবধান ও তার সঠিক বিলি-বন্টন, সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধান, প্রতিরক্ষা ও জিহাদের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণ সাধনকে তাঁরা নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। অভাবীদের সাহায্য করা, দুর্বলদের সেবা, ইয়াতীম ও বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা, রুগ্নদের সেবা এবং মুসাফিরদের রক্ষণাবেক্ষণ ছিল তাঁদের প্রিয় কাজ। (আমীমুল ইহসান)

২. আবু দাউদ।

www.amarboi.org

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবু মূসা আশআরী বলেন ঃ

ثم استفتح رجل فقال لى افتح له و بشره بالجنة على بلوى تصيبه فاذا عثمان رض فاخبرته بما قال فحمد الله ثم قال الله المستعان -

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরে আরীসে বসে ছিলেন। আমি বাইরে দ্বাররক্ষীর কাজ করছিলাম। ইতিমধ্যেই হযরত আবু বকর (রা) ও উমর (রা) এসেছিলেন। অতপর এক ব্যক্তি এসে অনুমতি প্রার্থনা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ দরজা খুলে দাও এবং একটি বড় পরীক্ষার বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। বাইরে গিয়ে দেখলাম হযরত উসমান (রা) অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁকে নবী (সা)-এর কথা জানালে তিনি বললেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ। তারপর বললেন ঃ আল্লাহুল মুসতা'আন।"

প্রসিদ্ধ মতানুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে ইনতিকাল করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি খলিফা হওয়া মাত্র অধিকাংশ আরব মুরতাদ হয়ে যায় এবং বিদ্রোহ শুরু হয়। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর দৃঢ় সংকল্প এবং মুহাজির ও আনসারদের ঈমানী শক্তি এ অবস্থায়ও অত্যন্ত সফলভাবে ইসলামের স্তম্ভকে কায়েম রাখেন। এ সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি ইরানী ও রোমান সাম্রাজ্যের মোকাবেলার জন্য ইরাক ও সিরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এ অভিযানের চূড়ান্ত ফায়সালা আসার আগেই ১৩ হিজরীর ২১শে জমাদিউস সানী তিনি ইনতিকাল করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর পরে ফারূকে আযম হযরত উমর (রা) খলিফা হন। তাঁর দ্বারা এই বিজয় সম্পন্ন হয় এবং মুসলমানগণ পূর্বদিকে অধিকাংশ ইরানী শহর দখল করে জায়হুন নদী (আমুদরিয়া) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। উত্তর দিকে তারা সিরিয়া এবং আর্মেনিয়া অঞ্চল দখল করে এবং পশ্চিমে মিসর অধিকারে আনে। তাঁর সময়েই কুফা, বসরা ও ফুসতাতের মত বড় বড় ইসলামী শহরের পত্তন হয় এবং বহু সংখ্যক সাহাবা কিরাম (রা) সহ বিপুল সংখ্যক মুসলিম সেসব স্থানে বসতি স্থাপন করেন। আরবরা ছাড়া আরো অনেক জাতি দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।

২৩ হিজরীর ২৭শে যিলহাজ্জ আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক (রা) ইরানী বংশোদ্ভূত এক ক্রীতদাসের হাতে শাহাদাত লাভ করেন।

www.amarboi.org

ফারুকে আযম হযরত উমর (রা)-এর পর হযরত উসমান (রা)-কে খলিফা নির্বাচিত করা হয়। তার শাসনযুগেও ইসলামী বিজয়সমূহ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা (পশ্চিম তারাবেলস প্রভৃতি) দখল করে মুসলমানগণ স্পেনের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছে। পূর্বে কুহকাফ (ককেসাস) ও দক্ষিণে কাবুল পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হয়। নৌপথেও মুসলমানগণ বহু বিজয় অর্জন করেন। বিজয়ের এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকাবস্থায় কতিপয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর ষড়যন্ত্রে তাঁর বিরুদ্ধে একটি গোলযোগ সৃষ্টি হয় যার ফলে মিসর ও ইরাক থেকে কতিপয় দল মদীনায় আগমন করে গোলযোগ শুরু করে। এই গোলযোগের মধ্যেই ৩৫ হিজরীর ১৮ই যিলহাজ্জ তারিখে আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা)-কে শহীদ করা হয়।

হযরত উসমান (রা)-এর পরে সাইয়েদেনা আলী (রা)-এর হাতে খিলাফতের বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় মুসলমানগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দল ছিল হযরত আলীর (রা)-এর সহযোগী। তাদের কেন্দ্র ছিল কুফা। অন্য দলটি ছিল হযরত আলীর (রা)-এর বিরোধী। তারা হযরত উসমানের রক্তের দাবী করতে থাকে। আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে তাদের কেন্দ্র হয় সিরিয়া। এই সময়েই উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা), হযরত যুবায়ের (রা) ও হযরত তালহা (রা)-এর নেতৃত্বে অপর একটি দল হযরত উসমানের (রা)-এর কিসাস দাবী করে বসে। ফলে 'জামাল যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে দশ হাজার মুসলমান নিহত হয়। আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) বিজয় লাভ করেন। কিন্তু এর পরপরই সিফ্ফীনের মরুভূমিতে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর সৈন্যবাহিনীর সাথে এক প্রচন্ড যুদ্ধ হয় এবং ইসলামী দুনিয়ার বিশিষ্ট মুসলমানগণ দুই পক্ষ থেকে মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে সত্তর হাজার মুসলমান নিহত হয়। কিন্তু এই প্রচন্ড যুদ্ধ কোন পক্ষের জন্যই সিদ্ধান্তকারী ফলাফল বয়ে আনে না। সিরীয়রা আল্লাহর কিতাবকে ফায়সালাকারী বানায়। অধিকাংশ ইরাকীই তা মেনে নেয়। কিন্তু এই সালিশী আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর সহযোগীদের শক্তি এবং আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)-এর সহযোগীদের দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তাঁর নিজের সেনাবাহিনীর মধ্যেই এমন লোক সৃষ্টি হয়ে যায় যারা সালিশীর ব্যাপারে আপত্তি উথাপন করে এবং যারা তা মেনে নিয়েছিলো তাদের সমালোচনা ও অভিযুক্ত করতে থাকে। সেনাবাহিনীর এই অংশই খারেজী নামে আখ্যায়িত হয়। ফল দাঁড়ায় এই যে, তার এই সালিশীর মাধ্যমে যারা শক্তি বৃদ্ধি করে নিয়েছিলো সেই প্রতিপক্ষকে বাদ দিয়ে হযরত আলী (রা)-কে নিজের বিদ্রোহী

www.amarboi.org

সেনাদল অর্থাৎ খারেজীদের বিরুদ্ধে তৎপর হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৪০ হিজরীর ১৭ই রমযান তাদের মধ্যে থেকে এক খারেজী অকস্মাত আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)-কে শহীদ করে। তাঁর শাহাদাতের সাথে সাথে খিলাফতের বরকত এবং রহমত তিরোহিত হয়।

খলিফায়ে রাশেদগণ ছিলেন খিলাফতের সুসংবাদ সম্পর্কিত আয়াতে উক্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ। আল্লাহর বাণী مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ আয়াতটি মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইংগিত বিদ্যমান ছিল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সময়ে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়। لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ আয়াতটির সম্পর্ক ইসলামী বিজয়সমূহের সাথে। এই সুসংবাদ হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সময় পূরণ হয়েছে। اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ আয়াতাংশটি কুরআনের সংকলন ও একত্রীকরণের প্রতি ইংগিত প্রদান করে। যদিও এর সূচনা হয়েছিল হযরত আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সময়েই কিন্তু তা পূর্ণতা লাভ করে হযরত উসমানের (রা)-এর সময়ে। খারেজীদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হচ্ছে لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ (আমি যদি তাদেরকে পাই তাহলে আদ কওমের মত তাদেরকে হত্যা করবো।[১]) হযরত আলীর সময়েই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছে। হযরত আলী (রা)-এর খিলফতকাল ছিল وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন।

খিলাফতে রাশেদার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা এবং তাদের নির্বাচন পদ্ধতি, কর্মজীবন ও কৃতিত্ব দেখার পর নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই চার খলিফার শাসন যুগের অবসানের সাথে সাথেই "খিলাফতে রাশেদা বা খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত" (নবুওয়াতের পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত)-এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

খিলাফতে রাশেদার পরিসমাপ্তির পর اَلْخِلَافَةُ مِنْ بَعْدِى ثَلَاثُوْنَ سَنَةً (আমার পর খিলাফত ব্যবস্থা ত্রিশ বছর থাকবে)[২] হাদীসটির মর্মবাণী অনুসারে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্ণ হয় এবং ৪১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ৯

---

১. (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)।
২. নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা। ফাতহুল বারী ১৩ খন্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ইবনে হিব্বান প্রমুখ এ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। (আমীমুল ইহসান)

www.amarboi.org

তারিখে খিলাফত বনী উমাইয়াদের হাতে এসে নিছক শাসন ও রাজতন্ত্রে[১] রূপান্তরিত হয়। উমাইয়াদের ভীতি ও সন্ত্রাসে আরব উপদ্বীপ তথা গোটা ইসলামী বিশ্ব প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছেন ঃ

تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها ثم تكون ملكا عاضا -

"নবুওয়াত তোমাদের মধ্যে ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তা চাইবেন। তারপর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের মাধ্যমে) আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। অতপর যতদিন আল্লাহ চাইবেন নবুওয়াতের পদ্ধতির খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পরে তাও উঠিয়ে নেবেন। এরপর স্বৈরাচারী ও জালেম শাসন কায়েম হবে।"

এরপরেও কোন এক সময় নবুওয়াতের পদ্ধতির খিলাফত কায়েম হওয়ার ভবিষ্যতদ্বাণী[২] এ হাদীসে আছে। বলা হয়ে থাকে যে, এ ভবিষ্যতদ্বাণী পূরণ হয়েছে। যাই হোক, আল্লাহর ইচ্ছা হলে এ ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

---

১. আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয় ৪০ হিজরীর রমযান মাসে। ত্রিশ বছর পূর্ণ হতে তখনো ছয় মাস বাকি ছিল। এই সময় ইরাকীরা ইমাম হাসানের (রা) হাতে খিলাফতের বাইয়াত করে। কিন্তু তিনি নিজে পরিস্থিতির প্রতিকূলতা অবলোকন করে এই পদমর্যাদা পরিত্যাগ করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা খিলাফতের রাশেদার মেয়াদ পূরণ করার জন্য তাঁকে ছয় মাস পর্যন্ত খিলাফতের মসনদে সমাসীন রাখেন। ওদিকে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-ও ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে ইরাকের ওপর আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করেছিলেন। ইমাম হাসান (রা) কতিপয় শর্তে রবিউল আউয়াল মাসে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধির ভিত্তিতে খিলাফতের দাবী পরিত্যাগ করে ইসলামী সালতানাতের শাসন ক্ষমতা আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর হাতে ছেড়ে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম হাসানের (রা) প্রতি ইংগিত করে বলেছিলেন ঃ

"আমার বেটা সাইয়েদ। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা তাকে মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মধ্যে আপোষের মাধ্যম বানাবেন।"

২. বরং প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের ওপর শরীয়াত অর্পিত দায়িত্ব হলো, সে নবুওয়াতের পদ্ধতির খিলাফত কায়েমের জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। খিলাফতের পদমর্যাদা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের অন্যতম। এ কারণেই হযরত হুসাইন (রা)-এর মত মহান ব্যক্তিবর্গ ইয়াযীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর প্রশ্ন থাকে শুধু সফলতা ও ব্যর্থতার যা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। এ ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই। সৃষ্টিগত ও অর্পিত দায়িত্ব দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পর্ক সৃষ্টিগত বিষয়ের সাথে। ঐতিহাসিকের কাজ শুধু সেসব বিষয় বর্ণনা করা যা সংঘটিত হয়ে গেছে। ওয়াল্লাহু আলামু। (আমীমুল ইহসান)

www.amarboi.org

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা (রা)

এই গ্রন্থে সাহাবীদের ঝগড়া বিবাদ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। তাই শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যাবশ্যক।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা হওয়া অতীব মর্যাদাপূর্ণ ব্যাপার। এই উম্মতের মধ্যে রাসূল (সা)-এর সাহাবার মর্যাদা সর্বাধিক। যারা ঈমানের সাথে এক মুহূর্তের জন্যও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভে সৌভাগ্যবান হয়েছেন এবং ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন উম্মতের মধ্যে অন্য কেউ-ই তাদের সমকক্ষ হতে পারে না।

২. সাহাবা কিরামের সংখ্যা ছিল বদর যুদ্ধে ৩১৩জন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ১৪০০ জন, মক্কা বিজয়ের সময় ১০ হাজার, হুনায়েন যুদ্ধের সময় ১২ হাজার, তাবুক যুদ্ধের সময় চল্লিশ হাজার, বিদায় হজ্জের সময় সত্তর হাজার এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের সময় এক লাখ চব্বিশ হাজার। যেসব সাহাবার (রা) মাধ্যমে হাদীসগ্রন্থসমূহে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাঁদের সংখ্যা সাড়ে সাত হাজার।

৩. সাহাবা কিরামের (রা) ঝগড়া-বিবাদসমূহকে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বর্ণনা করা ঠিক নয়। প্রয়োজন দেখা দিলে সৎনিয়তে আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্ণনা করতে হবে। যেসব সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য হয়েছে তাদের উভয় পক্ষের প্রতিই আমাদের ভাল ধারণা পোষণ করা এবং উভয়ের প্রতি আদব রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য।

আমীরুল মু'মিনীন সাইয়েদেনা হযরত আলী (রা)কে তার খিলাফতকালে দু'টি গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমে জামাল যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতে একদিকে ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) এবং অপরপক্ষে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) এবং আশারায়ে মুবাশ্শারার দুই সদস্য হযরত যুবায়ের (রা) ও হযরত তালহা (রা)। কতিপয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর ধোঁকাবাজি ও ষড়যন্ত্রের ফলে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অন্যথায় তাদের মধ্যে কোন প্রকার শত্রুতা ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ (রা) সম্পর্কে তো এ মর্মে পবিত্র

www.amarboi.org

কুরআনের আয়াতই রয়েছে যে, তাঁরা সব মুসলমানের মা। মহান আল্লাহর বাণী হচ্ছে, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ (রা) ছিলেন رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ। মুহাজির ও আনসারদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গিয়েছো।) তাই জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পক্ষদ্বয় কর্তৃক পরস্পরের মর্যাদা ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধটি সংঘটিত হয় সিফ্‌ফীনে। এ যুদ্ধে একদিকে ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন সাইয়েদেনা হযরত আলী (রা) এবং অপরপক্ষে ছিলেন আমীর মুয়াবিয়া (রা) ও আমর ইবনুল আস (রা)। এ যুদ্ধ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সিদ্ধান্ত হলো, প্রকৃতপক্ষে হযরত আলীই (রা) আইনত খলিফা ছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা) ও তাঁর পক্ষ সমর্থনকারীরা ছিলেন বিদ্রোহী ও বিভ্রান্ত।[১] কিন্তু এই বিভ্রান্তির কারণে তাদের মন্দ বলা মোটেই জায়েয নয়। কেননা, তারাও রাসূলের (সা) সাহাবা এবং মর্যাদার অধিকারী। তাদের এই বিভ্রান্তি ছিল ভুল বুঝাবুঝির ফল। ভুল বুঝাবুঝির কারণও ছিল। এ প্রকৃতির ভুলকে ইজতিহাদী ভুল বলা হয় যার জন্য শরয়ী বা বুদ্ধি-বিবেচনার দিক দিয়ে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

সাহাবায়ে কিরাম বিশেষ করে মুহাজির ও আনসারদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা, তাদেরকে বা তাদের মধ্যে থেকে কাউকে মন্দ বলা শরীয়াতের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহের শামিল। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য এবং তাদেরকে ভালবাসাই হচ্ছে ঈমানের প্রমাণ। কেননা, তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বায়েতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। নবী (সা) বলেন ঃ

এক ঃ আল্লাহকে ভালবাস। কারণ, তিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমাকে ভালবাস, কারণ আমি আল্লাহর প্রিয়ভাজন। আর আমার প্রতি ভালবাসার

---

১. দেখুন, হিদায়া, কিতবু আদাবিল কাজী, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-১১৭ ও শারহে আকায়েদে নাসাফী প্রভৃতি গ্রন্থ। ভুল-ত্রুটি এমনকি ইচ্ছাকৃত গোনাহও নবী (সা)-এর বাণী الصحابة كلهم عدول। (সাহাবীরা সবাই ন্যায়পরায়ণ)-এর পরিপন্থী নয়। এই বাণী হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেখুন, মুজমুয়ায়ে ফাতাওয়া, মাওলানা আবদুল হাই এবং জুরজানীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ যুফরুর আমানী প্রভৃতি গ্রন্থ। (আমীমুল ইহস ')

www.amarboi.org

কারণে আমার আহলে বায়েতকে ভালবাস, কারণ তারা আমার আত্মীয় ও প্রিয়জন। (তিরমিযী)

দুই ঃ কিয়ামতের দিন শুধু আমার আত্মীয়তা ও নৈকট্য ছাড়া সব পার্থিব আত্মীয়তা ও নৈকট্য ছিন্ন হয়ে যাবে। (তাবারানী)

৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (ক) আল্লাহ আবু বকর (রা)-এর প্রতি রহমত নাযিল করুন। সে আমার সাথে তার কন্যাকে বিয়ে দিয়েছে, দারুল হিজরত মদীনায় যাওয়ার জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থা করেছে, হেরা গিরিগুহায় আমার সাথে থেকেছে এবং আমার জন্য নিজের অর্থ দিয়ে বেলাল (রা)-কে খরিদ করে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ রহমত নাযিল করুন উমর (রা)-এর ওপর কারো অসন্তুষ্টির কারণ হলেও সে হক কথা বলে থাকে। সত্যকথন তাকে এমন বানিয়ে দিয়েছে যে, তার কোন স্বার্থপর বন্ধু নেই। আল্লাহর রহমত নাযিল হোক উসমানের (রা)-এর ওপর, তার লজ্জাশীলতা দেখে ফেরেশতারাও লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে। আল্লাহর রহমত নেমে আসুক আলী (রা)-এর ওপর। হে আল্লাহ, আলী (রা) যেদিকেই যাবে ন্যায় ও সত্যকে সেদিকে চালিত করো। (তিরমিযী)

(খ) একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, যুবায়ের ও তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে সাথে নিয়ে হেরা পবর্তে আরোহণ করলে তা কেঁপে উঠলো। নবী (সা) বললেন ঃ থেমে যাও, তোমার ওপরে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণ আরোহণ করেছেন। (মুসলিম)

(গ) আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো........আল্লাহকে ভয় করো। আমার পরে তাদেরকে তিরস্কার ও সমালোচনার লক্ষ বানাবে না। যে তাদেরকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসে। যে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে আমার সাথেই শত্রুতা পোষণ করে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দেয়। আর যে আমাকে কষ্ট দেয় তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। (তিরমিযী)

হে জনগণ, আমি মানুষ। হয়তো অচিরেই আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবো। আমি তোমাদের কাছে দু'টি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটি আল্লাহর কিতাব—যার মধ্যে আছে হিদায়াত ও নূর—একে আঁকড়ে ধরো এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করো। আরেকটি মূল্যবান জিনিস হচ্ছে, আমার আহলে বায়েত। আহলে বায়েত সম্পর্কে তোমাদের আল্লাহর শপথ দিচ্ছি, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো ও আদব রক্ষা করো এবং তাদেরকে ভালবাস। (সহীহ মুসলিম)

اللهم صلی علی محمد صاحب الخلق العظيم و الاحسان
العميم و على اله واصحابه و اتباعة اجمعين -

www.amarboi.org

বনী উমাইয়া

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বপুরুষদের মধ্যে উর্ধতন পঞ্চম পূর্বপুরুষ ছিলেন আবদে মানাফ। তাঁর ছয়টি পুত্র সন্তানের মধ্যে হাশেম, মুত্তালিব ও আবদুশ শামস ছিলেন সহোদর ভাই। হাশেমের সন্তানদের হাশেমী এবং মুত্তালিবের সন্তানদের মুত্তালিবী বলে আখ্যায়িত করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন হাশেমী। জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগে মুত্তালেবী ও হাশেমীরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ছিল।[১] আবদুশ শামসের সন্তানরা আবশামী বলে আখ্যায়িত হয়। আবদুশ শামসের এক পুত্রের নাম ছিল উমাইয়া তার সন্তানরাই উমাইয়া বা বনী উমাইয়া বলে পরিচিতি লাভ করে।

হাশেম তার বদান্যতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য কুরাইশদের নেতা হিসেবে বরিত হন। কিন্তু তার ভাতিজা উমাইয়া তার নেতৃত্ব মেনে নেয় না। ফলে তাদের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে জাহেলী যুগে হাশেমী ও উমাইয়াদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ইসলামের সূচনা পর্বেও কতিপয় পবিত্রাত্মা ছাড়া বনী উমাইয়াদের আর সবাই ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। বদর যুদ্ধের পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত মক্কাবাসীদের সংগে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে উমাইয়া বংশের আবু সুফিয়ান তার নেতৃত্ব দেন। কারণ, তিনি ইসলামের সমৃদ্ধিকে হাশেমীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি বলে মনে করতেন। মক্কা বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তার কারণে এই বংশগত শত্রুতা তিরোহিত হয়। কিন্তু খলিফায়ে রাশেদ হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর হাশেমী বংশোদ্ভূত খলিফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের প্রতি উমাইয়াদের সেই পূর্বতন ঘৃণা-বিদ্বেষ পুনরায় জাগ্রত হয়ে ওঠে যা হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের পরিসমাপ্তির পর ৪১ হিজরীতে উমাইয়া শাসনের ভিত্তি রচনা করে। পরবর্তী সময়ে ১৩২ হিজরীতে এই একই শত্রুতা হাশেমী বংশোদ্ভূত আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠার কারণ হিসেবে কাজ করে।

ইসলামের ইতিহাসে বনী উমাইয়া বংশের তিনজন ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ঃ

---

১. আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬০, ইবনে মাজা, পৃষ্ঠা–২১২।

www.amarboi.org

(১) হযরত উসমান (রা) ইবনে আফফান ইবনুল আস ইবনে উমাইয়া। তিনি ছিলেন তৃতীয় খলিফায়ে রাশেদ। (২) বনী উমাইয়া শাসনের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মুয়াবিয়া ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া—যদিও তৃতীয় প্রজন্মেই মুয়াবিয়া বংশের শাসনের অবসান ঘটে। (৩) মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া। মুয়াবিয়া বংশের শাসনের পরিসমাপ্তির পর মারওয়ান বংশের শাসন কায়েম হয়। গোটা ইসলামী জগত ১৩২ হিজরী পর্যন্ত এই খান্দানের শাসনাধীন ছিল। এরপর স্পেনেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাদের শাসন কায়েম ছিল।

www.amarboi.org

বনী উমাইয়া শাসন

খিলাফতের রাশেদার ত্রিশসালা শাসনকাল ছিল হুকুমতে ইলাহিয়ার সত্যিকার রূপ যখন কিতাব ও সুন্নাহ্ অনুসারে পরিচালিত সরকার ছিল গণতান্ত্রিক। এই কল্যাণকর যুগের পরিসমাপ্তির পর ৪১ হিজরীতে সরকারী ক্ষমতা বনী উমাইয়াদের হাতে চলে যায়। আমীর মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ক্ষমতাসীন ব্যক্তি। সেই সময় থেকেই খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। নবুওয়াতের আদর্শের খিলাফত পরিবর্তিত হয়ে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে ব্যক্তি শাসনে রূপ নেয়। এই সময় থেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সামনে ধর্মীয় নীতিমালা ও বিধি-বিধানকে গৌণ ও পরোক্ষ মর্যাদা দেয়া হয় এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আদর্শ যাই হোক না কেন সমকালীন সরকারের আনুগত্য ফরয, জনগণের মধ্যে এই মতবাদ চালু করার চেষ্টা করা হয়।

সিরিয়ার এলাকা ইতিপূর্বে সাসানীয় ও বাইজান্টাইন শাসনাধীন ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা কাইজার ও কিসরার শাসন রীতিনীতিতে অভ্যস্ত ছিল। এ কারণে সিরিয়া কাইজার ও কিসরার ব্যক্তি শাসন পদ্ধতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। আমীর মুয়াবিয়া (রা) কাইজার ও কিসরার[১] রাজদরবারের মত জাঁকজমক শুরু করেন। তাদের নীতি অনুসরণ করেই তিনি দারোয়ান ও দেহরক্ষী প্রভৃতি নিয়োগ করেন। যিয়াদের মত অত্যাচারী ও খুনী গভর্ণরকে সব রকমের জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত করে ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় যেন যে ক্ষেত্রে রাজকীয় দান-দক্ষিণায় কাজ হবে না সেক্ষেত্রে তীক্ষ্ণধার তরবারি মানুষকে অনুগত বানাতে পারে।

পনের বছর পরে বাইজান্টাইন ও কিসরার রীতির অনুসরণে আমীর মুয়াবিয়া (রা) তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াযীদের মত অযোগ্য ও অবিবেচক ব্যক্তির অভিষেক অনুষ্ঠান করেন। এ বিদ'আতের জন্য তিনি সব রকম কৌশল ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেন। যেখানে উপহার-উপঢৌকন ও দান

---

১. তারীখুল খুলাফা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

كان معاوية رضـ رجلا طولا ابيض جميلا مهيبا وكان عمر ينظر اليه

فيقول هذا كسرى العرب - (عميم الاحسان)

"আমীর মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন দীর্ঘ দেহী, ফর্সা, সুদর্শন ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। হযরত উমর (রা) তাকে দেখে বলতেন ঃ এ হচ্ছে আরবের কিসরা।" (আমীমুল ইহসান)

www.amarboi.org

দক্ষিণায় কাজ হয়নি সেখানে জুলুম-নির্যাতনের পথ বেছে নেয়া হয়েছে। মোটকথা যেভাবে শক্তি প্রয়োগ করে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ব করা হয়েছিলো ঠিক সেভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই ইয়াযীদের উত্তরাধিকারিত্বের বাইয়াত গ্রহণ করা হয়—যার অর্থ হলো যোগ্যতা থাক বা না থাক এখন শাসন-ক্ষমতা লাভের অধিকারী সেই হবে যে তা শক্তির মাধ্যমে অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া এই শাসন ক্ষমতা এখন এমন এক শাহীতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে ব্যক্তি স্বার্থের জন্য সব রকমের জুলুম-নির্যাতন বৈধ এবং নিজের কল্যাণের জন্য জাতীয় কোষাগার ব্যক্তিগত অর্থ ভান্ডারে রূপান্তরিত হয়েছে।

মোটকথা ইয়াযীদের উত্তরাধিকারিত্বের বাইয়াত গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আশার শেষ ক্ষীণ রশ্মিটুকুও তিরোহিত হয় এবং ব্যক্তি শাসনের ভিত্তি দৃঢ় ও সুগম হয়ে যায়। অথচ সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবেয়ীদের (রা) মধ্যে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের মত যোগ্য লোক তখনও বর্তমান ছিলেন। তাই আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইচ্ছা করলে হযরত উমর ফারুকের (রা) মত কতিপয় ব্যক্তি অথবা হযরত আবু বকরের মত এক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তার অনুকূলে খিলাফতের অসীয়ত করে যেতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে ইয়াযীদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণের ফলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এবং খিলাফত শাহীতন্ত্রে রূপান্তিরিত হয়ে একটি খান্দানের সম্পত্তিতে পরিণত হয় তা অবশ্যই হতো না। এসব পরিস্থিতি সত্ত্বেও গোটা উমাইয়া শাসনকালে খলিফা বা আমীরুল মু'মিনীন শব্দটি এবং বাইয়াত গ্রহণের রীতি পরিত্যাগ করা হয়নি। কারণ, এসব শব্দের মধ্যে ধর্মীয় কর্তৃত্বের ভাবার্থও বর্তমান ছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থেই খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। এসব শব্দের ব্যবহার, সুন্দর সুন্দর পরিভাষা ব্যবহার করে প্রতারণা করার চেয়ে অধিক কিছুই ছিল না।

বনী উমাইয়াদের রাজতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মুয়াবিয়া (রা) যদিও খলিফায়ে রাশেদ ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি মোটামুটি দুই বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) সাহাবা। কিছু সময় কাতেবে অহী ছিলেন। তাই সবকিছু সত্ত্বেও তাঁর মন প্রকৃত ইসলামী আবেগ-অনুভূতি ও আল্লাহর ভয়ের অস্থিরতা থেকে মুক্ত ছিল না।[১] পরবর্তী মুসলিম রাজা-বাদশাহদের চেয়ে তিনি অনেকগুণে উত্তম ছিলেন। তাঁর সাধারণ চরিত্র পরবর্তী মুসলিম সুলতানদের চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশী পছন্দনীয় ছিল।

---

১. একবার সিরিয়ার কোন এক স্থানে আমীর মুয়াবিয়া (রা) অবস্থান করছিলেন। সেই সময় তাঁর চোখের সামনে দিয়ে তাঁর গৌরব ও শান-শওকতের উপকরণ, ঘোড়া, দাসী এবং

www.amarboi.org

মুয়াবিয়া বংশের শাসন

আমীর মুয়াবিয়া (রা) বিশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অতপর তাঁর পুত্র ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহণ করে। তার শাসনকালে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে গোটা বিশ্বের মানুষই অবহিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা বেহেশতের যুবকদের নেতা নিজের জীবন কুরবানী করে এই জুলুম-নির্যাতন রোধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা রুদ্ধ হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বায়েতের সাথে কারবালা প্রান্তরে হৃদয়বিদারক জুলুম নির্যাতনের পর হারামে নববী পবিত্র মদীনার চরম অমর্যাদা করা হয়। তিন দিন পর্যন্ত মদীনাতে লুটপাটের অবাধ অনুমতি দেয়া হয়। কারণ, সুন্নাতে আদেলা অনুসারে খিলাফতের বৈধতার জন্য যে মদীনাবাসীদের বাই'আতই ছিল আসল তারাই ইয়াযীদের জীবন যাপন প্রণালী দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাই'আত প্রত্যাহার করেছিল। হারামে নববী (সা) পবিত্র মদীনার অমর্যাদার পর বায়তুল্লাহর ওপর পাথর বর্ষণ করে। হারামে ইবরাহীমের (আ) অমর্যাদা হতে যাচ্ছিলো ঠিক সেই সময়ে ইয়াযীদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে দুনিয়া রক্ষা পায়।

সিংহাসনে আরোহণের উত্তরাধিকার নীতি অনুসারে ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্টের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও দীনদার। ইয়াযীদের শাসনযুগের ঘটনাবলী তাঁর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মাত্র চল্লিশ দিন পর তিনি সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করে সরে দাঁড়ান। এই সময় তিনি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন যার শেষাংশ হচ্ছে ঃ

গাড়ী অতিক্রম করলে তা দেখে তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বললেন ঃ আল্লাহ আবু বকর (রা)-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি দুনিয়ার প্রত্যাশা করেননি। তাই দুনিয়াও তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা করেনি। দুনিয়া উমরকে (রা) চেয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো দুনিয়া চাননি। উসমান (রা) সম্পর্কে বলতে হয়, তিনি দুনিয়ার কাছে থেকে কিছু লাভ করেছেন এবং দুনিয়াও তাঁর নিকট থেকে কিছু লাভ করেছে। তাঁর পর আমরা তো দুনিয়ার মধ্যে ডুবে গিয়েছি। (তাবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৬) হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমীর মুয়াবিয়া (রা) কিয়ামতের জবাবদিহির ভয়ে সদা কম্পমান থাকতেন। শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী শুনে ডুকরে ডুকরে কাঁদতেন। সিফ্ফীন যুদ্ধের সময় খবর আসে যে, মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ দেখে রোমের সীমান্তবর্তী একটি রাষ্ট্র মদীনার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আমীর মুয়াবিয়া (রা) কালবিলম্ব না করে পত্র মারফত জানিয়ে দেন যে, হে রোমান কুত্তা, তুই আমাদের গৃহ বিবাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারবি না। আল্লাহর শপথ। তুই মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলে আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর যে সৈনিকটি সর্বপ্রথম তোর মস্তক চূর্ণ করতে অগ্রসর হবে তার নাম মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান (রা)। এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র সেই খৃষ্টানের সংকল্প উবে যায়। (তাবারী)

www.amarboi.org

"আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক অনুভূতি হচ্ছে এই যে, পিতা অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খান্দানের লোকদেরকে শহীদ করেছেন। মদীনার পবিত্র হারামে হত্যাকান্ড ও রক্তপাত ঘটিয়েছেন এবং পবিত্র কাবার অমর্যাদা ও ক্ষতিসাধন করেছেন। আমি খিলাফতের এই গুরুভার বহন করতে অক্ষম। পরামর্শ করে অন্য কাউকে খলিফা নির্বাচিত করে নাও।"[১]

শাসনক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর মাত্র কয়েকদিন জীবিত ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, পরিবারের লোকজন তাকে বিষ প্রয়োগ করেছিলো। তাঁর মৃত্যুর পর এভাবে মোট ২৩ বছরে মুয়াবিয়া (রা) খান্দানের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার মাধ্যমে যে সময় বিশুদ্ধ খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়েছিলো ঠিক সেই সময়ই মারওয়ান বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমীর মুয়াবিয়া (রা) রাজনীতির ক্ষেত্রে যে নীতিমালা কায়েম করেছিলেন মারওয়ানীদের নীতি আদর্শও ছিল তাই। বরং বলা যায়, এ নীতির উন্নয়ন সাধন করে মারওয়ানীরা তাকে পুরোপুরি রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করেছিল। মারওয়ানী শাসকরা একজন করে উত্তরাধিকারী মনোনীত না করে কয়েকজন করে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে থাকে এবং উত্তরাধিকারীদের অনুকূলে বাইয়াত গ্রহণের সময় তা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে স্ত্রী তালাক ও দাসমুক্ত হয়ে যাওয়ার শর্ত জুড়ে দিতে থাকে।

মারওয়ান বংশের শাসন

দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার ইনতিকালের পর মারওয়ান সিরীয়দের থেকে তাঁর নিজের জন্য বাই'আত গ্রহণ করে। কিন্তু সিরিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি মাত্র নয় মাস জীবিত ছিলেন। ইনতিকালের সময় আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করে তিনি তার দুই পুত্র আবদুল মালেক ও আবদুল আযীযকে যথাক্রমে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

মারওয়ানের মৃত্যুর পর আবদুল মালেক সিংহাসনে বসেন। রাসূলের (সা) হাওয়ারীর পুত্র আবদুল্লাহর (রা) মত সম্মানিত সাহাবী তাঁর রক্তের মূল্যে ইসলামের এই কলঙ্ককে মুছে ফেলতে প্রয়াস পান। কিন্তু সফল হতে পারেননি। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মত জালেম চরম নিষ্ঠুরতা ও রক্তপাতের মাধ্যমে বনী উমাইয়াদের বিরোধী সকলকে উৎখাত করে এবং তাদের শাসনের ভিত মজবুত করে।

১ হায়াতুল হায়ওয়ান, দুরুসুত তাওয়ারিখ।

www.amarboi.org

আবদুল মালেকের শাসনকালে পুরো জাঁকজমক ও শানশওকতের সাথে তিনি দরবার বসাতে শুরু করেন। ঐতিহাসিক বালাযুরী বলেন ঃ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ছিলেন জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সকল উপায় অবলম্বনকারী সর্বপ্রথম খলিফা।

আবদুল মালেকের পরে তাঁর দুই পুত্র ওয়ালীদ ও সুলায়মান উত্তরাধিকার ঐতিহ্য অনুসারে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কারণ, আবদুল মালেকের জীবদ্দশায়ই আবদুল আযীয ইনতিকাল করেছিলেন। ওয়ালীদের শাসন যুগে দেশে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজিত ছিল। ফলে সংস্কারমূলক কাজের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ ছিল। এই সময় ব্যাপক ও বিস্তৃত বিজয় অর্জিত হয়। ভারত ও চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত এলাকা মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে।

সুলায়মানের শাসনযুগে উমাইয়া প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট আমীর উমরাগণ ভোগবিলাস ও আনন্দ ফূর্তিতে মাতোয়ারা হয়ে উঠে। তবে সৌভাগ্যবশত সুলায়মান তার মৃত্যুর পর তার স্থলে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযকে পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনীত করেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন জ্ঞান, তাকওয়া, দীনদারী, সরলতা, ন্যায় ও ইনসাফের কারণে খলিফা রাশেদ। তিনি তাঁর শাসনকালে হযরত উমর ফারূকের (রা) খিলাফতের স্মৃতি তাজা করেন। খলিফা হওয়ার পর তিনি যে খুতবা দিয়েছিলেন সেটিই তার মানসিক প্রবণতা ও রাজনৈতিক নীতির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। তিনি বলেছিলেন ঃ

"হে জনগণ ! কুরআনের পরে আর কোন কিতাব নাযিল হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কোন নবী প্রেরিত হবেন না। আমি আইন রচয়িতা নই, শুধু ইসলামী আইনের বাস্তবায়নকারী। আমি নতুন কোন বিষয় চালু করবো না। মনে রেখো, আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে বান্দার কোন কল্যাণ নেই।"

উমর ইবনে আবদুল আযীয মাত্র দুই বছর চার মাস খিলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি উমাইয়াদের প্রবর্তিত সকল বিদআতের মূলোৎপাটন করেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, খিলাফত পুনরায় তার প্রকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং মুসলমান খলিফা নির্বাচনের অধিকার লাভ করুক। কিন্তু তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়।

১.তারিখুল খুলাফা।

www.amarboi.org

উমর ইবনে আবদুল আযীযের পরে ইয়াযীদ ও হিশাম যথাক্রমে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইয়াযীদ আমোদ-ফূর্তি ও নারীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল। সে উমর ইবনে আবদুল আযীযের সংস্কার কর্মসমূহকে নস্যাত করে দেয়। হিশামের স্বাভাব-চরিত্র ইয়াযীদের চেয়ে ভাল ছিল। তিনি জ্ঞানী ও উদার ছিলেন। কূটনৈতিক বিচক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন উচ্চস্তরের লোক। তিনি উমাইয়া শাসনের সৌভাগ্যের সূর্যকে মধ্য গগণে পৌছিয়ে দেন।

উত্থানের পর পতন অবধারিত। হিশামের পরই বনী উমাইয়া শাসনের বুনিয়াদই দুর্বল হতে থাকে। হিশামের স্থানে ওয়ালীদ ইবনে ইয়াযীদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সে সর্বদা বিলাসিতা ও আনন্দ ফূর্তিতে মেতে থাকতো। প্রথম ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদ তাকে হত্যা করে এবং নিজেই সিংহাসনে বসে। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পরই ইবরাহীম নামকা ওয়াস্তে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু ইয়াযীদ ও ইবরাহীমের শাসনামলে গৃহযুদ্ধ ও আব্বাসীয় খিলাফতের স্বপক্ষের কর্মীদের তৎপরতার কারণে বনী উমাইয়া শাসনের ভিত্তি অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ে।

ইবরাহীমের সিংহাসন লাভের পর কয়েক মাস যেতে না যেতেই মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মারওযান তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন এবং তাকে পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করেন। তার সময়ে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। ফলে উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময় সূচিত আব্বাসীয়দের আন্দোলন প্রকাশ্যে চলতে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে আব্বাসের সাথে মারওয়ানের যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে মারওয়ান নিহত হন। এভাবে একানব্বই বছরের শাসনের পর ১৩২ হিজরীতে দামেশকেই উমাইয়াদের সৌভাগ্যের পতাকা অবনমিত হয় এবং আব্বাসীয়দের কাল পতাকা দামেশকের দূর্গশীর্ষে পত পত করে উড়তে থাকে।

বনী উমাইয়া শাসন ৪১ হিজরীতে শুরু হয়ে ১৩২ হিজরীতে শেষ হয়। এই সময়ের মধ্যে মোট চৌদ্দজন শাসক সিংহাসনের বসেন। দেশের জনসংখ্যা ছিল চার কোটি নব্বই লাখ। দেশের সীমা ছিল পশ্চিম স্পেন ও ফ্রান্স, পূর্বে চীন ও সিন্ধু, উত্তরে উরাল সাগর এবং দক্ষিণে আরব সাগর।

www.amarboi.org

বনী উমাইয়া শাসকদের তালিকা

	বাদশাহদের নাম	জন্ম তারিখ	সিংহাসনে আরোহনের সন		শাসনকাল		
		হিঃ	হিঃ	খৃ.	বছর	মাস	দিন
১.	মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান		৪১	৬৬১	১৯	৩	২৭
২.	ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া	২৬	৬০	৬৮১	৩	৬	১৪
৩.	মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদ	৪৩	৬৪	৬৮৪	০	১	১০
৪.	মারওয়ান ইবনুল হাকাম	৮	৬৪	৬৮৪	০	৯	১৮
৫.	আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান	২৬	৬৫	৬৮৫	২১	১	১৫
৬.	ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক	৫০	৮৬	৭০৫	৯	৮	০
৭.	সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক	৫৪	৯৬	৭১৫	২	৮	০
৮.	উমর ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান	৬১	৯৯	৭১৭	২	৫	১৪
৯.	দ্বিতীয় ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেক	৬৫	১০১	৭২০	৪	১	০
১০.	হিশাম ইবনে আবদুল মালেক	৭২	১০৫	৭২৩	২০	০	০
১১.	দ্বিতীয় ওয়ালীদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেক		১২৫	৭৪৩	১	২	২২
১২.	তৃতীয় ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক	৮০	১২৬	৭৪৪	০	৬	১২
১৩.	ইবরাহীম ইবনে ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক		১২৬	৭৪৪	০	৪	০
১৪.	মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান	৭০	১২৭ ১৩২	৭৪৪ ৭৫০	৫	১০	০

www.amarboi.org

১. আমীর মুয়াবিয়া (রা)

৪১ হিজরী থেকে ৬০ হিজরী
৬৬১ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৮০ খৃষ্টাব্দ

ব্যক্তিগত জীবন

নাম মুয়াবিয়া, পিতার নাম আবু সুফিয়ান এবং মায়ের নাম হিন্দা। হিজরতের ষোল বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভ করেন তখন বয়স ছিল ৩ বছর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশদের যুদ্ধসমূহে তিনি পিতার সাথে ছিলেন।[১] ৮ হিজরীতে বিজয়ের সময় তিনি তাঁর পিতা ও খান্দানের অন্যান্য

---

১. তারিখুল খুলাফা গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ

قدم معاوية المدينة فلقيه ابو قتادة الانصاری فقال معاوية تلقا فی الناس كلهم غير كم يامعشر الانصاری قال لم يكن لنا دواب قال فاين النواضح قال عقرنا هافی طلبك وطلب ابيك يوم بدر الخ

মুয়াবিয়া মদীনায় আগমন করলে আবু কাতাদা আনসারী তার সাথে দেখা করলেন। মুয়াবিয়া তাকে বললেন ঃ হে আনসারগণ, তোমরা ছাড়া আর সবাই আমার সাথে সাক্ষাত করেছে। আবু কাতাদা আনসারী বললেন ঃ আমাদের কোন সওয়ারী ছিল না। মুয়াবিয়া (রা) বললেন ঃ তোমাদের সওয়ারী উটগুলোর কি হয়েছে ? আবু কাতাদা বললেন ঃ বদর যুদ্ধের দিন আমরা তোমার ও তোমার পিতার অনুসন্ধানে তা নিঃশেষ করে ফেলেছি।-----সহীহ আল বুখারীর ৫৯০ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে উমর থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

خطب معاية بالمدينة (لعله عند استخلاف يزيد) وقال من كان يريد ان يتكلم فی هذا الامر فليطلع لنا قرنه فلنحن احق به منه ومن ابيه قال ابن عمر فحللت حيوتی وهممت ان اقول احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك علی الاسلام الخ

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে ঃ يعنی يوم احد و يوم الخندق الخ

২. তারিখুল খুলাফা। কিন্তু কোন কোন বুযর্গ মনে করেন যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত মুয়াবিয়া গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এ বিষয়টি প্রকাশ করেন। والله اعلم

www.amarboi.org

অন্যান্য লোকদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব'দের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ বছর। তিনি হুনায়েন যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেন।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবার ভাই এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালক ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের আবেদনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অহী লিখকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেন ঃ আমার মনে বাদশাহ হওয়ার আকাংখা তখন থেকে জাগে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ

يا معاوية ان ملكت فاحسن (طبراني ابن عساكر)

"হে মুয়াবিয়া ! তুমি বাদশাহী লাভ করলে মানুষের প্রতি ইহসান করবে।" (তাবারানী, ইবনে আসাকির)

আমীর মুয়াবিয়া (রা) ১৩ হিজরীতে সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর কৃতিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখে ফারুকে আযম হযরত উমর (রা) তাঁকে জর্দানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাঁর ভাই দামেশকের গভর্নর ইয়াযীদের (রা) ইনতিকাল হলে তদস্থলে তাঁকে দামেশকের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। হযরত উসমান (রা)-এর সময়ে গোটা সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এভাবে অধীনস্ত গভর্নরদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতাও তাঁর হাতে এসে যায়।

হযরত আলী (রা) ৩৫ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়াকে পদচ্যুত করেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর বাই'আত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং তাঁর বিরুদ্ধে হযরত উসমান (রা)-এর রক্তের দাবীর বাহানা খাড়া করে যুদ্ধের জন্য তৈরী হন। ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয় এবং হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাত লাভ পর্যন্ত এই সংঘাত চলতে থাকে।

হযরত আলী মুর্তাজার শাহাদাতের পর খিলাফতে রাশেদার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটলে ইরাকীরা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাই'আত করে। কিন্তু তিনি কয়েকটি শর্তে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুকূলে খিলাফতের দাবী পরিত্যাগ করে নজীরবিহীন ত্যাগের মাধ্যমে এই গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটান। এ বছরটিকে আমুল জামায়া বা ঐক্যের বছর বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই সময় থেকেই আমীর মুয়াবিয়ার সর্বসম্মত শাসনযুগের সূচনা হয়।

www.amarboi.org

ইমাম হাসানের (রা) সাথে আপোষ করার পর আমীর মুয়াবিয়া (রা) আপোষের সব শর্ত পূরণ করেননি। এই আপোষ চুক্তি সম্পাদনে আট বছর পর হযরত হাসান (রা) মদীনায় ইনতিকাল করেন। কেউ তাঁকে বিষ পান করিয়েছিলো। এভাবে তিনি গোপন শাহাদাত লাভ করেন। যে সময় আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর কাছে তাঁর ইনতিকালের খবর পৌঁছে তখন ঘটনার গুরুত্বের কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে তার মুখ থেকে আল্লাহ আকবর ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সিরীয়রা তাদের আমীরের তাকবীর শুনে তাকবীর দিতে শুরু করে। আমীর মুয়াবিয়ার স্ত্রী ফাখতা জিজ্ঞেস করেন ঃ

اَعَلَى مَوْتِ ابِنِ فَاطِمَةَ تُكَبِّرُ ؟ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا كَبَّرْتُ شَمَاتَةً لِمَوْتِهِ وَلٰكِنَّ اسْتَرَاحِ قَلْبِيْ-

"আপনি কি ফাতেমার পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দিত হয়ে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছেন ? মুয়াবিয়া (রা) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ ! আমি তাঁর মৃত্যুর আনন্দে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করিনি। তাঁর মৃত্যুতে আমি স্বস্তি লাভ করলাম সেই কারণে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছি।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় আমীর মুয়াবিয়া (রা) দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। সিরিয়ার গভর্নরী লাভ করার পর অঢেল ধন-সম্পদ তাঁর এখতিয়ারে আসে। রাজনৈতিক স্বার্থে অর্থ ব্যয় ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট। সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি গোটা বায়তুলমালেরই একচ্ছত্র মালিক মুখতার এবং ইসলামী দুনিয়ার একমাত্র ক্ষমতাধর শাসক বনে যান।

শাসনকাল

৪১ হিজরীর ২৫শে রবিউল আউয়াল থেকে আমীর মুয়াবিয়ার স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনের সূচনা হয়। তাঁর সহযোগী ও শুভাকাঙ্খীর সংখ্যা সিরিয়াতে বেশী ছিল। তাই তিনি দামেশ্‌ককে তাঁর রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন। এরপর আমীর মুয়াবিয়া (রা)-কে দু'টি দলের সাথে বুঝাপড়া করতে হয়, একটি হযরত আলী (রা)-এর অনুসারীদের দল ও অপরটি খারেজীদের দল।

হযরত আলী (রা)-এর সহযোগীদের মধ্য থেকে অধিকাংশই হযরত হাসান (রা)-এর আপোষ ও নীরবতার পর পরিস্থিতি অনুকূল নয় দেখে আনুগত্য প্রদর্শন করতে শুরু করে। তা ছাড়াও আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর উপহার-উপঢৌকন এবং উদার ও সহনশীল কর্মনীতির দ্বারা তাদেরকে অনুগত বানাতে কোন ত্রুটি করেননি। তবে যে ক্ষেত্রে তরবারি ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে ক্ষেত্রে তরবারি ব্যবহার করতেও দ্বিধা করা হয়নি।

www.amarboi.org

খারেজীদের ব্যাপারে আমীর মুয়াবিয়াকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যদিও তাদের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসে তারা ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং আমলের ক্ষেত্রে ছিল সংকল্পবদ্ধ। হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর তারা পুনরায় ইরাকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রথমে সিরীয় সৈন্যরা তাদেরকে দমন করতে গিয়ে পরাজিত হয়। আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইরাকীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেন, কিন্তু তাতেও লক্ষ্য অর্জিত হয় না। পরাজিত হওয়ার পর খারেজীরা একের পর এক গোলযোগ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইরাকের জন্য এমন একজন ধুরন্ধর ও কঠোর গভর্নরের প্রয়োজন অনুভব করেন যিনি তার কঠোরতা ও দক্ষ কর্মনীতির সাহায্যে খারেজীদেরকে দমন করতে সক্ষম হবেন। এ উদ্দেশ্যে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর দৃষ্টি পড়ে মুগীরা ইবনে শুবা (রা) ও যিয়াদ ইবনে সুমাইয়ার ওপর। হযরত মুগীরা (রা) পূর্ব থেকেই তাঁর সমর্থক ছিলেন। তিনি কুফার গভর্নরী লাভ করলেন। তাঁর রাজনীতি ছিল নরম প্রকৃতির। তিনি আপোষ ও সমঝোতা পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর কর্মনীতির সাহায্যে খারেজীদের প্রভাব খর্ব করতে সক্ষম হন। ফলে এ ফিতনা তাঁর সময়ে নিশ্চিহ্ন না হলেও শক্তিতে অবশ্যই ভাটা পড়ে।

যিয়াদ ইবনে সুমাইয়া

যিয়াদ ইবনে সুমাইয়া প্রথমে হযরত আলী (রা)-এর অনুসারী ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে ফারেসের গভর্নর। তাঁর শক্তি ও প্রভাব লক্ষ্য করে আমীর মুয়াবিয়া (রা) তার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর সমর্থক হয়ে তাঁকে অসাধারণ শক্তি যোগাতে পারেন এবং বিরুদ্ধ শক্তির সমর্থক হয়ে তাঁর শক্তিকে দুর্বল করতে পারেন। সাথে সাথে তাঁর মনে এ আশংকাও দানা বেঁধে ওঠে যে, যিয়াদ যদি বনী হাশেম গোত্রের কাউকে সাথে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে যুদ্ধের নির্বাপিত আগুন পুনরায় প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে। অতএব, তিনি এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হন এবং মুগীরা ইবনে শুবার মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। প্রথমে সাফল্যের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হলো না। কোনভাবেই তাঁকে বাগে আনা গেল না। এরপর আমীর মুয়াবিয়া (রা) জাহেলী যুগের পরিত্যক্ত 'ইসতিলহাক' পদ্ধতির সাহায্যে তাকে বশ করতে মনস্থ করেন।

যিয়াদের পিতা কে তা অজ্ঞাত ছিল। তাঁর মা হারেস ইবনে কিলদাহ তাবীব সাকাফীর ক্রীতদাসী ছিল। তাকে যিয়াদ ইবনে সুমাইয়া অথবা যিয়াদ ইবনে আবীহ (পিতার সন্তান যিয়াদ) নামে ডাকা হতো। এটা ছিল তার জন্য

www.amarboi.org

অতীব লজ্জাকর ব্যাপার। আমীর মুয়াবিয়া (রা) একথা জানতেন যে, জাহেলী যুগে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের সুমাইয়ার সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং এই অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমেই যিয়াদের জন্ম হয়েছে। কিন্তু আবু সুফিয়ান খোলাখুলি তা স্বীকার করেননি। তিনি তা স্বীকার করলে জাহেলী রীতি অনুসারে সে আবু সুফিয়ানের পুত্র হিসেবেই পরিচিত হতো। ইসলাম ভবিষ্যতের জন্য এ রীতিকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছিলো। আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর জন্য একটি মাত্র পথই খোলা ছিল। অর্থাৎ ঘটনাটি যেহেতু ইসলাম পূর্ব সময়ের তাই জাহেলী যুগের অইসলামী পন্থায় যিয়াদকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করলে কলঙ্ক কেটে যাচ্ছে মনে করে সে নিশ্চিতভাবেই এতে সম্মত হবে। আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর এই কৌশল ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়।[১] ৪৪ হিজরীতে যিয়াদ আবু সুফিয়ানের পুত্র হয়ে তাঁর সহযোগী হয়ে যায়।

যিয়াদকে সহযোগী হিসেবে পেয়ে আমীর মুয়াবিয়া (রা) অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ৪৫ হিজরীতে তিনি তাকে বসরার গভর্নর করে পাঠান। বসরায় গিয়ে সে জুলুম-নির্যাতনের একশেষ করে ছাড়ে। শত শত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয় বিনা কারণে শত শত মানুষের হাত কাটা হয়। মোটকথা, এভাবে সরকারের একটা ভীতিকর প্রভাব কায়েম হয়। ৫০ হিজরীতে হযরত মুগীরা (রা) ইনতিকাল করলে কূফার গভর্ণরীর দায়িত্বও যিয়াদকে দেয়া হয়। যিয়াদ সেখানকার মানুষের ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে। কূফার ঘটনাবলীর মধ্যে হাজার ইবনে আদীর হত্যার ঘটনা ছিল অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

হাজার ইবনে আদী (রা)-এর হত্যাকান্ড

হযরত হাজার ইবনে আদী ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ সাহাবীদের অন্যতম। 'মুসতাদরিকে হাকেম' গ্রন্থে তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের 'রাহেব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে হাজারুল খায়ের বলেও আখ্যায়িত করা হতো। হযরত আম্মারের (রা) মত তিনিও সব সময় হযরত আলী (রা)-এর সাথে ছিলেন। ইমাম হাসান (রা) আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুকূলে শাসন ক্ষমতার দাবী ত্যাগ করলে হযরত আদীও মুয়াবিয়ার বাই'আত গ্রহণ করেন। আমীর মুয়াবিয়া

১. জনসাধারণ এবং বিশেষ করে অধিকাংশ সাহাবা (রা) এই 'ইসতিলহাক'কে স্বীকৃতি দেননি। আব্বাসী যুগে মাহদী এ ধরনের 'ইসতিলহাক'কে আইনগতভাবে বাতিল ঘোষণা করেন এবং ১৬০ হিজরীতে যিয়াদের খান্দান কুরাইশ ও উমাইয়া হওয়ার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়।

www.amarboi.org

এবং তাঁর গভর্নরগণ মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা)-কে গালাগালি করা নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিলেন।[১] কুফার গভর্নর হযরত মুগীরা (রা) গুণধর ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুসরণে তিনিও এই বিদ'আত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। বড় বড় সাহাবীদের মত হযরত আদীও (রা) এটি পসন্দ করতেন না। তিনি এবং আশারায়ে মুবাশ্শারার সদস্য হযরত সাইদ ইবনে যায়েদও[২] (রা) কয়েকবার হযরত মুগীরা (রা)-কে নিষেধ করেন। কিন্তু কাজটি তাঁর কাছে ভাল বলে মনে না হলেও তিনি রাজনৈতিক কারণে বাধ্য ছিলেন। গালিগালাজের এই ধারা অব্যাহত থাকলে জবাবে হযরত হাজার ইবনে আদীও (রা) মুগীরা (রা) এবং আমীর মুয়াবিয়া (রা)-কে গালি দিয়ে মনের খেদ মিটাতেন। এতে হযরত মুগীরা (রা) তাঁকে কিছু বলতেন না। বরং উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইতেন। হযরত মুগীরা (রা)-এর ইনতিকালের পর যিয়াদ কুফার সাথে বসরারও গভর্নরী লাভ করে। একদিন সে জুম'আর খুতবা অতিমাত্রায় দীর্ঘায়িত করে। সম্ভবত তাতে গালিগালাজের দীর্ঘ ফিরিস্তি থেকে থাকবে। হযরত হাজার (রা) বললেন ঃ নামায শুরু করো। কিন্তু সে তা করলো না। হযরত হাজার (রা) এক টুকরা পাথর তুলে তার দিকে নিক্ষেপ করলে যিয়াদ মিম্বর থেকে নেমে নামায আদায় করলো এবং আমীর মুয়াবিয়া (রা)-কে এ ঘটনা লিখে জানালো। কারণ, হযরত হাজারের সাথে খারাপ আচরণ করার সাধ্য তার ছিল না। আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইতিপূর্বে হযরত হাজার ইবনে আদী ও হযরত মুগীরা (রা)-এর মধ্যেকার বিরোধ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। সিরিয়ায় হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) দরবার থেকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, হাজার ও তার সহযোগীদের দামেশকে পাঠিয়ে দেয়া হোক। হযরত হাজার (রা) আমীর মুয়াবিয়ার (রা)-এর দরবারে উপনীত হয়ে নিয়ম মাফিক তাঁকে আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আমীরাল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করলেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা) আগে থেকেই তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, আমি কি আমীরুল মু'মিনীন ? আমি তোমাকে কখনো ক্ষমা করতে পারি না। এরপর তিনি হযরত হাজার ইবনে আদী (রা)-কে হত্যার নির্দেশ দেন এবং হযরত হাজার ইবনে আদী (রা) অসহায়ভাবে নিহত হন। এ ঘটনায় জনগণ অত্যন্ত বেদনাহত হয়ে পড়ে। ঘটনার খবর শুনে হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা খুবই কান্নাকাটি করেন। মারওয়ান বর্ণনা করেন ঃ আমীর মুয়াবিয়া যে সময় মদীনায় এসে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে হাযির হন তখন হযরত

১. দেখুন তিরমিযী, পৃষ্ঠা–২১৪।

২. মুসনাদে আহমদ, পৃষ্ঠা–১৮৭ ও ১৮৮।

www.amarboi.org

আয়েশা (রা) হযরত হাজার ইবনে আদী (রা)-এর হত্যার ব্যাপারে মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[১] হযতর হাজার ইবনে আদীর (রা) হত্যার ঘটনা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমীর মুয়াবিয়া (রা) যা করার করে ফলেছিলেন। কিন্তু এজন্য পরে তাঁকে বেশ অনুশোচনা করতে হয়।

মোটকথা, যিয়াদের জুলুম-নির্যাতন ইরাকের মাটিতে বৈধ অবৈধ সব ধরনের বিরোধিতা নির্মূল করে ফেলে। অতপর সে এই মর্মে আমীর মুয়াবিয়াকে পত্র লেখে যে, আমি বাঁ হাতের সাহায্যে ইরাককে নিয়ন্ত্রণে এনেছি। আমার ডান হাত এখনো মুক্ত। হিজাজের শাসনভার আমার ওপর অর্পণ করে আমার ডান হাতকেও কর্মতৎপর রাখুন। এক ফরমানের মাধ্যমে আমীর মুয়াবিয়া তার সে আকাংখাও পূরণ করেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তা পূরণ হতে দেননি। হিজাজবাসীগণ যিয়াদের গভর্নর হওয়ার খবরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হযরত ইবনে উমর দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ, আমাদেরকে যিয়াদের জুলুম-অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করো। হযরত ইবনে উমরের দোয়া কবুল হয়। হিজাজে পৌছার পূর্বেই ৫৩ হিজরীতে সে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ খবর জানতে পেরে হযরত ইবনে উমর মন্তব্য করেন, হে ইবনে সুমাইয়া, তুই না আখিরাত লাভ করলি, না দুনিয়া তোর জন্য অবশিষ্ট থাকলো।[২]

উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ

যিয়াদের মৃত্যুর পর উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর বসরার গভর্নরী লাভ করেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাকে অপসারিত করে আমীর মুয়াবিয়া (রা) যিয়াদের পুত্র উবায়দুল্লাহ (ইবনে যিয়াদ)কে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন। সে তার পিতার চেয়েও কঠোর কর্মনীতি গ্রহণ করে। সে কষ্টদায়ক শাস্তির পদ্ধতি আবিষ্কার করে। হত্যা ছিল তার কাছে মামুলি ব্যাপার। কিন্তু তারপরও উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ খারেজীদের ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা দমন করতে ব্যর্থ হয়। উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ মুয়াবিয়ার (রা)-এর শাসন যুগের শেষ অবধি গভর্নর হিসেবে বহাল থাকে।

মিসরের গভর্নর ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস (রা)। তিনি ৪৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালের পরে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আমর গভর্নরী লাভ করেন। কিন্তু অচিরেই তাকে পদচ্যুত করা হয়।

---

১. মুসতাদরিকে হাকেম, ইসাবা প্রভৃতি।

১. ইবনে আসীর

www.amarboi.org

হিজাজের গভর্নরী বনী উমাইয়াদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কখনো মারওয়ানকে আবার কখনো সাইদ ইবনুল আসকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করা হতো। আমীরুল হজ্জের দায়িত্ব পালনও তাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। আমীর মুয়াবিয়া মাত্র দুইবার হজ্জ করেছিলেন। একবার ৪৪ হিজরীতে এবং আরেকবার ৫০ হিজরীতে।

বিজয়সমূহ

হযরত আমীর মুয়াবিয়ার শাসন যুগে রাষ্ট্রের পূর্ব সীমান্তে কোন অঞ্চল বিজিত হয়নি। তবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সেনাবাহিনীর তৎপরতা ও বিজয় অধিক বিস্তৃত হয়েছে। আমীর মুয়াবিয়া (রা) ৪৯ হিজরীতে কনস্টান্টিনোপলের ওপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই অভিযানের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন সুফিয়ান ইবনে আওফ। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ীদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দান করেছিলেন। তাই সেই সময় জীবিত বিখ্যাত ও নামযাদা সাহাবীগণ এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু আউয়ুব আনসারী (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে যুবায়ের (রা), হযরত ইবনে উমর (রা) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। ফারকাদুনা নামক স্থানে এই বাহিনী জ্বর ও বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু তাতে সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর পুত্র ইয়াযীদকেও এই অভিযানে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার অজুহাত খাড়া করে ইয়াযীদ তাতে অংশগ্রহণ না করে ভোগবিলাসে মত্ত থাকে।[১] তার এ অবস্থা অবগত হয়ে আমীর মুয়াবিয়া (রা) পরে তাকে সাহায্যকারী সেনাদলের সাথে কনস্টান্টিনোপল যেতে বাধ্য করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে যেতে হয়।

---

১. ঠিক এই সময়েই ইয়াযীদ তার বিলাস আসরে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিল ঃ

ما ان ابالى بما لاقت جموعهم - بالفرقدونة من حمى و من موم
اذا اتكات على الانماط مرتفقًا : بدير مروان وعندى ام كلثوم

"তাদের সেনাদল ফারকাদূনায় জ্বর ও বসন্তে আক্রান্ত হয়ে যে দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছে আমি তার পরোয়া করি না।

যখন আমি দীরে মারওয়ানে উচু কোমল পশমী গদিতে গা এলিয়ে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন আর আমার পাশেই আছে উম্মে কুলকুম।"

www.amarboi.org

মুজাহিদদের এই বাহিনী রোমানদের মধ্যে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি করে, বহু শহর ও দুর্গ তাদের অধিকারে আসে। তারা সমুদ্রের দিক থেকে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি। রোমানরা অগ্নি বর্ষণ করে মুসলমানদের বহু সংখ্যক জাহাজ ধ্বংস করে ফেলে। ফলে মুজাহিদ বাহিনী ফিরে আসে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বপ্রথম মেজবান হযরত আবু আউয়ুব আনসারী (রা) এই অবরোধকালে ইনতিকাল করেন। কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের পাদদেশে তাঁকে দাফন করা হয়। ৮৫৭ হিজরীতে উসমানী তুর্করা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করলে তাঁর কবরের ওপর সমাধি স্তম্ভ এবং তার পাশেই একটি জমকালো মসজিদ নির্মাণ করে। এই মসজিদেই তুর্কী সুলতানদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হতো।

৫০ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া (রা) উকবা ইবনে নাফে'র সেনাপতিত্বে আফ্রিকায় একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী উত্তর আফ্রিকার বহু এলাকা অধিকার করে। মুসলমানগণ তুনযা পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হয়। উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের যথেষ্ট বিস্তার ঘটলে উকবা সেখানে কায়রোয়ান নামক একটি শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেখানে সামরিক ছাউনি ছাড়াও বিখ্যাত জামে মসজিদও নির্মিত হয়। জুনাদা ইবনে উমাইয়া আযদীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী ৫২ হিজরীতে রোড্স অধিকার করে।

ভাবী শাসক হিসেবে ইয়াযীদের অভিষেক

আমীর মুয়াবিয়া (রা) অত্যন্ত কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে শাসনক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর স্বাভাবিক আকংখা ছিল এই যে, এ ক্ষমতা তাঁর পরিবারের হাতেই থাকুক। সুতরাং মুগীরা ইবনে শুবার (রা) পরামর্শে তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র ইয়াযীদের সিংহাসনে বসার জন্য জনগণের বাই'আত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর শাসন ক্ষমতা অন্যদের হাতে চলে না যায়। যদিও ইয়াযীদ তার প্রতিদিনের দুষ্কর্ম ও ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে অনীহার কারণে সাধারণ মানুষের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এটা ছিল ৫৫ হিজরীর ঘটনা এবং সেই দিন থেকেই আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর হাতে ইসলামে বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার বিদ'আতের সূচনা হয়।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইয়াযীদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য পরিবেশ পরিস্থিতিকে অনুকূল বানাতে কোন প্রচেষ্টাই বাদ দেননি। যাদের পক্ষ থেকে বিরোধিতার আশংকা ছিল তাদেরকে তিনি কাছে টেনে নেন, বড় বড় পদ দান

www.amarboi.org

করেন, তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেন এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করেন। এ ধরনের কর্মকৌশল গ্রহণের ফল দাঁড়ায় এই যে, ইরাক ও সিরিয়ার অধিবাসীরা তাঁর কাজে সমর্থন যোগায় এবং বাই'আত গ্রহণ করে। অতপর আমীর মুয়াবিয়া (রা) হিজায তথা বিশেষ করে মদীনার লোকদের কথা চিন্তা করতে থাকেন। কারণ, সেখানে উম্মতের এমন সব বড় বড় ব্যক্তিত্ব বর্তমান ছিলেন অর্থের লালসা দেখিয়ে যাদের মুখ বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। তাই অতি মাত্রায় ক্ষমতা ও প্রভাব খাটানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রথমে আমীর মুয়াবিয়া (রা) মদীনার গভর্নর মারওয়ানকে ইয়াযীদের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। ইয়াযীদের নাম শুনেই তার অযোগ্যতার কারণে মদীনাবাসীদের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়।

বক্তৃতা দানকালে আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর (রা) মারওয়ানকে উদ্দেশ করে বলেন ঃ তুমি ও মুয়াবিয়া (রা) অন্যায় কথা বলছো। তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের খলিফা নির্বাচনের অধিকার কেড়ে নেয়া এবং খিলাফতকে কাইজারতন্ত্র[১] বানিয়ে দেয়া।[২]

হযরত ইমাম হুসাইন (রা), হযরত ইবনে উমর (রা) এবং হযরত ইবনে যুবায়ের (রা)-ও বিরোধিতা করেন। এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিরোধিতার কারণে মদীনাবাসীগণ তথা গোটা হিজাযের জনসাধারণই বিরোধী হয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে কাজ উদ্ধারের জন্য আমীর মুয়াবিয়া (রা) এক হাজার সৈন্য সংগে নিয়ে নিজে মদীনায় গিয়ে হাজির হন। বিষয়টি মাত্র চারজন সম্মানিত ব্যক্তির ওপর নির্ভর করছিলো। তাঁরা রাজি হলেই সবাই রাজি হয়ে যাবে। তাই আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁদের চারজনকে ডাকলেন। আলাপ-আলোচনার জন্য সবার পক্ষ থেকে ইবনে যুবায়ের (রা)-কে মনোনীত করা হলো। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে বললেন ঃ আমরা আপনাকে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি তার যে কোন একটি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেছিলেন তাই করুন। অর্থাৎ কাউকে আপনার উত্তরাধিকারী বানাবেন না। বিষয়টি উম্মতের এখতিয়ারে ছেড়ে দিন। অথবা আবু বকর সিদ্দীক (রা) যা করেছিলেন তাই করুন। অর্থাৎ কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করুন যিনি কুরাইশ গোত্রের লোক হবেন, বনী উমাইয়া গোত্রের কাউকে নির্বাচিত করবেন না। অথবা হযরত উমর ফারুক (রা) যা করেছিলেন তাই করুন। অর্থাৎ ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিন যারা

---

১. অর্থাৎ রাজতন্ত্র ।

২. তারিখুল খুলাফা।

www.amarboi.org

আপনার ইনতিকালের পরে নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে খলিফা নির্বাচিত করে নেবে। তবে এ কমিটিতে আপনার পুত্র থাকতে পারবে না। মুয়াবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এছাড়া আর কোন প্রস্তাব আছে কিনা ? ইবনে যুবায়ের (রা) বললেন ঃ না। একথা শুনে আমীর মুয়াবিয়া (রা) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ এখন আমার ধৈর্যের সীমা শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ ! আর একটি কথাও যদি কারো মুখ থেকে বের হয় তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। ভাল চাইলে চুপ করে থাকবে। অতপর আমীর মুয়াবিয়া (রা) উন্মুক্ত তরবারি হাতে সৈনিক পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের সবাইকে সাথে নিয়ে মসজিদে গেলেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন ঃ

"এসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ (ইবনে যুবায়ের প্রমূখ) মুসলমানদের নেতা এবং উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমরা তাদের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে পারি না। তাঁরা সবাই ইয়াযীদের বাই'আত করেছেন, তোমরাও আল্লাহর নাম নিয়ে বাই'আত করো।" একথা শুনে উপস্থিত সবাই বাই'আত করে। কারণ, তারা এসব সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্যই অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু লোকজন পরে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন ঃ আমরা ইয়াযীদের বাই'আত করিনি। তখন লোকজন বললো ঃ সাধারণ সমাবেশে আপানরা মুয়াবিয়া (রা)-এর কথার প্রতিবাদ করেননি কেন ? জবাবে তিনি বলেন ঃ জীবনের আশংকা ছিল তাই।[১]

মোটকথা এভাবে সবার থেকে ইয়াযীদের বাই'আত নেয়া হয়। তবে এই চার ব্যক্তি বাই'আত করেন না। এ কারণে আমীর মুয়াবিয়া ঐসব ব্যক্তিবর্গ এবং বনী হাশেম গোত্রের আরো কয়েকজনের সাথে অনুচিত ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করতে থাকেন। কয়েকজনের ভাতাও বন্ধ করে দেয়া হয়।

আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর ওফাত

আমীর মুয়াবিয়া (রা) ২২ বছর সিরিয়ার গভর্নর এবং ১৯ বছর গোটা ইসলামী সালতানাতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ৬০ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হন। ঠিক সেই সময়েও ইয়াযীদ দামেশকের বাইরে ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল। জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়লে নিম্নোক্ত রাজনৈতিক অসীয়তটি ইয়াযীদের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য দাহ্হাক ইবনে কায়েস ও মুসলিম ইবনে উকবাকে নির্দেশ দেন।

১. তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৭ ; ইবনে আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২০১ ও তারিখুল উমাম, পৃষ্ঠা-১৮১।

www.amarboi.org

"বেটা, আমি তোমার পথ থেকে সকল বাধা অপসারণ করেছি। তোমার শত্রুদের দমন করেছি এবং গোটা আরবের মাথা তোমার সামনে নত করিয়েছি। এখন হিজাযের অধিবাসীদেরকে তোমার উত্তম আচরণ দিয়ে বশীভূত করে রাখো। তারা যদি প্রতিদিন গভর্নর পরিবর্তন করতে বলে তাই করবে। সিরিয়াবাসীদেরকে তোমার আস্থাভাজন বানিয়ে নাও। শুধু তিন ব্যক্তির পক্ষ থেকে আশংকা আছে। তাঁদের একজন হচ্ছেন ইবনে উমর (রা)। ইবাদাত-বন্দেগী তাঁকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন হুসাইন (রা)। তাঁকে সাথে নিয়ে ইরাকীরা অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তুমি সফল হলে তাঁকে ক্ষমা করে দিবে। কারণ, তিনি আমাদের নিকটাত্মীয়। আমাদের ওপর তাঁর হক আছে। তাছাড়াও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।"[১]

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে বললেন ঃ "আমার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি পবিত্র নখ আছে কাফন দেয়ার পর পবিত্র নখগুলো পিষে আমার মুখে এবং চোখে লাগিয়ে দেবে। পবিত্র এই নখের বরকতে আল্লাহর আমার প্রতি রহম করা বিচিত্র নয়।"[১]

অবশেষে ৬০ হিজরীর রজব মাসের ১ তারিখ মোতাবেক ১৭ই এপ্রিল, ৬৮০ খৃস্টাব্দে ১৯ বছর তিন মাস সাতাশ দিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর তিনি ইনতিকাল করেন। দাহ্হাক জানাযার নামায পড়েন। পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে ইয়াযীদ সেখানে আসে এবং কবরের ওপর জানাযার নামায পড়ে।

মুয়াবিয়া (রা)-এর চরিত্র

আমীর মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন ইসলামে প্রথম বাদশাহ। তাঁর রাজনৈতিক উপলব্ধি ছিল অনেক উঁচু। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাহসী, মহৎ ধ্যান-ধারণার অধিকারী ও দূরদর্শী প্রশাসক ছিলেন। তাঁর মধ্যে আরো ছিল উদারতা, সৌজন্যবোধ ও দানশীলতার গুণাবলী। তবে তিনি সহিষ্ণুতা ও ক্রোধের মাঝে সমন্বয় করতে পারতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি আবেগের প্রাধান্যে অন্যটি হারিয়ে ফেলতেন।

তাঁর শাসনক্ষমতা লাভ জনগণের রায়ের ভিত্তিতে ছিল না। তাই সূচনা থেকে বরাবরই তরবারি ব্যবহার করতে হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে তিনি এমন

---

১. ইবনে আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২ ও ৩।

২. ইবনে আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০২।

www.amarboi.org

কতিপয় স্বৈরাচারী গভর্ণর নিয়োগ করেন যারা রক্তপাত করতে মোটেই দ্বিধা করেনি। তা সত্ত্বেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে অধিকাংশ সময় ক্ষমার দিকটি অবশ্যই বিবেচনা করেছেন। আমীর মুয়াবিয়ার (রা) রাজনৈতিক নীতি ছিল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কঠোরতা করতে বাধ্য না হতেন ততক্ষণ পর্যন্ত কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না। তিনি বলেছেন ঃ

"আমার চাবুকে যেখানে ফল পাই সেখানে তরবারি ব্যবহার করি না। আর যেখানে মুখের কথায় কাজ হয় সেখানে চাবুক ব্যবহার করি না। কারো সাথে আমার নামমাত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও আমি তা ছিন্ন করি না। যখন মানুষ তা টেনে ধরে তখন আমি তা ঢিলা করে দেই। আর যখন তারা ঢিল দেয় তখন আমি টেনে ধরি।"

ঐতিহাসিক মাসউদী তাঁর দিবারাত্রির কর্মসূচী এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) ফজরের নামায শেষে আশ্রিত রাজ্যসমূহের রিপোর্ট শুনতেন এবং তারপর কুরআন তিলাওয়াত শেষ করে মহলে প্রবেশ করতেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতেন। অতপর চার রাক'আত নামায পড়ে খাস দরবার ডাকতেন। এতে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও মন্ত্রীগণ উপস্থিত থাকতেন। এই দরবারেই সারাদিনের প্রয়োজনীয় জরুরী বিষয়ে পরামর্শ হতো এবং তারপর তিনি মহলে প্রবেশ করতেন। মহল থেকে ফিরে এসে মসজিদের খাস কুঠরিতে সিংহাসন পেতে বসতেন। এটা ছিল তার আম দরবার। এখানে দুর্বল, গ্রাম্য সাধারণ লোক, শিশু ও নারী অবাধে প্রবেশ করতো এবং তাদের নিজ নিজ প্রয়োজন ও দুঃখ-কষ্ট বর্ণনা করতো। তিনি সহানুভূতির সাথে তা শুনতেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। দরবারে আম শেষে পুনরায় খাস দরবার ডাকতেন। এ দরবারে বিশেষ্র বিশেষ শরীফ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ শরীক হতেন। এ দরবার শেষ করে তিনি দিবাভাগের খাবার গ্রহণ করতেন। এ সময় তাঁর পাশে তাঁর সচিব এসে দাঁড়াতো। সাক্ষাত প্রার্থীদেরকে এক এক করে পেশ করতো এবং তাদের আবেদন পড়ে শুনাতো আর তিনি তার নির্দেশ লিখাতেন। সাক্ষাতপ্রার্থীরা যতক্ষণ থাকতেন খাবারে অংশগ্রহণ করতেন। এরপর তিনি মহলে প্রবেশ করতেন এবং যোহরের নামাযের জন্য বের হতেন। নামায শেষে খাস দরবারে বসতো এবং আসর পর্যন্ত চলতো। আমীর উমারা ও মন্ত্রীবর্গ প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আসরের নামাযের পর আবার মহলে প্রবেশ করতেন এবং মাগরিবের নামাযের পূর্বে আবার সিংহাসনে বসতেন। সভাসদবর্গও তাদের নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী বসে পড়তেন। এ সময় রাতের খাবার পেশ করা হতো। খানা শেষে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। অতপর মহলে প্রবেশ

www.amarboi.org

করতেন এবং এশার নামাযের সময় বাইরে আসতেন। নামাযের পর পুনরায় খাস দরবার বসতো। এ দরবারে আমীর উমারা, মন্ত্রীবর্গ ও মুসাহেবেরা অংশগ্রহণ করতো এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা হতো। এ আলোচনা শেষ হয়ে গেলে জ্ঞান বিষয়ে আলোচনা শুরু হতো। আরব, আজম এবং অন্যান্য জাতিসমূহের বাদশাহদের অবস্থা, তাদের যুদ্ধ ও সন্ধির ঘটনাবলী, প্রজাদের সাথে আচরণ এবং দেশের রাজনীতির আলোচনা চলতো। রাতের এক-তৃতীয়াংশের পর আলোচনা শেষ হয়ে যেতো। তারপর বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তিনি অন্দর মহলে চলে যেতেন। রাতের দুই-তৃতীয়াংশের পর জেগে উঠতেন। এটা ছিল অধ্যয়নের সময়। এ সময় তাঁর সামনে প্রাচীনকালের বাদশাহদের জীবন কাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলী এবং রাজনৈতিক কৌশল তুলে ধরা হতো। ফজর পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকতো। ফজরের আযানের পর দুই রাকাআত নামায আদায় করার জন্য মসজিদে গিয়ে হাজির হতেন।[১]

আমীর মুয়াবিয়ার (রা) দস্তরখান সুস্বাদু খাদ্যে পূর্ণ হতো। তাই হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে, سماط معاوية دسم (মুয়াবিয়ার দস্তরখানে সুস্বাদু খাদ্যের সমাহার)।

সংস্কার ও কৃতিত্ব

সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতিক্রমে সর্বপ্রথম নৌবহর তৈরী করেন।[২] নিজের শাসনযুগে তিনি সেই নৌবহরকে সম্প্রসারিত করেন। যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের কারখানা তৈরী করেন। আমীরুল বাহর (এডমিরাল) জুনাদা ইবনে উমাইয়ার নেতৃত্বে এক হাজার সাত শ যুদ্ধ জাহাজের একটি বহর সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতো। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমীর মুয়াবিয়া (রা) সারা দেশে তার সম্প্রসারণ ঘটান। তিনি পানি সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি খাল খনন ও বাঁধ নির্মাণ করান।

আমীর মুয়াবিয়াই (রা) প্রথম দিওয়ানে খাতেম নামে একটি দফতর কায়েম করেন যেখানে সমস্ত সরকারী ফরমানের নকল সংরক্ষিত রাখা হতো। তাঁর সময়ে সিরিয়ার সমস্ত অফিসিয়াল দলীল-দস্তাবেজ ও কাগজপত্র রোমান ভাষায় লিখা হতো। এই দফতরের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি ছিল সার্জুন নামক এক

---

১. মরুজুয যাহাব।

২. তারীখুল খুলাফা।

www.amarboi.org

খৃস্টান। সার্জুনের আরো একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, সে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর মজলিসে শুরার সদস্য ছিল। অথচ খোলাফায়ে রাশেদীন এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ (নিজের আদর্শে বিশ্বাসী ছাড়া অন্য কারো ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো না।) এর ওপর পূর্ণরূপে আমল করতেন। তাঁরা অফিস কিংবা রাষ্ট্রীয় কোন কাজে কোন অমুসলিমকে প্রশ্রয় দেননি। বরং হযরত উমর (রা) যখন শুনেন যে, আবু মূসা আশআরী (রা) কোন এক খৃস্টানকে তাঁর কাতেব নিয়োগ করেছেন তখন তাকে এই বলে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, "ভবিষ্যতে এরূপ হলে কঠোর শাস্তি প্রদান করবো।"

প্রাচীন রাজা-বাদশাহদের ইতিহাসের প্রতি আমীর মুয়াবিয়া (রা) অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন। অতএব উবায়েদ ইবনে সারিয়ার (রা) সাহায্যে তিনি তাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করান। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ গ্রীক ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর হামলার সময় আমীর মুয়াবিয়ার (রা)-এর ওপরও হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা হলে তখন থেকেই তিনি তাঁর নিরাপত্তার জন্য দেহরক্ষী নিয়োগ করেন। দেহরক্ষী সদাসর্বদা তরবারি নিয়ে তাঁর সাথে থাকতো। এমনকি নামাযের সময় দেহরক্ষী উন্মুক্ত তরবারি হাতে প্রস্তুত থাকতো। একইভাবে আমীর মুয়াবিয়া (রা) নিজের জন্য মসজিদে খাস কামরা নির্মাণ করেন যেখানে তিনি একাকী নামায পড়তেন। বাইরে কোথাও যাওয়ার সময়ও আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে তাঁর দেহরক্ষীগণ থাকতো। আমীর মুয়াবিয়াই (রা) সর্বপ্রথম তাঁর দরজায় দ্বাররক্ষী নিয়োগ করেন। দ্বাররক্ষীগণই বাদশাহ এবং তাঁর সাক্ষাত প্রার্থীদের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতো। সাধারণভাবে সাক্ষাতের কোন অনুমতিই ছিল না।

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব কায়েম রাখার জন্য আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর নির্দেশে সর্বপ্রথম হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে মিম্বরে উঠে গালি-গালাজ করার সূচনা হয়।[১] যদিও আন্তরিকভাবে আমীর মুয়াবিয়া (রা) হয়তো একাজকে ভাল মনে করতেন না। একবার হযরত আলী (রা)-এর বন্ধু দিরার সাদাইকে হযরত মুয়াবিয়া (রা) বললেন ঃ "আলীর (রা) গুণাবলী শোনাও।" তিনি হযরত আলীর (রা) মহত গুণাবলী বর্ণনা করে শুনালে আমীর মুয়াবিয়া (রা) খুব কাঁদলেন এবং তারপর বললেন ঃ "আবুল হাসানের ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহর শপথ ! তিনি এই বর্ণনার অনুরূপই ছিলেন।"[২]

---

১. তাবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা—১৪১
২. রাওদাতুল নাযরা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা—২১২

www.amarboi.org

হযরত উমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে উমায়ের ইবনে সাদ ছিলেন হিমসের গভর্নর। তাকে পদচ্যুত করে ফারুকে আযম (রা) মুয়াবিয়া (রা)-কে হিমসের গভর্নর নিয়োগ করলে লোকজন বলতে থাকে যে, দেখ উমায়েরকে অপসারণ করে মুয়াবিয়ার (রা) মত লোককে গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছে। একথা শুনে হযরত উমর (রা) বলেন ঃ হে জনগণ, অমর্যাদার সাথে মুয়াবিয়া (রা)-এর নাম উচ্চারণ করো না। আমি মুয়াবিয়া (রা) সম্পর্কে নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

"হে আল্লাহ, মুয়াবিয়ার দ্বারা মানুষকে পথ প্রদর্শন করো।[১] আবদুল্লাহ ইবনে উমায়ের বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াবিয়া (রা) সম্পর্কে এই বলে দোয়া করেছেন ঃ

হে আল্লাহ, তুমি তাকে পথ প্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত করো। তার দ্বারা মানুষকে পথ প্রদর্শন করো।[২] তাই আমীর মুয়াবিয়ার (রা) রাজনৈতিক পরিপক্কতা ও সুব্যবস্থাপনার ফল ছিল এই যে, তিনি পনর বছর পর্যন্ত কেন্দ্রের অধীনে এবং পাঁচ বছর স্বাধীন সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনার সময় সেখানে পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। সিরিয়ার সকল আমীর-উমরা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর সমর্থক ছিল। হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালের পরে তিনি বিশ বছর পর্যন্ত গোটা ইসলামী সালতানাতের অপ্রতিদ্বন্দী শাসক ছিলেন। এ সময় রাষ্ট্রে সামগ্রিকভাবে শান্তি বজায় ছিল।

হযরত আলীর (রা) উক্তি ঃ

মুয়াবিয়া (রা)-এর ইমারতকে খারাপ মনে করো না। এর অবসান ঘটলে দেখবে অনেক মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।[৩]

اللهم ارض عن جميع اصحاب محمد صلى الله عليه و
اله وصحبه وسلم وارض عنا يا ارحم الراحمين -

---

১. তিরমিযী।

২. তিরমিযী। কিন্তু সাফারুস সা'আদাহ গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

ফাদালায়েলে মুয়াবিয়া (রা)। সাবেত বর্ণিত হাদীস দু'টি এ বিষয়কে শক্তিশালী করে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৩. তারীখুল খুলাফা।

www.amarboi.org

২. ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা)

৬০ হিজরী থেকে ৬৪ হিজরী
৬৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৮৪ খৃষ্টাব্দ

আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ইনতিকালের পর এমন এক বিপর্যয়কর যুগের সূত্রপাত হয় যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য হযরত আবু হুরাইরা এই বলে দোয়া করতেন ঃ

اللهم انى اعوذبك من رأس الستين وامارة الصبيان [১]

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ষাট হিজরীর সমাপ্তি ও ছেলে ছোকরাদের শাসন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

মারওয়ান বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন ঃ "কুরাইশ গোত্রের কতিপয় ছোকরার হাতে উম্মতের ধ্বংস নেমে আসবে।" মারওয়ান বললো ঃ "তাদের ওপর আল্লাহর লানত হোক।" আবু হুরাইরা বললেন ঃ "শোন আমি ইচ্ছা করলে বলে দিতে পারি যে, অমুক এবং অমুকের পুত্র।"[২] মোটকথা এই হাদীসের বাস্তব সাক্ষ্য ইয়াযীদ তার পিতার ইনতিকালের পর ৬০ হিজরীর রজব মাসে চব্বিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইয়াযীদ ছিল এমন একজন স্বাধীনচেতা ও লাগাহীন মানুষ যে বেপরোয়াভাবে যে কোন গোনাহর জন্য প্রস্তুত থাকতো। ব্যভিচার ও মদ্যপান ছিল তার প্রকৃতিগত। ভ্রমণ ও শিকারের প্রতি তার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল বটে কিন্তু জিহাদের প্রতি ছিল অনীহা। পিতা তাকে সংশোধনের চেষ্টা করেন। তিনি তাকে বাধ্য করে কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাকে দুইবার আমীরুল হজ্জ নিয়োগ করা হয় কিন্তু শিক্ষা স্বভাবের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইয়াযীদের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু মদীনার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চারজন অর্থাৎ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত ইমাম হুসাইন (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাই'আত থেকে বিরত থাকেন। ৫৮ হিজরীতে আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর (রা) ইনতিকাল করেন।এরপর অবশিষ্ট থাকেন তিনজন।এই তিন জনের প্রত্যেকের

---

১. তারীখুল খুলাফা।

২. জামিউল ফাওয়ায়েদ ।

www.amarboi.org

ধর্মীয় ও পার্থিব মর্যাদা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াযীদ সর্বপ্রথম এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করে। তাই সে মদীনার গভর্নর ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যু ও তার সিংহাসনে আরোহণের বিষয় অবহিত করে লিখে যে, এই তিন ব্যক্তি এখনো আমার বাই'আত করেনি। তাদেরকে বাই'আত করতে বাধ্য করো। সে তিনজনের সাথে আলাপ আলোচনা করে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর জবাব দেন ঃ এসব সম্মানিত ব্যক্তি বাই'আত করলে আমিও বাই'আত করবো। আমি নিজে কারো মোকাবিলা করতে যাব না। ইমাম হুসাইন (রা) ও ইবনে যুবায়ের (রা) বাই'আত করতে অস্বীকৃতি জানান। ইবনে যুবায়ের (রা) সেই দিনই মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ইমাম হুসাইন (রা)-ও পরদিন নিজ পরিবার-পরিজন সহ রওয়ানা হয়ে যান। রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজনরা বাধা দেন। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্তই কার্যকরী হয়। তিনি যাত্রা থেকে বিরত হন না।

মক্কায় পৌঁছে ইমাম হুসাইন (রা) শে'বে আবী তালিবে অবস্থান করলেন। মক্কার বাসিন্দা ও অন্যান্য লোকজন দলে দলে এসে পবিত্র খেদমতে হাজির হয়ে বিনীতভাবে সাক্ষাত করতে থাকে। সর্বক্ষণ লোকজনের ভিড় জমে থাকতে লাগলো এবং তাঁকে সমর্থন ও তাঁর জন্য জীবন কুরবানী করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করতে থাকলো।

এদিকে কুফায় আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর খবর পৌঁছলে সুলায়মান ইবনে সারদ খাযায়ীর বাড়ীতে জনগণ সমবেত হয় এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, ইমামতের মসনদ এখন শূন্য। ইয়াযীদের অনুকূলে বাই'আত গ্রহণ ভুল ও অবৈধ। সর্ব বিচারে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই খিলাফতের মসনদের উপযুক্ত। তাঁকে নিয়ে এসে তাঁর হাতে বাই'আত করতে হবে। সুতরাং মক্কায় হযরত হুসাইনের (রা) কাছে প্রায় দেড়শো দাওয়াত পত্র প্রেরণ করা হয়। তাছাড়াও কুফার কিছু সংখ্যক নেতা নিজেরা ইমাম হুসাইন (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর কুফা গমনের জন্য জোর আবেদন জানায়।

সম্মানিত ইমাম (রা) পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য তাঁর চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে আকীলকে কুফায় প্রেরণ করেন এবং তার মাধ্যমে কুফাবাসীদের এ মর্মে জবাব লিখে পাঠান যে, আমি তোমাদের আকাংখা ও মনোভাব উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমি মুসলিম ইবনে আকীলকে প্রেরণ করছি। সে স্বচক্ষে দেখে পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে। যদি আমি বুঝি যে, কুফার আপামর জনসাধারণ সর্বসম্মতভাবে খিলাফত সংস্কারের জন্য আকাঙ্খী তাহলে আমি প্রস্তুত আছি। প্রকৃত সত্য হলো, মুসলমানদের

www.amarboi.org

নেতা হওয়া উচিত এমন ব্যক্তির যিনি আল্লাহর কিতাবের বাস্তব অনুসারী, ন্যায়পন্থী ও দীনের অনুগত।

মুসলিম (রা) কুফায় পৌছে মুখতারের বাড়ীতে অবস্থান করলেন। হযরত আলীর (রা) অনুসারীগণ অবিরাম স্রোতের ন্যায় তাঁর কাছে আসতে থাকে। মুসলিম (রা) তাদেরকে ইমামের পত্র পাঠ করে শোনান। জনগণ তাঁকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। তাঁর কাছে কুফার পরিস্থিতি অনুকূল বলে মনে হয় । তাই তিনি ইমামের পক্ষে বিশ হাজার কুফাবাসীর বাই'আত গ্রহণ করেন এবং ইমামকে (রা) জানিয়ে দেন যেন তিনি কুফায় চলে আসেন।

কুফার গভর্নর নু'মান ইবনে বাশীর সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন আপোষকামী ও সৎস্বভাবের মানুষ। এই পরিস্থিতিতে তিনি মোটেই কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। এ অবস্থা সম্পর্কে জানার পর ইয়াযীদ তার পিতার বিশ্বস্ত উপদেষ্টা খৃস্টান সার্জুনের পরামর্শে নু'মান ইবনে বাশীরকে অপসারণ করে বসরার গভর্ণর ইবনে যিয়াদকে একই সাথে কুফারও গভর্ণর নিয়োগ করেন এবং কুফায় গিয়ে মুসলিম ইবনে আকীলকে (রা) হত্যা করার নির্দেশ দেন। ইবনে যিয়াদ এই সময় কতকটা ইয়াযীদের কোপানলে পতিত ছিল।

এদিকে ইমাম হুসাইন (রা) মক্কায় মুসলিমের পত্র পেয়ে কুফা যাওয়ার সংকল্প করলেন। শুভাকাঙ্খীগণ বিশেষ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে উমর (রা) তিনি যাতে সেখানে না যান সেজন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। তারা বললেন ঃ ইরাকের লোকেরা বিশ্বাসঘাতক, আপনি সেখানে যাবেন না। বরং এখানেই থেকে যান। আপনি হিজাযবাসীদের ধর্মীয় নেতা ও সরদার। আপনি কোথাও যেতে চাইলে ইয়ামানে যান। সেখানে আপনার পিতার অনেক একনিষ্ঠ সমর্থক ও সাহায্যকারী আছে। আপনার পিতার মাধ্যমেই ইয়ামানে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) কারো উপদেশ গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন ঃ ইয়ামানের পক্ষ থেকে কোন আহবান আসেনি। আর এখানে থাকতে চাই না এ কারণে যে, আমি আমার পিতার মাধ্যমে নানাজির একটি হাদীস শুনেছি যাতে বলা হয়েছে, পবিত্র হারামের এক অপদার্থ হারাম শরীফের মর্যাদাহানির কারণ হবে। আমি সেই অপদার্থ হতে চাই না। অতপর তিনি সেই সব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে ক্রন্দনরত রেখে কুফার দিকে যাত্রা করলেন।

কুফার নতুন গভর্নর ইবনে যিয়াদ ইমাম হুসাইন (রা)-এর পূর্বেই কুফা পৌছে যায়। তার তরবারির সামনে সবাই অসহায় হয়ে পড়ে। কুফাবাসীরা

www.amarboi.org

তাদের অভ্যাস মত গাদ্দারী করে বসে। ইবনে যিয়াদ মুসলিম ইবনে আকীল (রা)-কে গ্রেফতার করে শহীদ করে এবং তার মস্তক ইয়াযীদের দরবারে পাঠিয়ে দেয়। এরপর ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদকে নিম্নোক্ত ভাষায় পয়গাম পাঠায় ঃ

"আমি জানতে পেরেছি যে, হুসাইন (রা) কুফা অভিমুখে যাত্রা করেছে। এটা তোমার সময়ের, তোমার শহরের ও তোমার ব্যক্তি সত্তার জন্য কঠিন পরীক্ষার বিষয়। এর ওপর তোমার মর্যাদা ও অমর্যাদা নির্ভর করছে। যদি সফল হও তাহলে তোমাকে জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং অধিক পদোন্নতি দেয়া হবে। আর সফল না হলে ক্রীতদাস বানানো হবে এবং আমার পক্ষ থেকে পূর্বের চেয়েও অধিক রোষের শিকার হবে।"[১]

সুতরাং ইবনে যিয়াদ হুর ইবনে ইয়াযীদ তামীমীকে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইমাম হুসাইনকে (রা) অনুসন্ধান করে ঘিরে ফেলার জন্য প্রেরণ করে।

কারবালার ঘটনা ও হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার বেটা হুসাইন (রা) ত্বিফ ভূমিতে (কারবালা) নিহত হবে এবং আমার পরে আমার উম্মত ফিতনায় নিক্ষিপ্ত হবে।"[২]

মোটকথা, এটিই ছিল আল্লাহর ফয়সালা। সম্মানিত ইমাম ৬০ হিজরীর ৮ই যিলহাজ্জ তারিখে তাঁর পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের সাথে নিয়ে মক্কা থেকে কূফার দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে ইরাকের কবি ফারাযদাকের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি বললেন ঃ ইরাকের অধিবাসীদের মন আপনার পক্ষে এবং তরবারি বনী উমাইয়াদের পক্ষে আর ফয়সালা আল্লাহর হাতে।"

ইমাম বললেন ঃ আল্লাহর ফয়সালা যদি আমাদের পছন্দ মাফিক হয় তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া। আর মৃত্যু যদি আমার আকাংখার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাতেও ক্ষতি নেই। কারণ, আমাদের নিয়ত অত্যন্ত পবিত্র।"

---

১. জামউল ফাওয়ায়েদ, তাবারানির বরাতে, পৃষ্ঠা ৩৪। তাছাড়া কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সাথে ইয়াযীদের কি সম্পর্ক ছিল তা বিস্তারিত জানার জন্য মাজমাউয যাওয়ায়েদে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) পত্র দেখুন।

২. জামউল ফাওয়ায়েদ, তাবারানির বরাতে।

www.amarboi.org

তিনি সম্মুখে এগিয়ে চললেন। পথিমধ্যে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মদীনা থেকে আগত তাঁর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরের সাথে সাক্ষাত হলো। মদীনার গভর্নর কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা সনদও তার সাথে ছিল। তিনি তাঁকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন। কিন্তু জবাবে ইমাম বললেন ঃ

"আমি স্বপ্নে নানাজীর সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি আমাকে একটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলাফল যাই হোক না কেন, আমি অবশ্যই তা করবো। আর কাজটি কি সে সম্পর্কে মৃত্যুর পূর্বে আমি কাউকে কিছু বলতে পারি না।[১]

সুবহানাল্লাহ ! প্রেম ও ভালবাসার জগতের নিয়ম-কানুনই ভিন্ন। সেখানে বাহ্যিক কার্যকারণ মোটেই বিবেচ্য নয়।

সাইয়েদেনা হুসাইন (রা) সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। সা'লাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি মুসলিম ইবনে আকীলের (রা) শাহাদাতের খবর পেলেন। বন্ধু-বান্ধব বললেন ঃ আপনাকে আল্লাহর নামের কসম দিয়ে বলছি, আপনি ফিরে চলুন। এখন কুফায় যাওয়া আর যুক্তিসংগত নয়।" কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীলের ভাই ও সন্তানরা ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে ইমামকে সামনে অগ্রসর হতে হলো। যি জাশাম নামক স্থানে উপনীত হলে হুর ইবনে ইয়াযীদ তামীমী তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সৈন্যদের নিয়ে সেখানে পৌঁছলো এবং ইমামের সামনে ছাউনি ফেললো। তখন ছিল যোহরের নামাযের সময়। ইমাম হুসাইন (রা) জামায়াতের সাথে যোহরের নামায পড়লেন। হুর ইবনে ইয়াযীদও তার সৈন্যসহ জামাতে শরীক হলো। নামায শেষে হুরের সৈন্যদলকে সম্বোধন করে ইমাম (রা) বললেন ঃ

"তোমরা আমাকে ডেকে এনেছো। তোমাদের সব পত্র আমার কাছে আছে। এখন যদি তোমরা আমাকে না চাও তাহলে আমি ফিরে যেতে প্রস্তুত আছি।"

জবাবে হুর বললো ঃ আমাদের এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ না আমরা আপনাকে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের হাতে তুলে দেব ততক্ষণ আমরা নিজেরাও ফিরে যাব না এবং আপনাকেও ফিরে যেতে দেব না।" ফলে বাধ্য হয়ে ইমাম হুসাইন ও তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী-সাথীর কাফেলাকে হুরের সাথে রওয়ানা হতে হলো। পথিমধ্যে হুর এ মর্মে ইবনে যিয়াদের পত্র পেল যে, ইমাম হুসাইন ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের এমন একটি স্থানে অবস্থান করাও যেখানে পানি সহজলভ্য নয়।

---

১. ইবনে আসীর, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭

www.amarboi.org

সুতরাং ৬১ হিজরীর ২রা মুহাররাম বৃহস্পতিবার দিন মহান ইমামকে (রা) তাঁর সংগী-সাথীদের সহ এমন এক স্থানে থামানো হয় যা কারবালা নামে খ্যাত। এ স্থান সম্পর্কে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে অবহিত করেছিলেন ঃ

"আপনি হুসাইনকে (রা) ভালবাসেন। কিন্তু আপনার উম্মত তাঁকে এমন এক স্থানে হত্যা করবে যা কারবালা নামে সুপরিচিত।" বর্ণনাকারী বলেন ঃ ইমাম (রা)-কে সেখানে থামতে বলা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন্ জায়গা ? লোকজন বললো ঃ কারবালা। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন, এটা প্রকৃতই কারব (কষ্ট) ও বালা (বিপদ)-এর স্থান।[১]

কারবালায় অবস্থানের দ্বিতীয় দিন يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ এর সত্যতা প্রমাণ করে[২] আমর ইবনে সাদ চার হাজার সৈন্য নিয়ে ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে কারবালায় এসে পৌছে। ইবনে যিয়াদ তাকে রাই ও দায়লামের গভর্নর নিয়োগ করেছিলো এবং সে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। ইতিমধ্যে ইমাম হুসাইনের (রা) ব্যাপারটি সামনে আসে। ইবনে যিয়াদ ইমামের মোকাবিলার জন্য প্রথমে আমর ইবনে সা'দকে কারবালায় যাওয়ার নির্দেশ দান করে। সে অক্ষমতা প্রকাশ করলে ইবনে যিয়াদ তাকে পদচ্যুত করার হুমকি দেয়। রাই-এর গভর্নরীর লোভে ইবনে সা'দ এভাবে দীন ও দুনিয়া উভয়টিই খুইয়ে বসে এবং ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হয়। যদিও সে সর্বদাই চেষ্টা করেছে যাতে ইমামের রক্তের দায়দায়িত্ব তার ওপরে না বর্তায়।

ইমাম (রা) কেন এসেছেন আমর ইবনে সা'দ দূত পাঠিয়ে তা জানতে চাইলো। ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর আগমনের কারণ জানানোর সাথে সাথে একথাও জানিয়ে দিলেন যে, এখন কুফাবাসী যেহেতু আমাকে চাচ্ছে না, তাই আমি মদীনা ফিরে যেতে প্রস্তুত। তোমরা আমার নিকটাত্মীয়, আমাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দাও। একথা শুনে আমর ইবনে সাদ খুশী হয়ে বলে ঃ আল্লাহর শপথ ! আমি নিজেও চাই যেন হুসাইনের (রা) রক্তে আমার হাত

---

১. জামউল ফাওয়ায়েদ তাবারানির বরাতে।

২. আশারায়ে মুবাশ্শারার অন্যতম রুকন হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস একবার তাঁর পুত্র আমরকে সওয়ারীর পিঠে দেখে বলেছিলেন ঃ

اعوذ بالله من شر هذا الراكب

(এই সওয়ারের অনিষ্টকারিতা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪০৮।

www.amarboi.org

রঞ্জিত না হয়। সে ইবনে যিয়াদকে একথা জানিয়ে দিলে ইবনে যিয়াদ নির্দেশ পাঠায় যে, হুসাইনের (রা) নিকট থেকে প্রথমে ইয়াযীদের বাই'আত গ্রহণ করো। তারপর অন্য কোন বিষয় আমরা ভেবে দেখবো। আর যদি সে বাই'আত না করে তবে তার পানি বন্ধ করে দাও।

ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম এভাবে ইয়াযীদের বাই'আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং ইবনে যিয়াদের নির্দেশ মোতাবেক ৬১ হিজরীর ৭ই মুহাররামে ইমাম (রা) ও তাঁর সংগী-সাথীদের পানি বন্ধ করে দেয়া হয়। ফোরাত নদীতে পাঁচশ সৈন্যের পাহারা বসানো হয়। ইমাম (রা) তাঁর ভাই বীর পুরুষ আব্বাস ইবনে আলী (রা)-কে পানি আনতে নির্দেশ দেন। তিনি ত্রিশজন অশ্বারোহী ও ত্রিশজন মশকবাহী সাথে নিয়ে যান এবং জোর করে পানি নিয়ে আসেন।

যুদ্ধ যাতে না হয় সেজন্য ইবনে সাদ শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালান। কিন্তু মুহাররামের ৯ তারিখে ইবনে যিয়াদ শামার যিল জাওশানের মাধ্যমে ইবনে সা'দের নিকট কড়া ভাষায় লিখিত একটি পত্র পাঠান। তাতে লেখা হয় ঃ হয় তুমি হুসাইনের বিরুদ্ধে লড়াই করো, নয় সরে দাঁড়াও। যুদ্ধ না করলে আমি তোমাকে পদচ্যুত করে তদস্থলে শামারকে গভর্নর নিয়োগ করছি। ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে এই হুমকির পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইবনে সাদ ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত আহলে বায়তে নবুওয়াতের এই ক্ষুদ্র কাফেলার বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তিনি সৈন্যদেরকে প্রস্তুতির আদেশ দেন। ইমাম হুসাইন (রা) প্রস্তুতির এই খবর পেয়ে এক রাতের জন্য অবকাশ চান। ইবনে সা'দ তাঁকে অবকাশ দান করেন। সারাদিন ভক্ত অনুরক্তদের সাথে পরামর্শ চলতে থাকে। ইমাম আহলে বায়েতকে সবর ও শোকরের জন্য অসিয়ত করেন। তারপর তিনি মহান রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। সারারাত ব্যাপী প্রভুর কাছে প্রাণের আকুতি নিবেদনে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর সংগী-সাথীগণও সারারাত নামায ও ইসতিগফার এবং বিনীত প্রার্থনায় কাটিয়ে দেন।

শাহাদাতের সকাল

অবশেষে আশুরার ঊষা দিগন্ত-বক্ষ বিদীর্ণ করে আত্মপ্রকাশ করলো এবং সূর্য রক্ত অশ্রুর মালা ছিন্ন করে উদিত হলো। সাইয়েদেনা হুসাইন (রা) ফজরের নামায শেষে তাঁর বাহাত্তর জন জানকবুল সংগী নিয়ে ময়দানে হাজির হলেন। দক্ষিণভাগে যুবায়ের ইবনে কায়েসকে এবং বাঁ দিকে হাবীব ইবনে

www.amarboi.org

মুহাযিরকে নিয়োগ করলেন এবং আব্বাস ইবনে আলী (রা)-কে পতাকার দায়িত্ব প্রদান করলেন। ইমাম (আ) নিজের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দোয়া করলেন এবং ইতমামে হুজ্জত বা শেষকথা বলার জন্য কুফাবাসীদেরকে নিম্নোক্তভাবে সম্বোধন করলেন ঃ

"হে জনগণ, একটু থামো, আমার কথা শোন। আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে চাই। যদি তোমরা তা মেনে নাও তবে তোমাদের চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। আর যদি না মান, সেটাও তোমাদের ওপর নির্ভর করে। বিষয়টির সবদিক সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের যা ইচ্ছা করবে। আমি গোটা বিষয়টাকে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। হে জনগণ, চিন্তা করে দেখ, আমি কে ? আরো চিন্তা করে দেখো, আমাকে হত্যা করা এবং আমার অমর্যাদা করা তোমাদের জন্য জায়েয কিনা ? আমি কি তোমাদের নবীর (সা) নাতী নই ? আমি কি তাঁর চাচাত ভাই আলীর (রা) পুত্র নই ? সাইয়েদুশ শুহাদা হামযা (রা) কি আমার পিতার চাচা ছিলেন না ? জাফর তাইয়ার শহীদ (রা) কি আমার চাচা ছিলেন না ? আমাদের দুই ভাই সম্পর্কে কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীস নয় যে, হাসান ও হুসাইন (রা) বেহেশতের যুবকদের নেতা ?

শোন, তোমরা আমাকে ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিমে নবীর (সা) আর কোন দৌহিত্র পাবে না। তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও কেন ? আমি কি তোমাদের কারো রক্তপাত ঘটিয়েছি ? তোমাদের কারো অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করেছি ? তোমাদের কাউকে কি আহত করেছি ? এরপর তিনি কুফার কিছু সংখ্যক নেতার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন এবং জিজ্ঞেস করতে থাকলেন, তোমরা কি আমাকে পত্র পাঠিয়ে ডেকে আননি ? এতে সেই সমস্ত লোক নেতিবাচক জবাব দিয়ে দিলে তিনি বললেন ঃ তোমরা অবশ্যই আমাকে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছো। এখন আমার আগমন যদি তোমাদের কাছে মনঃপূত না হয়ে থাকে তাহলে আমাকে আমার আশ্রয় স্থলে ফিরে যেতে দাও।

কুফাবাসীদের মধ্য থেকে একজন বললো ঃ আপনি ইবনে যিয়াদের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন না কেন ? মহান ইমাম (রা) জবাব দিলেন ঃ

আল্লাহর শপথ ! আমি নীচ প্রকৃতির মানুষদের মত দুষমনের হাতে হাত দিতে পারি না এবং ক্রীতদাসদের মত তাদের দাসত্ব মেনে নিতে পারি না। যারা কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না সেইসব অহংকারীদের থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

www.amarboi.org

কুফাবাসীদের ওপর ইমাম হুসাইন (রা)-এর এই বক্তৃতার কোন প্রভাব পড়লো না। তবে হুর ইবনে ইয়াযীদ তামীমী ধীরে ধীরে অশ্ব চালিয়ে এগিয়ে আসলেন এবং নিকটে আসার পর দ্রুত অশ্ব চালিয়ে অগ্রসর হয়ে আহলে বায়েতের বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন এবং ইমাম হুসাইনকে (রা) বললেনঃ হে রাসূলের সন্তান, আমি সেই ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম আপনাকে বাধা দিয়েছে। আমার কওম এতটা দুর্ভাগা তা আমার জানা ছিল না। এখন আমি আপনার পদপ্রান্তে হাজির। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে আপনার প্রতি বন্ধুত্বের হক আদায় করবো। আমার এ কাজ কি আমার পূর্বকৃত গোনাহর কাফ্ফারা হিসেবে যথেষ্ট হবে ?"

হযরত ইমাম খুশী হয়ে বললেন ঃ "হে হুর, অবশ্যই হবে। দুনিয়াতে তোমার নাম হুর[১]। আখিরাতেও তুমি দোযখের আযাব থেকে স্বাধীন ও মুক্ত থাকবে।" হুর তার কওমকে উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্ত ভাষায় বক্তব্য পেশ করলোঃ

হে আমার কওম, ইমাম হুসাইন (রা)-এর প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি তরবারি উত্তোলনের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করো, তা কি সম্ভব নয় ?

আমর ইবনে সাদ বললেন ঃ আমি তো তা মানতে প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু এখন বিষয়টি আমার এখতিয়ারের বাইরে।" এরপর কুফাবাসীদের পক্ষ থেকে একটি তীর নিক্ষেপ করা হলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

প্রথমে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শুরু হয়। উভয় পক্ষ থেকে এক একজন লোক সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হতো। কিন্তু এভাবে কুফাবাসীরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উমায়ের কালবী যুবায়ের ইবনে খুদায়ের, হুর ইবনে ইয়াযীদ তামীমী এবং নাফে ইবনে হিলাল তাদের প্রতিদ্বন্দীদেরকে গাজর মূলার মত কাটতে থাকেন। এ অবস্থা দেখে শত্রু সৈন্যরা একযোগে আক্রমণ করে বসে এবং ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আহলে বায়েতের মুষ্টিমেয় জানবাজ বিপুল সংখ্যক কুফাবাসী সৈন্যকে পরাভূত করে ফেলে। হযরত হুসাইন (রা)-এর বাহিনীর বীর সৈনিকগণ যেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন সেদিকেই শত্রুর ব্যূহকে তছনছ করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু দুই পক্ষের সংখ্যা শক্তির মধ্যে কোন তুলনা করাই সম্ভব ছিল না। দুপুর হতে না হতেই ইমামের (রা) সমস্ত সংগী-সাথী তাঁর জন্য পতঙ্গের ন্যায় জীবন কুরবানী করলেন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

এরপর পালা আসলো আহলে বায়েতের যুবকদের। আলী আকবর ইবনে হুসাইন (রা), কাসেম ইবনে হুসাইন (রা), আবু বকর ইবনে হাসান (রা),

১. অর্থাৎ স্বাধীন—অনুবাদক

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম (রা), আদী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা), আবদুর রহমান ইবনে আকীল (রা), মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (রা) প্রমুখ তাঁদের তরবারির ঝলক দেখিয়ে জান্নাতের যুবকদের নেতা হুসাইনের (রা) জন্য জীবনের কুরবানী পেশ করলেন। তাঁদের মধ্যে শুধু হযরত ফাতেমা যাহরার (রা) সন্তান ও নাতীই ছিলেন ষোলজন। শেষ পর্যন্ত হযরত ইমাম হুসাইনের পাশে তাঁর চার ভাই আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ (রা), জাফর (রা) এবং উসমান (রা) ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকলেন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা সবাই প্রতিটি আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করতে থাকলেন। কিন্তু শেষ অবধি তাঁরাও এক এক করে জান্নাতের পথে চির বিদায় গ্রহণ করলেন।

এবার রইলেন অসংখ্য জখমে ক্ষতবিক্ষত পিপাসায় কাতর ইমাম হুসাইন (রা) একা। কিন্তু তাঁর বীরত্ব, উদ্দীপনা ও সাহসিকতায় কোন ভাটা পড়েনি। তাঁর তরবারি যেদিকেই ঝলসে উঠছিলো সেদিকেই শত্রুরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছিলো। অবশেষে তিনি অসংখ্য জখমে কাতর হয়ে মাটির ওপর বসে পড়লেন এবং দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। কিন্তু শেরে খোদা আলী (রা)-এর আহত এই সন্তানের ওপর আক্রমণ করার দুঃসাহস কারো হলো না। নিজের দুর্ভাগ্যের ওপর তাঁর রক্তে শেষ মোহর অংকিত করা থেকে প্রত্যেকেই পাশ কাটিয়ে চলছিলো। অবশেষে শামার চিৎকার করে বললো ঃ এখন কিসের জন্য অপেক্ষা করছো, হত্যা করছো না কেন ?" হযরত ইমাম (রা) তাঁর শুষ্ক ঠোঁটে পানির পেয়ালা লাগিয়েছেন মাত্র, ঠিক সেই মুহূর্তে হুসাইন ইবনে নুমায়ের তাক করে তীর নিক্ষেপ করে। তীর তাঁর কণ্ঠে বিদ্ধ হয়। তিনি নদীর দিকে অগ্রসর হতে থাকলে শত্রুরা চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যারা'আ ইবনে শারীক তামীমী তরবারি দ্বারা আঘাত করে এবং সানান ইবনে আনাস নাখয়ী বর্শার আঘাতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তরবারি দিয়ে মাথা কেটে পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাঁর পবিত্র দেহে তেত্রিশটি বর্শার এবং ত্রিশটি তরবারির আঘাতের চিহ্ন ছিল। এ ছাড়াও ছিল তীরের আঘাতের চিহ্ন। তাঁর শাহাদাতের পর জালেমরা আহলে বায়েতের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানে যেসব মালামাল ছিল লুট করে নেয়। এমনকি মেয়েদের বস্ত্র পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়। ইমাম হুসাইনের পুত্র যায়নুল আবেদীন (রা) অসুস্থ অবস্থায় তাঁবুতে শুয়ে ছিলেন। শামার তাঁকেও শহীদ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু আমর ইবনে সা'দ নির্দেশ দেন যে, মেয়েদের তাঁবুতে প্রবেশ করবে না এবং শিশুদেরকে আঘাত করবে না। মহান

www.amarboi.org

ইমামের শাহাদাতের এই মহাদুর্ঘটনা ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররাম সংঘটিত হয়। রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরদাহু।

সালমা আনসারিয়া বলেন ঃ সেই দিনই আমি মদীনায় উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামার (রা) কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি কাঁদছেন। আমি বললাম ঃ কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন ঃ আমি এইমাত্র স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। তাঁর মাথা এবং পবিত্র দাড়ি ধূলামলিন এবং তিনি কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, কি হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ এইমাত্র হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আসছি। (তিরমিযী)

পরদিন আহলে গাদেরিয়া সাইয়েদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইন (রা) ও অন্যান্য শহীদদের মস্তকবিহীন লাশ জানাযার পরে দাফন করে। শত্রুরা সকল শহীদের মাথা বর্শাগ্রে গেঁথে নিয়ে যায়।[১]

আহলে বায়েতের কাফেলাকে বন্দী হিসেবে ইবনে যিয়াদের কাছে পৌছানো হয় এবং মহান শহীদদের মাথাগুলো তার সামনে পেশ করা হয়। মাথাগুলো পেশ করার সময় সানান ইবনে নাখয়ী এই কবিতাটি পাঠ করে ঃ

املاء ركابى فضة وذهبا- انى قتلت السيد المحجبا

قتلت خير الناس ابا واما- و خيرهم اذ يذكرون نسبا

"স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে আমার সওয়ারী পূর্ণ করে দাও। কারণ, আমি সৌন্দর্যমন্ডিত একজন নেতাকে হত্যা করেছি। আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি যিনি পিতামাতা উভয় দিক থেকেই উত্তম এবং উত্তম বংশজাত যাদের নাম স্মরণ করা হয় তাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"

ইমামের (রা) এই প্রশংসা শুনে ইবনে যিয়াদ ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সানান ইবনে নাখয়ীর মাথা কেটে ফেলে। এভাবে হযরত হুসাইনের (রা)-এর খুনী অনতিবিলম্বে তার উপযুক্ত পরিণতি লাভ করে।[২]

অতপর ইবনে যিয়াদ ভরা দরবারে ইমাম হুসাইনের (রা) পবিত্র দাঁত ছড়ি দিয়ে খটখটায়। সেখানে সাহাবা যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইবনে যিয়াদের এই বে-আদবী বরদাশত করতে পারলেন না। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! আমি নিজ চোখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ ঠোঁটে চুমু খেতে দেখেছি। বে-আদবী করিস না। একথা

১. ইবনে আসীর।
২. নূরুল আবছার, পৃষ্ঠা—১১৮

www.amarboi.org

বলে তিনি চরম আবেগে কেঁদে ফেললেন। ইবনে যিয়াদ বললো ঃ যদি তুমি জ্ঞান হারিয়ে না ফেলতে তাহলে আমি তোমার শিরচ্ছেদ করতাম। একথা শুনে হযরত যায়েদ (রা) বদদোয়া করে মজলিস থেকে উঠে গেলেন।[১]

ইবনে যিয়াদ এবার ইমাম হুসাইনের (রা) একমাত্র স্মৃতি যায়নুল আবেদীন (রা)-কে হত্যা করার নির্দেশ দিলে যায়নাব বিনতে আলী (রা) আর্তচিৎকার করে উঠলেন এবং বললেন ঃ হে ইবনে যিয়াদ আমাদের খান্দানের বহু মানুষকে হত্যা করেছিস। আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি তাঁকে হত্যা করতে চাইলে প্রথমে আমাকে হত্যা কর।

এই আর্তচিৎকারে অসুস্থ আবেদের জীবন রক্ষা পায়।[২] ইবনে যিয়াদ আহলে বায়েতের বন্দীদের এবং শহীদদের মাথাগুলো শামারের তত্ত্বাবধানে দামেশকে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। অসুস্থ আবেদের (রা) গলায় জিঞ্জির ও হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হয়। এভাবে এই কাফেলা ও শহীদদের মস্তক ইয়াযীদের কাছে পৌছে।

ইয়াযীদ সম্ভাব্য গুরুতর পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে অবিলম্বে দরবারে আম তলব করে। তাঁর সামনে ইমাম হুসাইন (রা)-এর পবিত্র মস্তক রাখা হয় এবং বক্তৃতায় শামার নিজের ও তার সঙ্গীসাথীদের কর্মকান্ড গর্বের সাথে বর্ণনা করলে ইয়াযীদ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে বলে ঃ

"হুসাইনকে (রা) হত্যা করা ছাড়াই আমি তোমার আনুগত্যে সন্তুষ্ট ছিলাম। তুমি হুসাইন (রা)-কে হত্যা না করলে আমি তোমার প্রতি খুশী হতাম। ইবনে মারজানার (ইবনে যিয়াদ) ওপর আল্লাহর লা'নত। খোদার কসম ! তার অবস্থানে আমি থাকলে হুসাইন (রা)-কে ক্ষমা করে দিতাম। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত নাযিল করুন।[৩]

একথা বলে ইয়াযীদ হুসাইনের (রা) হন্তাদেরকে পুরস্কৃত না করেই বহিষ্কার করে। ইবনে যিয়াদের মত ইয়াযীদও দরবারে বসে হুসাইনের (রা) পবিত্র দাঁত ছড়ি দিয়ে খটখটাতে থাকে এবং নীচের কবিতাটি আবৃত্তি করে ঃ

ابى قومنا ان ينصفونا وانصفت : قواضب فى ايماننا تقطر الدماء
يفلقن هاما من رؤس اعزة : علينا وهم كانوا اعق و اظلما

"আমাদের কওম ইনসাফ করতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু আমাদের দক্ষিণ হস্তে ধারণকৃত তরবারি ইনসাফ করেছে যা থেকে এখনো রক্ত ঝরছে।

---

১. তাবকাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৭।
২. তারীখুল খুলাফা।
৩. নূরুল আবছার ও আখবারুত তিওয়াল পৃষ্ঠা—১৫৮।

www.amarboi.org

যারা আমাদের প্রতি কঠোর সেইসব নেতাদের মুকুট বিদীর্ণ করে ফেলেছে আমাদের হাতের তরবারি। যেহেতু তারা ছিল চরম জালেম ও অত্যাচারী।"

এখানেও সাহাবী আবু বুরদা আসলামী (রা) উপস্থিত ছিলেন। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ইবনে যিয়াদকে যা বলেছিলেন তিনিও ইয়াযীদকে তাই বললেন এবং মজলিস থেকে উঠে গেলেন।[১]

এরপর ইয়াযীদ দরবারের লোকদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে ঃ তোমরা জান, এ দুর্ঘটনা কেন সংঘটিত হয়েছে। হুসাইন (রা) বলেছিলন ঃ আমার পিতা আলী (রা) ইয়াযীদের পিতা থেকে উত্তম। আমার মা ফাতেমা যাহ্‌রা (রা) তার মার চেয়ে উত্তম, আমার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নানার চেয়ে উত্তম এবং আমি নিজে তার চেয়ে উত্তম, তাই খিলাফতের অধিক হকদার। পিতার সম্পর্কে বলতে গেলে বলবো ঃ আমার ও তাঁর পিতার বিষয় আল্লাহর সামনে পেশ হয়েছে। কিন্তু দুনিয়াতে ফায়সালা হয়েছে আমার পিতার অনুকূলে। হাঁ, তাঁর মা আমার মা অপেক্ষা উত্তম এবং তাঁর নানা আমার নানা অপেক্ষা উত্তম। এটাই সব মুসলমানের আকীদা-বিশ্বাস। অবশ্য হুসাইন (রা) বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেননি এবং কুরআনের এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করেননি قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ [২] "তুমি বলো, হে আল্লাহ, বাদশাহীর অধিপতি, তুমি যাকে ইচ্ছা শাসন ক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নাও।" আল্লাহই ভাল জানেন, এগুলো ইয়াযীদের মনের কথা না শুধুমাত্র মৌখিক জমাখরচ, আর তার অশ্রু দুঃখ ও অনুশোচনার অশ্রু, না রাজনৈতিক অশ্রু ? হযরত ইউসুফের (আ) ভাইয়েরাও অশ্রুপাত করেছিল। وَجَاءُوْا اَبَاهُمْ عِشَاءً يَّبْكُوْنَ ○ (তারা সন্ধ্যাকালে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে হাজির হলো।—সূরা ইউসুফ)

এ সম্পর্কে কাজী সানাউল্লাহ পানিপথির উক্তি শুনুন ঃ বর্ণিত হয়েছে যে, যেদিন হুসাইন আলাইহিস সালামকে শহীদ করা হয় সেদিন ইয়াযীদ নিম্নবর্ণিত এই কবিতাটি গর্বের সাথে পড়েছিল। কবিতাটির সারমর্ম হলো, আজ মুহাম্মাদের বংশধরদের নিকট থেকে দ্বিতীয় বদরের দিনের প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। কবিতাটি হলো ঃ

---

১. নূরুল আবছার, পৃষ্ঠা—১১৯ ও জামউল ফাওয়ায়েদ।

২. ইবনুল আসীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৩৫;

www.amarboi.org

وَلَسْتُ مِنْ جُنْدُبٍ اِنْ لَمْ اَنْتَقِمْ : مِنْ بَنِى اَحْمَدَ مَا كَانَ قَدْ فَعَلَ

"আহমদ (সা)-এর সন্তানরা যা করেছে সে জন্য আমি যদি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করি তাহলে আমি জুনদুবের অন্তর্ভুক্ত নই।"

আর মদকে হালাল গণ্য করে সে এই কবিতা পড়ে ঃ

فَاِنْ حَرَّمَتْ يَوْمًا عَلَى دِيْنِ اَحْمَدَ رضـ : فَخُذْ هَا عَلَى دِيْنِ مَسِيْحِ بْنِ مَرْيَمِ-

"একদিন যদি তুমি মদকে হারাম মনে করে করো আহমদ (স)-এর দীনের বিধান অনুসারে তাহলে অন্য একদিন মাসীহ্ ইবনে মারইয়ামের (ঈসা আ) দীন অনুসারে গ্রহণ করবে।"

আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদেরকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে গালি দিলো। এই গোমরাহীর মধ্যে ডুবে থাকতে তাদেরকে বহু দিন অবকাশ দেয়া হলো। এরপর মহান আল্লাহ তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। যেমন ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়ার হন্তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তাদের একজনও অবশিষ্ট ছিল না। বর্ণিত আছে যে, ইমাম হুসাইনের (রা) পবিত্র মস্তক ইয়াযীদের সামনে পেশ করা হলে একটি গীর্জা থেকে একদল লোক বেরিয়ে আসলো। সেই গীর্জার গায়ে লেখা ছিল ঃ

اَتَرْجُوْ اُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنًا : شَفَاعَةَ جَدِّهٖ يَوْمَ الْحِسَابِ-

"যেসব লোক হুসাইন (রা)-কে হত্যা করেছে তারা কি কিয়ামতের দিন তাঁর নানার (সা) শাফায়াত আশা করতে পারে?"

এই কবিতাংশ কে লিখেছে সে বিষয়ে ঐ পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দেয় যে, প্রাচীনকাল থেকেই এটি লিখিত আছে, কখন কে লিখেছে তা আমি জানি না। মোটকথা, নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে ইয়াযীদের 'কুফর' প্রমাণিত। তাই সে লানতের উপযুক্ত যদিও লানত করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে الحب فى الله والبغض فى الله "ভালবাসা ও শত্রুতা পোষণ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে, হাদীসটি তার প্রতি লানতের দাবী করে।"[১] والله اعلم

বক্তৃতা শেষ করে ইয়াযীদ ইমাম যায়নুল আবেদীনের (রা) হাতকড়া ও জিঞ্জির খুলে দেয়। ইয়াযীদের স্ত্রী ভরা দরবারে উপস্থিত হয়ে ইয়াযীদকে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, এটা কি রাসূলের সাল্লাল্লাহু

১. কালিমাতে তাইয়েবাত, পৃষ্ঠা—১৩৫।

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা ফাতেমার (রা) পুত্রের মস্তক ? ইয়াযীদ জবাব দিল ঃ হাঁ। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্র হুসাইনের (রা) মাথা। তাঁর জন্য বিলাপ করো। আল্লাহ ইবনে যিয়াদকে ধ্বংস করুন। সে তাড়াহুড়া করে তাঁকে হত্যা করেছে।

ইয়াযীদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খান্দানের মেয়েদেরকে তার পরিবারের মেয়েদের সাথে থাকতে দেয়। যেহেতু উভয় পরিবারের মধ্যে বহু পূর্ব থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, তাই ইয়াযীদের পরিবারের সব মহিলা তাদের শোকে শরীক হয় এবং তাদের প্রতি সমবেদনা জানায়। ইয়াযীদ ইমাম যায়নুল আবেদীন (রা)-কে নিয়ে শাহী দস্তরখানে একসাথে খাবার গ্রহণ করতো।

কয়েকদিন সযত্ন মেহমানদারীর পর ইয়াযীদ আহলে বায়েতের কাফেলাকে কিছু জিনিসপত্র দিয়ে একজন বিশ্বস্ত ও সৎ লোকের তত্ত্বাবধানে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়।

ইয়াযীদের সদাচরণ দেখে সাকীনা বিনতে হুসাইন (রা) বেশ মুগ্ধ হন। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহদ্রোহী লোকদের মধ্যে ইয়াযীদের চেয়ে অধিক উত্তম আচরণের লোক দেখিনি।[১]

সামরিক অভিযান

হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের ঘটনায় সমগ্র ইসলামী জগতে চরম অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। এই অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা লাঘব করার জন্য ইয়াযীদ বিজয় অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেয় যাতে গোটা ইস-লামী এলাকার জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়া যায়। সুতরাং ৬১ হিজরীতে সে মুসলিম ইবনে যিয়াদকে খোরাসানের গভর্নর নিয়োগ করে। মুসলিম আমুদরিয়া অতিক্রম করে মাওয়ারাউন নহর এলাকা, সমরখন্দ ও খাজান্দের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং বিজয়ী হন।

৬২ হিজরীতে ইয়াযীদ উকবা ইবনে নাফে'কে আফ্রিকার গভর্নর নিয়োগ করে। তিনি আফ্রিকার সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে সফল সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু এসব বিজয় সত্ত্বেও মানুষের মন থেকে হুসাইনের (রা) শাহাদাতের বেদনাদায়ক ঘটনার স্মৃতি মুছে ফেলা সম্ভব হয় না।

১.ইবনে আসীর, পৃষ্ঠা—৩৫।

www.amarboi.org

হাররার ঘটনা এবং রাসূলের হারাম মদীনায় হত্যা ও লুটপাট

কারবালার ঘটনা নিঃসন্দেহে উমাইয়া ইতিহাসে সর্বাধিক কাল অধ্যায়। হযরত হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত কোন মামুলি ব্যাপার ছিল না। ইয়াযীদের এই কর্মকান্ডের ফলে ইসলামী জগতে অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে হিজায এলাকায় মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) এই ভয়ংকর ঘটনা সম্পর্কে জনসমাবেশে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। এই বক্তব্যে তিনি বলেন ঃ ইরাকবাসীরা অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক ও পাপিষ্ঠ। তারা ইমাম হুসাইন (রা)-কে ডেকে নিয়ে ইবনে যিয়াদের আনুগত্য করতে চাপ সৃষ্টি করেছে। তিনি বাতিলের আনুগত্যে সম্মত হননি। নিজের অসহায়ত্বের কথা জেনেও সম্মানজনক মৃত্যুকে অপমানজনক জীবনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! শত্রুরা এমন এক ব্যক্তিকে শহীদ করেছে যিনি দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতে ইবাদত করতেন। মর্যাদা ও দীনদারীতে তাঁর আসন ছিল সবার উর্ধে। তিনি ইয়াযীদের তুলনায় অনেক অনেক গুণে খিলাফতের হকদার ছিলেন।

ইয়াযীদ সেই ব্যক্তি যে কুরআনের পরিবর্তে গোমরাহীকে, আল্লাহর ভয়ে কান্নার পরিবর্তে গান-বাদ্যকে, রোযার পরিবর্তে মদ্যপানকে এবং মজলিসে বসে আল্লাহর স্মরণের পরিবর্তে শিকারী কুকুরকে স্মরণ করা অধিক পসন্দ করে।

মোদ্দাকথা, মক্কায় ইয়াযীদের কর্তৃত্ব খতম হয়ে যায়। সেখানকার শাসন ক্ষমতা আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের হাতে চলে আসে। হযরত হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের পর মদীনা শরীফেও চরম অসন্তোষ-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ৬২ হিজরীতে মদীনার গভর্নর উসমান ইবনে মুহাম্মাদ মদীনার বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন গাসীলুল মালায়েকা হযরত হানযালার পুত্র আবদুল্লাহ্। তারা ইয়াযীদের দরবারে পৌঁছলে তাদের যথেষ্ট সমাদর ও আপ্যায়ন করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু এই দান-দক্ষিণা ইয়াযীদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। এসব ব্যক্তিবর্গ স্বচক্ষে তাঁর অইসলামী আচার-আচরণ দেখে আরো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মদীনায় এসে জনসমক্ষে তা নিম্নবর্ণিতভাবে প্রকাশ করে দেয় ঃ

আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে আসছি যার দীনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। মদ্যপান, গান-বাজনা এবং ভ্রমণ ও শিকার হচ্ছে তার সবচেয়ে

www.amarboi.org

প্রিয় কাজ। চরিত্রহীন লোকদের সাহচর্য তার কাছে অতি প্রিয়। আমরা তার বাইয়াত ভঙ্গ করছি। আমরা তার দেয়া অর্থ-সম্পদ তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কাজে ব্যয় করবো।

অতপর মদীনাতেও ইয়াযীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ ও গোলাযোগ দেখা দেয়। মদীনার জনগণ মদীনার গভর্নর উসমান ইবনে মুহাম্মাদকে অপসারণ করে আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাকে তাদের গভর্নর বানিয়ে নেয়। মদীনাবাসী উমাইয়ারা ইয়াযীদকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। ইয়াযীদ হিজাযের প্রাক্তন গভর্নর উমর ইবনে সাইদকে সৈন্য নিয়ে মদীনায় যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সাইদ অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে যে, এখন আমি কুরাইশদের রক্তপাত ঘটানোর জন্য সেখানে যাব না। ইয়াযীদ পত্র প্রেরণ করে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে সৈন্য নিয়ে মদীনায় যাওয়ার নির্দেশ দান করে। কিন্তু সেও যেতে সম্মত হয় না, বরং জবাবে জানিয়ে দেয় যে, আমি ইয়াযীদের জন্য নবীর সন্তানের হত্যা এবং হারামাইনের অমর্যাদার মত দুটি বড় গোনাহকে একত্র করবো না। অবশেষে এই দুষ্কর্মের পালা পড়ে মুসলিম ইবনে উকবার ওপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের কষ্ট দেবে আল্লাহ তাকে কষ্ট দেবেন। তার প্রতি আল্লাহর লানত, ফেরেশতা এবং গোটা মানবকুলের লানতও তার ওপর। আল্লাহর কাছে তার কোন নেককাজ গৃহীত হবে না।[১]

আহলে বায়তে নবুওয়াতের রক্ত নিয়ে খেলার পর ইয়াযীদ মদীনাবাসীদের রক্তপাত এবং হারামে নববী মদীনা মুনাওয়ারার অমর্যাদা করা থেকে বিরত থাকবে কেন ? সে মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে বার হাজার সিরীয় সৈন্য প্রেরণ করে প্রথমে মদীনা এবং পরে মক্কার ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেয়।

মুসলিম হাররা এলাকার দিক থেকে মদীনা অবরোধ করে এবং ইয়াযীদের আনুগত্য গ্রহণের আহবান জানিয়ে তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দেয়। তিন দিনের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মদীনাবাসী ইয়াযীদের বাই'আত করতে অস্বীকৃতি জানালে মুসলিম মদীনার ওপর আক্রমণ চালায়। তুমুল যুদ্ধ হয়। মদীনাবাসীগণ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। কিন্তু এত বড় সুসংগঠিত একটি সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার সাধ্য তাদের ছিল না। মদীনাবাসীগণ পরাজিত হয় এবং বহু লোক শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিম মদীনাতে লুটপাট চালানোর নির্দেশ দেয়। তিন দিন পর্যন্ত ব্যাপক গণ

১. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪৮।

www.amarboi.org

হত্যা, লুটপাট ও ধর্ষণ চলতে থাকে। মসজিদ ও ধর্মীয় স্থানসমূহের অমর্যাদা করা হয়। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে নামায বন্ধ থাকে এবং সেখানে ঘোড়া বাঁধা হতে থাকে। যে পবিত্র শহর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সর্বপ্রথম আশ্রয় দিয়েছিলো খুন-খারাবি, লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করা হয়। ৩৬০ জন বিশিষ্ট কুরাইশ ও আনসারী সাহাবাকে হত্যা করা হয়। তাঁদের ছাড়াও আরো হাজার হাজার মুসলমান নিহত হন। যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে ইয়াযীদের বংশবদ হতে বাধ্য করা হয়। কেবলমাত্র আহলে বায়তে নবুওয়াত অর্থাৎ আলী (রা)-এর পরিবার ও আব্বাস (রা)-এর পরিবার এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। তাছাড়া গোটা মদীনাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ৬৩ হিজরীর ২৮শে যিলহাজ্জ এ ঘটনা সংঘটিত হয়। মদীনাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পর মুসলিম ইবনে উকবা মক্কা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু যমদূত আজরাইল পথিমধ্যেই তার ঘাড় মটকিয়ে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিই মদীনাবাসীদেরকে প্রতারিত করবে ও কষ্ট দেবে তাকে এমনভাবে নিঃশেষিত করা হবে যেমন লবণ পানিতে গুলে নিঃশেষ হয়ে যায়।[১]

তার পরিবর্তে হুসাইন ইবনে নুমায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং ৬৪ হিজরীর ২৬শে মুহাররাম মক্কা অবরোধ করে। প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) মক্কার বাইরে গিয়ে সিরীয়দের মোকাবিলা করেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাঁর ভাই মুনযির ইবনে যুবায়ের (রা) শহীদ হন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) মক্কায় অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হন। মাঝে মধ্যেই দু'টি সেনাদলের মধ্যে যুদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু মক্কা বিজিত হয় না। অবশেষে হুসাইন ৬৪ হিজরীর ৩রা রবিউল আউয়াল মিনজানিক দ্বারা খানায়ে কাবার ওপর পাথর বর্ষণ শুরু করে। এতে খানায়ে কাবার ইমারত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাতে আগুনও লেগে যায়। এ অবস্থা চলাকালীন সময়ে সিরিয়া থেকে ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ আসে এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইয়াযীদের মৃত্যু

৬৪হিজরীর ১৪ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৮৮৩ খৃস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর ইয়াযীদের জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। সে তিন বছর ছয় মাস চৌদ্দ দিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

১. বুখারী শরীফ। মুসলিম ইবনে উকবার পরিণতি জানার জন্য দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ। অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা-

www.amarboi.org

থাকে। মৃত্যুর পূর্বে সে তার দুই পুত্র মুয়াবিয়া ও খালেদকে যথাক্রমে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিয়োগ করে।

ইয়াযীদের কুকীর্তি

ইয়াযীদের জীবনের নিম্ন বর্ণিত তিনটি কুকীর্তি ইতিহাস কখনো ভুলতে পারবে না ঃ

১. ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকান্ড।

২. মদীনা মুনাওয়ারার মর্যাদাহানি ও লুটপাট।

৩. মক্কা মুয়াযযামার অমর্যাদা ও বায়তুল্লাহর ওপর পাথর বর্ষণ।

www.amarboi.org

৩. মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদ

৬৪ হিজরী

ইয়াযীদের মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তার পুত্র মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদ দামেশকের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তখন তার বয়স ছিল ২১ বছর। ইয়াযীদের শাসনকালে উমাইয়া হুকুমত যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের রক্তপাতে কলঙ্কিত হয়েছিলো তাই দ্বিতীয় মুয়াবিয়া এই সিংহাসনে আরোহণ পসন্দ করলেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পিতার বিপরীত চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন নেক মেজাজ ও দীনদার। বাই'আতের মাত্র চল্লিশ দিন পরই তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। ক্ষমতা ত্যাগের সময় তিনি নিম্নরূপ বক্তৃতা করেছিলেন ঃ

হে জনগণ, যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আত্মীয়তা, ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, জ্ঞান ও মর্যাদা এবং তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে আমার দাদা আমীর মুয়াবিয়া অপেক্ষা খিলাফতের অধিক হকদার ছিলেন আমার দাদা আমীর মুয়াবিয়া (রা) শত্রুতামূলকভাবে তাঁর মোকাবিলা করেছেন। আমি হযরত আলী (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করছি। আমার দাদা তোমাদের শক্তি ও সমর্থনের জোরে এসব করেছেন এবং নিজের পথে চলে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার পিতা ইয়াযীদ খিলাফত লাভ করেন। অথচ তিনি খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলেছেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে বেশীদিন অবকাশ দেয়নি। অবশেষে তিনি তাঁর গোনাহর বোঝা মাথায় নিয়ে কবরে পৌছে গিয়েছেন।[১] তাঁর খারাপ পরিণতি আমার জন্য সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খান্দানের লোকদের শহীদ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হারামে হত্যা ও রক্তপাত ঘটিয়েছেন, কাবার অমর্যাদা ও তাঁর ক্ষতি করেছেন। আমি এতবড় বোঝা বহন করতে পারি না। পরামর্শ করে অন্য কাউকে খলিফা মনোনীত করে নাও।[২]

গোটা বনী উমাইয়া গোষ্ঠী আবেদন জানায় যে, আপনি নিজে আপনার পরিবর্তে কাউকে খলিফা নির্বাচিত করে দিন। জবাবে মুয়াবিয়া বললেন ঃ

---

১. এটা ছিল ইয়াযীদ সম্পর্কে তার পুত্রের ধারণা। কোন এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের খিলাফতকালে ইয়াযীদকে আমীরুল মু'মিনীন বলায় তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং সেই ব্যক্তিকে বিশটি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন। (তারীখুল খুলাফা)

২. হায়াতুল হায়ওয়ান।

www.amarboi.org

ভাইসব, এখন আমাদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাবের মত ব্যক্তিত্ব নেই যে, বিনা দ্বিধায় তাঁকে মনোনীত করবো। কিংবা পূর্বের মত মজলিসে শুরাও নেই যে, তার সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবো। অতএব নিজেদের ব্যাপার তোমরা নিজেরাই সামলাও এবং যাকে ইচ্ছা খলিফা মনোনীত করে নাও।

সিংহাসন ত্যাগ করার পর মুয়াবিয়া তার নিজ ঘরে এমনভাবে নিভৃতে বাস করতে থাকেন যে, তিন মাস পর সেখান থেকে তার লাশ বের হয়। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় বিষ প্রয়োগ এবং কোন কোনটিতে হত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বনী উমাইয়ারা মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদের এই মানসিক পরিবর্তনের জন্য তাঁর গৃহশিক্ষক উমর আল মাকসুসকে অভিযুক্ত করে তাকে জীবন্ত দাফন করে।

মুয়াবিয়া খান্দানকে যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য আমীর মুয়াবিয়া (রা) ২৫ বছর ধরে তাঁর সমস্ত শক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যয় করেছিলেন এবং ইয়াযীদ জুলুম-নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলো মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদের মৃত্যুর সাথে সাথে তা চিরদিনের জন্য খতম হয়ে যায়।

ইয়াযীদের মৃত্যুর সাথে সাথে হিজাযে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের (রা) শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানকার জনগণ তাঁর আনুগত্য শপথ গ্রহণ করে। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) নিজে মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন এবং তাঁর ভাই উবায়দুল্লাহকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন। উমাইয়া বংশোদ্ভূত সমস্ত লোক মদীনা থেকে সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। মিসর, কুফা এবং বসরায়ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐসব জায়গাতেও তাঁর গভর্নররা পৌঁছে যায়। ইবনে যিয়াদ কুফা থেকে পালিয়ে সিরিয়ায় চলে যায়।

মক্কা অবরোধকারী হুসাইন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে সন্ধি করে এবং তাঁকে অভিযান চালিয়ে সিরিয়া অধিকার করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু ইবনে যুবায়ের (রা) তার এ পরামর্শ গ্রহণ করেন না এবং মক্কার বাইরে কোথাও যেতে প্রস্তুত হন না। হুসাইন তার সৈন্যসহ সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে।

দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার সিংহাসন ত্যাগের ফলে সিরিয়ার ক্ষমতার মসনদ শূন্য ছিল। সেখানেও মানুষের আগ্রহ ছিল ইবনে যুবায়ের (রা)-এর প্রতি। কিন্তু ইতিমধ্যেই উমাইয়া গোষ্ঠীর সবাই এবং তাদের ভক্ত ও অনুগত লোকজন সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলো। মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইবনে যিয়াদের পরামর্শে

www.amarboi.org

মারওয়ান নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বাই'আত গ্রহণ করে এবং শাসন ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া খান্দানের স্থলাভিষিক্ত হয়। মুরজে রাহিত নামক স্থানে হযরত ইবনে যুবায়েরের সমর্থকদের সাথে তার মোকবিলা হয় এবং মারওয়ানই বিজয় লাভ করেন। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি মিসরও দখল করেন। এরপর দেশ স্বাভাবিকভাবেই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সিরিয়া ও মিসরে মারওয়ানের শাসন বলবৎ হয় এবং হিজায, ইরাক ও ইরানের ওপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর শাসন কার্যকর হয়।

www.amarboi.org

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা)

৬৪ হিজরী থেকে ৭৩ হিজরী
৬৮৩ খৃস্টাব্দ থেকে ৬৯৩ খৃস্টাব্দ

নাম আবদুল্লাহ। পিতার নাম যুবায়ের (রা), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাওয়ারী। মায়ের নাম আসমা (রা) বিনতে সিদ্দীকে আকবর (রা) এবং দাদী রাসূলের (সা) ফুফু হযরত সাফিয়া (রা)। তিনি হিজরতের বিশ মাস পরে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনায় মুহাজিরদের ঘরে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মলাভ করেন। তাঁর জন্মগ্রহণে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কারণ, ইহুদীরা প্রচার করেছিলো যে, তারা মুসলমানদের ওপর যাদু করেছে। তাই তাদের ঘরে আর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না। তিনি জন্মগ্রহণ করলে তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর চিবিয়ে তার মুখে তুলে দেন। জ্ঞানী ও মর্যাদাবান হওয়ার সাথে সাথে ইবনে যুবায়ের (রা) ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুজার। সারারাত নামায পড়তেন এবং দিনে রোযা রাখতেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ছিল তার বিশেষ গুণ। তিনি ছিলেন অতিশয় সাহসী ও বীরপুরুষ।

ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) সিরিয়া ও মিসর ছাড়া সমগ্র ইসলামী ভূখন্ডের শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। শাসন ক্ষমতা লাভের পর সর্বপ্রথম খানায়ে কাবার পুনর্নির্মাণের দিকে মনযোগ দেন। কারণ, ইয়াযীদের সিরীয় সৈন্যদের মিনজানিকের সাহায্যে পাথর বর্ষণের ফলে কাবা প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। হযরত ইবনে যুবায়ের (রা) কাবা ঘর সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে ইরানী, মিসরীয় ও রোমান কারিগরদের সাহায্যে অতীব যত্ন সহকারে পুনরায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ করেন।

তাঁর খালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস শুনিয়েছিলেন। হাদীসটি হচ্ছে, কুরাইশরা যদি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী না হতো তাহলে আমি কাবাকে হযরত ইবরাহীমের (আ) গাঁথা ভিত্তি অনুসারে নির্মাণ করতাম অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশ ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম।

www.amarboi.org

অতএব,[১] ঘর পুনর্নির্মাণের সময় তিনি পরিত্যক্ত অংশ ঘরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ভূমি থেকে সামনাসামনি দুটি দরজা তৈরী করেন যাতে যিয়ারতকারীদের সুবিধা হয়। ইমারতের উচ্চতা নয় হাত বৃদ্ধি করেন। নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) সর্বপ্রথম কাবাকে মিসরীয় রেশমী গিলাফ পরান।

হযরত ইবনে যুবায়ের (রা) ৭৩ হিজরী পর্যন্ত হিজায প্রভৃতি প্রদেশের ওপর শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনকাল অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাটে। অবশেষে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সেনাধ্যক্ষ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের হাতে ৭৩ হিজরীর ১৭ই জমাদিউস সানি শাহাদাত বরণ করেন। সেই সময় তার বয়স ছিল ৭২ বছর। তিনি ৯ বছর পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

তাঁর শাসনকালের অবশিষ্ট বিবরণ আবদুল মালেক সম্পর্কিত বর্ণনার মধ্যে দেখুন।

---

১. হযরত ইবরাহীম কর্তৃক খানায়ে কাবার ভিত্তি স্থাপনের ১৬৭৫ বছর পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে কুরাইশগণ কাবা ঘর ভেঙ্গে তা পুনর্নির্মাণ করিয়েছিলো। অর্থাভাবের কারণে হাজরে আসওয়াদের দিকে কয়েক হাত জায়গা খালি রেখে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিলো। তাছাড়া দরজা মানুষ সমান উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছিলো যাতে কুরাইশদের অনুমতি ছাড়া কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে।

www.amarboi.org

মারওয়ান বংশের শাসন

১. মারওয়ান ইবনে হাকাম

৬৪ হিজরী থেকে ৬৫ হিজরী

নাম মারওয়ান এবং পিতার নাম হাকাম। ২, ৫ অথবা ৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিন মারওয়ানের পিতা উমাইয়া বংশের অন্যান্যদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু গোপনে গোপনে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতো। সে কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার পরিবার পরিজনসহ তায়েফে নির্বাসিত করেন।

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত হাকাম ও মারওয়ান দু'জনেই তায়েফে বসবাস করে। তাদের জন্য মদীনায় আসার অনুমতি ছিল না। হযরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে অনুমতি লাভ করেছিলেন, যদিও তা কার্যকরী করার অবকাশ তিনি পেয়েছিলেন না।

হযরত উসমান (রা) মারওয়ানকে তাঁর সচিব তথা চীফ সেক্রেটারী নিয়োগ করেন। খলিফার সীলমোহরও তার হাতে অর্পণ করেন। আর এ কারণে তাঁর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়। পরবর্তী সময়ে সে হযরত তালহাকেও (রা) শহীদ করে। আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনকালে সে কয়েকবার মদীনার গভর্নর নিযুক্ত হয়। সে-ই তার শাসন যুগে সর্ব প্রথম ঈদের নামাযের আগে খুতবা পড়ার ব্যবস্থা করে।

আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর মারওয়ান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর বাই'আত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ইবনে যিয়াদের পরামর্শে সে নিজেই খিলাফতের দাবী করে বসে। ফলে মিসর ও সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা তার হাতে চলে যায়।

শাসন ক্ষমতার মজা লুটবার জন্য মারওয়ান বেশী দিন জীবিত ছিল না। নয় মাস আঠার দিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ৬৫ হিজরীর রমযান মাসে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে খালেদ ইবনে ইয়াযীদকে পরবর্তী শাসক হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তার দুই পুত্র আবদুল মালেক ও আবদুল আযীযকে যথাক্রমে রাজক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করে এবং খালেদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার মাকে বিয়ে করে। অতপর ভরা দরবারে

www.amarboi.org

খালেদকে চরমভাবে অপমানিত করে। এ ব্যাপারে খালেদ তার মা'র কাছে অভিযোগ করলে তার মা ঘুমন্ত অবস্থায় মারওয়ানকে গলা টিপে হত্যা করে।[১]

মারওয়ান সাহাবা হওয়ার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল।[২] তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল মালেক সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আবদুল মালেক ছিলেন অত্যন্ত ভাল প্রশাসক, বুদ্ধিমান এবং কঠোর প্রকৃতির মানুষ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শাসন কর্তৃত্ব ধ্বংস করার পর তিনি গোটা মুসলিম অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

১. ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৫

২. মীযানুল ইতিদাল।

www.amarboi.org

২. আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান

সিরিয়ার শাসনকাল ৬৫ হিজরী থেকে ৭৩ হিজরী

সমগ্র ইসলামী জগতের ওপর শাসন পরিচালনা ৭৩ হিজরী থেকে ৮৬ হিজরী (৬৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭০৫ খৃষ্টাব্দ)

আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হযরত উসমানের খিলাফতযুগে ২৬ হিজরীতে মদীনায় জন্মলাভ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন ও শিক্ষা লাভ করেন। শাসন ক্ষমতা লাভের পূর্বে তিনি মদীনার ফকীহদের মধ্যে গণ্য হতেন। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এবং সংকল্প ও সাহসেও তিনি অনন্য ছিলেন। সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা লাভের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর মত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মোকাবিলা করতে হয়। সাথে সাথে শিয়া ও খারেজীদের সাথেও তাকে বুঝাপড়া করতে হয়। কিন্তু আবদুল মালেক তার বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও অদম্য মনোভাব ও সাহসিকতা কাজে লাগান এবং সকল শক্তিকে পরাভূত করে ইয়াযীদের মৃত্যুর পর বনী উমাইয়া শাসনের যে ভিত্তি প্রায় উৎপাটিত হয়েছিলো তা পুনরায় মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কারণে আবদুল মালেককে বনী উমাইয়া শাসনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা উচিত।

কথিত আছে, যে সময় তিনি মারওয়ানের মৃত্যু ও তাঁর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার খবর পান তখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। খবর শোনামাত্র তিনি কুরআন শরীফ বন্ধ করেন এবং পরিতাপের সাথে বলেন ঃ এবার আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

সিংহাসনে বসেই আবদুল মালেক জনসমাবেশে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন ঃ

হে জনগণ, আল্লাহর শপথ ! আমি উসমান (রা)-এর মত দুর্বল খলিফা নই কিংবা মুয়াবিয়া (রা) মত প্রতারক বা ইয়াযীদের মত দুর্বল সিদ্ধান্তের লোক নই। যদি কেউ আমাকে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলে যে, এদিকে চলা উচিত তাহলে আমি তাকে তরবারি দ্বারা ইশারা করে বলে দেব যে, তোমাকে এদিকে যেতে হবে।[১]

তাওয়াবীন

মৃত্যুর পূর্বে মারওয়ান ইবনে যিয়াদকে ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওদিকে কুফায় তাওয়াবীন নামক একটি দলের উদ্ভব ঘটে যারা ইমাম হুসাইন (রা)কে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে

১. দুরুসুত্ তাওয়ারীখ।

www.amarboi.org

বাই'আত করার পর বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পর তারা চরমভাবে অনুতপ্ত হয়। তারা এর ক্ষতিপূরণ করতে চায় এভাবে যে, ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের বেছে বেছে হত্যা করতে হবে। সুতরাং সুলায়মান ইবনে সারদের নেতৃত্বে তারা তাদের কাজ শুরু করে এবং হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের হত্যা করতে থাকে। হযরত ইবনে যুবায়ের (রা)-এর গভর্নর তাওয়াবীনদের কোন প্রকার বাধা দিলেন না। অবশেষে ইবনে যিয়াদের সেনাবাহিনীর সাথে এই দলের মোকাবিলা হয় এবং তারা পরাজিত হয়।

মুখতার সাকাফী

ইমাম শা'বী (র) বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম কিছু লোক বর্শা হাতে আসমান হতে নেমে এসেছে এবং হযরত হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। এর অল্প কিছুদিন পরেই মুখতার সাকাফীর আবির্ভার ঘটে। সে হুসাইন (রা)-এর হন্তাদের বেছে বেছে হত্যা করতে থাকে।[১]

মুখতার সাকাফী ছিল অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি। প্রথমে সে ইবনে যুবায়েরের (রা) হাতে বাই'আত হয়। পরে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুফায় চলে যায়। সেখানে তাওয়াবীনদের প্রভাব ছিল। কিন্তু মুখতার আলী (রা)-এর অনুসারীদের একটি দল গঠন করে নিজে তার আমীর হয়। সে মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়াকে মাহদ ইবনে অসী উপাধি দিয়ে নিজেকে তার উযীর পরিচয় দেয় এবং আহলে বায়েতের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণকে তার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে। সুতরাং ৬৬ হিজরীর ১৪ই রবিউল আউয়াল ইবনে যুবায়ের (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কুফা অধিকার করে নেয়। অতপর বসরা ছাড়াও ইরাকের অন্যান্য শহরও অধিকার করে নেয় এবং হযরত হুসাইনের (রা)-এর খুনীদেরকে বেছে বেছে হত্যা করতে থাকে। ইবনে সা'দ এবং শামার যিলজাওশানকে হত্যা করে কুকুর দিয়ে ভক্ষণ করায়। ৬৭ হিজরীতে ইবনে যিয়াদের মোকাবিলার জন্য বিশাল একটি বাহিনী দিয়ে ইবরাহীম ইবনে উশতারকে প্রেরণ করে। ইবনে যিয়াদ পরাজিত হয়। ইবরাহীম ইবনে যিয়াদের মাথা কেটে মুখতারের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং দেহ আগুনে জ্বালিয়ে ফেলে। ইমারা ইবনে রাবী বর্ণনা করেন ঃ ইবনে যিয়াদের মস্তক এনে মসজিদের আঙিনায় মুখতারের সামনে রাখা হলে সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম মানুষজন বলছে ঃ ঐ যে আসছে। ঐ যে আসছে !! দেখলাম সেখানে একটি সাপ এসে হাজির হলো এবং ইবনে যিয়াদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে উধাও হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে পুনরায় ইবনে যিয়াদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করলো এবং বেরিয়ে আসলো। সাপটি তিনবার এরূপ করলো। (তিরমিযী)

---

১. জামউল ফাওয়ায়েদ।

www.amarboi.org

মুখতারের এই কঠোরতায় সত্তর হাজার লোক নিহত হয়।

মুখতারের এই হাংগামা সৃষ্টি ছিল নিছক পার্থিব এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে এটিকে ধর্মীয় পর্দার আড়ালে গোপন করতে চেয়েছিল। সে আলীর (রা)-এর কুরসি নামে এক বিদ'আত খাড়া করে। এই কুরসি সম্পর্কে তার দাবী ছিল এই যে, এটি রহস্যজনক কুরসি। বনী ইসরাঈলের কাছে 'তাবুতে'র যে মর্যাদা ছিল আমাদের কাছে এই কুরসি সেই একই মর্যাদার অধিকারী। অবশেষে সে অহী প্রাপ্তিরও দাবী করে বসে।

মুখতারের ফিতনা বিস্তার লাভ করতে থাকে। অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাঁর ভাই মুস'আবকে বসরার গভর্নর বানিয়ে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যে, মাহলাব ইবনে আবী সাফরার সাথে কুফা যাও এবং মুখতারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। মুস'আব ৬৭ হিজরীতে মুখতারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাকে পরাজিত করে হত্যা করেন। তার পরাজয়ের ফলে তার গোটা দল—যাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার—মুসআবের অনুগত হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর শাহাদাত

হিজায, ইরাক ও ইয়ামানের ওপর হযরত ইবনে যুবায়েরের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। ৬৪ হিজরী থেকে ৭২ হিজরী পর্যন্ত হজ্জের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল তাঁর। যারা হজ্জ পালন করতে আসতো তিনি তাঁদের বাই'আত গ্রহণ করতেন। আবদুল মালেকের জন্য এ অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। তাই তিনি তাঁর শাসনকালে সিরীয়দের জন্য হজ্জ নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটা ছিল রাজনৈতিক কারণে হজ্জ নিষিদ্ধ করার প্রথম ঘটনা। এতে সিরীয়দের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিলে তিনি দামেশকের মসজিদে পাথরের একটি গম্বুজ নির্মাণ করে আরাফাতে অবস্থানের দিনে জনসমাবেশের একটি বিদ'আত আবিষ্কার করেন।[১]

এরপর আবদুল মালেক ইবনে যুবায়ের (রা)-এর কর্তৃত্ব উৎখাত করতে মনস্থ করেন। ৭১ হিজরীতে তিনি নিজে প্রথমে ইরাকের ওপর হামলা করেন যাতে মুস'আবকে পরাজিত করে ইবনে যুবায়ের (রা)-এর একটা হাত ভেঙে ফেলা যায়। ইরাকীরা মুস'আবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে মুস'আব নিহত হন এবং আবদুল মালেক ইরাক অধিকার করেন।

ইরাক বিজয়ের পর আবদুল মালেক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মত জালেম ও খুনীর নেতৃত্বে ৭২ হিজরীতে মক্কার ওপর আক্রমণের জন্য একটি

১. দুরুসুত তাওয়ারীখ

www.amarboi.org

বিশাল সেবাবাহিনী প্রেরণ করেন। হাজ্জাজের বাহিনী তায়েফে পৌঁছলে ইবনে যুবায়ের (রা)-এর সাথে যুদ্ধ হয়ে যায় এবং ইবনে যুবায়ের (রা) মক্কায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। হাজ্জাজ মিনজানিকের সাহায্যে খানায়ে কাবার ওপর পাথর বর্ষণ শুরু করে। অবরোধ সাত মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। মক্কায় দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয়। ইবনে যুবায়ের (রা)-এর বন্ধুবান্ধব ও সংগীসাথীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে থাকে। ফলে তিনি তাঁর মা আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খেদমতে হাজির হয়ে পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। তাঁর মা বলেন ঃ

"বেটা যদি তুমি মনে করো যে, এতদিন তুমি ন্যায় ও সত্যের ওপর ছিলে এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতি মানুষকে আহবান জানিয়েছো তাহলে তোমার শহীদ বন্ধুবান্ধব ও সংগী সাথীদের মত ন্যায় ও সত্যের জন্য নিজ জীবনের কুরবানী পেশ করো এবং নিজেকে বনী উমাইয়ার ছোকরাদের হাতে তুলে দিও না।"

হিজরতের পর মুসলমানদের ঘরে জন্মলাভকারী প্রথম সন্তান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) একথা শুনে ফিরে আসলেন, বর্ম খুলে ফেললেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে সমর সংগীত গাইতে গাইতে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আবদুল্লাহ যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন সেদিকেই সিরীয়দের ব্যূহকে তছনছ করে দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বহু সিরীয়কে হত্যা করে শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর শাহাদাতে সিরীয়রা উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে শুরু করলো। তাদের তাকবীর শুনে হযরত ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ

"তাদের কান্ড দেখো, ইবনে যুবায়ের (রা) জন্মলাভ করার আনন্দে মুহাজির ও আনসারগণ তাকবীর বলেছিলেন। অথচ এই সিরীয়রা তাঁর মৃত্যুর আনন্দে তাকবীর বলছে।"

শাহাদাতের পর হাজ্জাজ তাঁর মাথা আবদুল মালেকের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং দেহটি হাজুন নামক স্থানে ফাঁসিতে লটকিয়ে দেয়। হযরত আসমা (রা) সে স্থান অতিক্রম করছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন অশ্ব পৃষ্ঠে থেকে এই অশ্বারোহীর নামার সময় এখনো হয়নি। একথা জানতে পেরে আবদুল মালেক হাজ্জাজকে তিরস্কার করেন এবং লাশ হযরত আসমার (রা) হাতে তুলে দেয়ার জন্য লিখেন। সুতরাং লাশ তাঁর হাতে তুলে দেয়ার পর হাজুন নামক স্থানে দাফন করা হয়। হাজ্জাজ হযরত আসমার (রা) কাছে গিয়ে বললো ঃ আমি আল্লাহর দুশমনের সাথে কিরূপ আচরণ করেছি তা তো দেখেছো ? হযরত আসমা (রা) বললেন ঃ দেখেছি, তুমি তার দুনিয়া এবং নিজের আখিরাত ধ্বংস করেছো। আমি নিজে নবীকে (সা) বলতে শুনেছি যে,

www.amarboi.org

সাকীফ গোত্রে একজন মহামিথ্যাবাদী ও একজন রক্তপিপাসুর জন্ম হবে। মহামিথ্যাবাদীকে আমি দেখেছি। মুখতার ইবনে উবায়েদ ছিল সেই মহামিথ্যাবাদী। এখন থাকে শুধু রক্তপিপাসুর বিষয়টি। আমার মনে হয় তুই-ই সেই রক্তপিপাসু। (সহীহ মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) ৭৩ হিজরীর ১৭ই জমাদিউস সানী শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের পর রাজনীতির ময়দানে আবদুল মালেকের আর কোন প্রতিদ্বন্দী রইলো না এবং গোটা মুসলিম জাহানে তিনি একচ্ছত্র বাদশাহ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেন।

মিনজানিকের সাহায্যে পাথর বর্ষণের ফলে কাবার প্রাচীর ও ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। তাই আবদুল মালেক হাজ্জাজকে মক্কার গভর্নর নিয়োগ করে কাবাঘর পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেন। হাজ্জাজ ৭৪ হিজরীতে কাবা ঘর সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলে ইবনে যুবায়েরের (রা) নির্মাণের পূর্বে যেমন ছিল ঠিক সেভাবে নির্মাণ করে। ৭৫ হিজরীতে হাজ্জাজ সমগ্র ইরাকের গভর্নরী লাভ করে এবং কুফায় গিয়ে হত্যা, খুন-খারাবী, গ্রেফতার ও লোমহর্ষক নির্যাতনের চূড়ান্ত করে ফেলে। যার ফলে ইরাকে আবদুল মালেকের শাসন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

খারেজী

এই সময়েই খারেজী মতবাদের সমর্থক শাবীবের আবির্ভাব ঘটে এবং তার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। হাজ্জাজ তাদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি লড়াই করে। সর্বশেষ যুদ্ধে শাবীব চরম পরাজয় বরণ করে। তার দল একেবারে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সে নিজেও নদীতে ডুবে মারা যায়।

আবদুর রহমান ইবনে আশ'আস

হাজ্জাজের জুলুম-নির্যাতনের ফলে ইরাকে ব্যাপক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। আবদুর রহমান ইবনে আশ'আস দুই লাখ লোকের একটি দল নিয়ে—যাদের মধ্যে আলেম এবং কুররাগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—হাজ্জাজের মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আবদুর রহমান কুফা এবং খুরাসান অধিকার করে নেয়। এ বিষয়ে জানতে পেরে আবদুল মালেক হাজ্জাজের সাহায্যের জন্য সিরিয়ার সমস্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। 'দীর জামাজেম' নামক স্থানে হাজ্জাজ ও ইবনে আশআসের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। কিন্তু ইবনে আশ'আস পরাজিত হন। এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৮৫ হিজরীতে।

www.amarboi.org

এরপর সমগ্র মুসলিম অঞ্চলের ওপর আবদুল মালেকের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয় এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসান ঘটে।

বিজয়সমূহ

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সত্ত্বেও আবদুল মালেক সুযোগ বুঝে রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের প্রতি মনযোগ দেন। সুতরাং ৬৬ হিজরীতে আফ্রিকায় সৈন্য প্রেরণ করেন। এই বাহিনী বার্বারদের নেতা কুসায়লাকে হত্যা করে। উত্তর আফ্রিকার সকল শহর অধিকারে আসে এবং সমগ্র উত্তর আফ্রিকার ওপর ইসলামী পতাকা উড়তে থাকে। মাহলাবের অনুসারীরা খুরাসানের দিকে বিজয়ের ধারা সম্প্রসারিত করেন। খুরাসানীদের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। বিজয় লাভের পর সে এলাকাও আবদুল মালেকের অধিকারে আসে।

সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

মারওয়ানের লিখিত ফরমান মোতাবেক আবদুল মালেকের পর আবদুল আযীয ছিল সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। কিন্তু আবদুল মালেকের জীবদ্দশায়ই সে ইনতিকাল করলে আবদুল মালেক পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে যথাক্রমে তার দুই পুত্র ওয়ালীদ ও সুলায়মানের জন্য বাই'আত গ্রহণ করেন।

আবদুল মালেকের মৃত্যু

আবদুল মালেক ৮৬ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল দামেশকে ইনতিকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ষাট বছর। তাঁর শাসনকাল ছিল ২১ বছর দেড় মাস। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) এরপর সমগ্র ইসলামী জগতের ওপর তের বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দামেশকের বাবে জাবিয়ার বাইরে তাকে দাফন করা হয়।

আবদুল মালেকের সংস্কার ও চরিত্র

আবদুল মালেক ছিলেন খুব ভাল প্রশাসক ও সাহসী বাদশাহ। ৮৬ হিজরীতে যখন তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তখন শান্তি ও নিরাপত্তারূপ সূর্যের কিরণ তার সাম্রাজ্যের প্রতিটি অলিগলি আলোকোদ্ভাসিত করে রেখেছিল।

তিনি তার শাসনকালে বিভিন্ন সংস্কার কার্য চালু করেন, সামরিক বিভাগকে পূর্ণতার চরম শিখরে উন্নীত করেন এবং সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক ভর্তির আইন রচনা করেন। কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী স্থানে

www.amarboi.org

ওয়াসিত নামে একটি নতুন শহরের পত্তন করেন। তিনি নিজে যেহেতু বিদ্বান ও জ্ঞানী ছিলেন তাই বিখ্যাত তাবেয়ী সাইদ ইবনে যুবায়েরের দ্বারা তাফসীর গ্রন্থ রচনা করান। এটি ছিল কুরআনের সর্ব প্রথম তাফসীর গ্রন্থ।

৭৬ হিজরীতে আবদুল মালেক নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইসলামী মুদ্রা তৈরী করার নির্দেশ দেন। উক্ত মুদ্রার ওপর আরবী বর্ণমালা ক্ষোদিত ছিল। ঐ সময় পর্যন্ত রোমান ও ইরানী মুদ্রা চালু ছিল। তবে হযরত উমর (রা) রৌপ্য মুদ্রা ঢালাই করে চালু করেছিলেন। আবদুল মালেক তিউনিসে জাহাজ নির্মাণ কারখানা তৈরী করিয়েছিলেন। উক্ত কারখানায় শত শত যুদ্ধজাহাজ তৈরী হতো।

আবদুল মালেক ছিলেন প্রথম উমাইয়া বাদশাহ যিনি প্রয়োজনীয় সকল দরবারী রীতিনীতি চালু করেছিলেন। ঐতিহাসিক বালাযুরী বলেন ঃ

আবদুল মালেক ছিলেন প্রথম খলিফা যিনি রাজদরবারের শান-শওকতের জন্য আবশ্যকীয় সব কিছু গ্রহণ করেছিলেন। খলিফা সিংহাসনে আসন গ্রহণ করতেন। তাঁর ডাইনে বসতেন উমরাগণ এবং বামে বসতেন রাজ্যের এবং শাহী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিভিন্ন রাজন্যবর্গের দূত, কবি, লেখক এবং ফকীহ ও অন্যান্যরা সামনে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ আবেদন পেশ করতেন।[১]

আবদুল মালেক শাহী লেবাসের একটি বিশেষ ধরন নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাঁর সময়ে দেশে কাপড় প্রস্তুত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে সুলায়মান ঐসব কারখানার প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন।

আবদুল মালেক খলিফা রাশেদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বাদশাহ। এ কারণে তাঁর শাসনকালটি নিরপরাধদের রক্তে রঞ্জিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছে একদিন তিনি রাসূলের (সা) মিম্বরে উঠে এভাবে ঘোষণা করেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! আমি উসমানের (রা) মত দুর্বল কিংবা মুয়াবিয়ার (রা)-এর মত উদার ও বাকসর্বস্ব খলিফা নই। আল্লাহর কসম, আজকের দিনের পরে কেউ যদি আমাকে তাকওয়ার ফরমায়েশ দেয় অর্থাৎ বলে যে, আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার গর্দান উড়িয়ে দেব।"

আবু বকর জাস্‌সাস বলেন ঃ এটিই ছিল প্রথম অকল্যাণকর দিন এবং আবদুল মালেক ছিলেন প্রথম বাদশাহ যিনি সাধারণ মুসলমানদের জিহ্বা কর্তন

---

১. ফুতুহুল বুলদান।

www.amarboi.org

করেছিলেন। অর্থাৎ এদিন থেকেই ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের ব্যাপারে মানুষের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।[১]

হাজ্জাজ পর্যন্ত পৌঁছে সে আরো উৎসাহিত হয় এবং তার হিংস্রতা বর্ণনাতীত রূপে বৃদ্ধি পায়। জুম'আ, আসর ও মাগরিবের নামায সূর্যাস্তকালে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দুঃসাহস কারো ছিল না।[২] আল্লাহ আবদুল মালেকের ভাতিজা হযরত উমর ফারুকের (রা) খান্দানের দৌহিত্র হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের ওপর রহমত নাযিল করুন। কারণ, দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পর তিনি এই বিদ'আতকে উৎখাত করে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের (ভাল কাজের আদেশ ও মন্দকাজের প্রতিরোধের) অনুমতি দান করেছিলেন।

---

১. আহকামুল কুরআন, জাসসাস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা—৮২।

২. আহকামুল কুরআন, জাসসাস।

www.amarboi.org

৩. ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক

৮৬ হিজরী থেকে ৯৬ হিজরী
৭০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭১৫ খৃষ্টাব্দ

আবদুল মালেকের ইনতিকালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওয়ালীদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ৫০ হিজরীতে জন্মলাভ করেছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। নির্ভেজাল আরব শাসক এই বাদশাহ শুদ্ধ আরবী পর্যন্ত বলতে পারতেন না। তবে দেশ শাসনের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল ছিলেন।

আবদুল মালেক তাঁর শাসনকার্যের সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করেছিলেন। খারেজীদের ফিতনার মূলোৎপাটন ও আলী (রা)-এর অনুসারীদের আবেগ-উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে পড়েছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর শাহাদাতের পর বনী উমাইয়াদের প্রতিপক্ষ কোন শক্তি বর্তমান ছিল না। এ কারণে ওয়ালীদ নির্বিবাদে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধান এবং বাইরের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রচুর অবকাশ লাভ করেন। সৌভাগ্যবশত তিনি মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম, কুতাইবা ইবনে মুসলিম, মূসা ইনে নুসাইর, তারেক ইবনে যিয়াদ এবং মাসলামা ইবনে আবদুল মালেকের মত বড় বড় দিগ্বিজয়ী বীর লাভ করেছিলেন যারা অশ্বপৃষ্ঠে বসে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মাঠ-ঘাট-প্রান্তর পদদলিত করেন।

বিজয়সমূহ

খলিফা হওয়ার পর ওয়ালীদ সমগ্র ইরাকে আরব, ইরাকে আজম ও খুরাসান হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কর্তৃত্বাধীনে দিয়ে দেন। ফলে হাজ্জাজ নিজের পক্ষ থেকে এসব এলাকায় গভর্নর নিয়োগ করতে থাকে। সুতরাং সে তার চাচাত ভাই মুহাম্মাদ ইবনে কাসেমকে ৮৬ হিজরীতে সিন্ধুর দিকে প্রেরণ করে এবং কুতাইবাকে খুরাসানের আমীর নিয়োগ করে।

মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম ও সিন্ধু বিজয়

সিন্ধুর ওপর প্রথম ইসলামী আক্রমণ হয় হযরত আলী (রা)-এর যুগে। কিন্তু তাঁর শাহাদাতের সাথে সাথে আক্রমণের এই ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুসলমান সরন্দীপে প্রবাসী ছিল। তারা জাহাজে দেশে প্রত্যাবর্তন

www.amarboi.org

করার সময় পথিমধ্যে সিন্ধুর রাজা দাহিরের সৈন্যরা তাদের সব কিছু লুটপাট করে নেয় এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করে। এ খবর জানার পর হাজ্জাজ মুহাম্মাদ ইবনে কাসেমের নেতৃত্বে একটি বড় বাহিনী প্রেরণ করে। ৯৩ হিজরীতে রাজা দাহিরের সাথে ভয়ানক যুদ্ধের পর উক্ত বাহিনী সম্পূর্ণরূপে সিন্ধু অধিকার করে নেয় এবং আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মুলতান দখল করে এলাকাটিকে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। দেবলে চার হাজার মুসলমান বসতি স্থাপন করে এবং সেখানে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করে। রাভিন্দরী ও আরো কতিপয় এলাকার মানুষ আপনা থেকেই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।

কুতাইবা ও খুরাসানের বিজয়সমূহ

হাজ্জাজ কুতাইবাকে খুরাসানের ইমারত দান করেছিলেন। ইমারতের মসনদে আরোহণ করার পর তার মনে নিজের শাসন এলাকা সম্প্রসারণের ধারণা জন্মে। এ উদ্দেশ্যে কুতাইবা তুর্কী ও তাতারদের সাম্রাজ্যের ওপর হামলা করতে থাকে। কয়েক বছরের বিরামহীন যুদ্ধের পর তিনি তাদের বহু এলাকা অধিকার করেন।

তিনি ৮৯ হিজরীতে বুখারা ও সমরখন্দ দখল করেন। এসব বিজয় তাঁকে এতটা উৎসাহ যোগায় যে, তাঁর বিজয়ী বাহিনী চীন সীমান্তে গিয়ে উপনিত হয় এবং কাশগড় দখল করে নেয়। খাওয়ারিজম শাহ তাঁর সাথে সন্ধি করেন। ৯৬ হিজরীতে চীন সম্রাট জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হয়। তুর্কী ও সাগাদ বাদশাহরা প্রতিনিধি পাঠিয়ে সন্ধি করেন। এসব বড় বড় বিজয় কুতাইবাকে অস্বাভাবিক গুরুত্বের অধিকারী বানিয়ে দেয়। যুদ্ধের এই ধারা ৮৬ হিজরী থেকে ৯৬ হিজরী পর্যন্ত চলতে থাকে।

মাসলামা ও এশিয়া মাইনর

ওয়ালীদের ভাই মাসলামার ময়দান ছিল তুর্কিস্তান, সিরিয়া ও এশিয়া মা-ইনরের সীমান্ত অঞ্চল। তিনি রোমানদের বহু দুর্গ ও শহর অধিকার করেন। ইউয়াক, কারাম, বুলাস, তুওয়ানা, বারকিলা ও কাউনিয়া দুর্গ তারই হাতে বিজিত হয়।

মূসা ইবনে নুসাইর, তারেক ও স্পেন বিজয়

ওয়ালীদ ৮৯ হিজরীতে মূসা ইবনে নুসাইরকে আফ্রিকার আমীর নিয়োগ করে পাঠান। মূসা বার্বারদের দেশে ইসলাম প্রচার করেন এবং তাঁর দাস তারেক ইবনে যিয়াদকে তুনযার গভর্নর নিয়োগ করেন। আবদুল মালেকের

www.amarboi.org

শাসনকালেই উত্তর আফ্রিকার স্থলভাগ অধিকারে এসেছিল। এর ঠিক সম্মুখভাগেই ইউরোপের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের মাঝে একটি উপদ্বীপ বিদ্যমান যা স্পেন নামে পরিচিত। দশ মাইল প্রশস্ত এক ফালি সমুদ্র একে আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন কর রেখেছে। এর ভূমি শস্যশ্যামল ও উর্বর, আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এবং খনিসমূহ মূল্যবান ধাতুতে পরিপূর্ণ। চরম অত্যাচারী গথ জাতি দেশটি শাসন করতো। স্পেনের কিছু সংখ্যক আমীর উমরা সেখানকার সম্রাটের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মূসাকে স্পেন দখলের আহ্বান জানায়। মূসা ওয়ালীদের নিকট থেকে আক্রমণের অনুমতি গ্রহণ করেন এবং তাঁর দাস তারেকের নেতৃত্বে বার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়ে তাকে স্পেন আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। ৯২ হিজরীতে এই মুসলিম বাহিনী জাহাজে আরোহণ করে স্পেনের সমুদ্রোপকূলে বর্তমানে জাবালুত তারেক নামে পরিচিত পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করে।

উপকূলভাগ অধিকার করার পর তারেক জাহাজসমূহে আগুন লাগিয়ে দেন যাতে সৈন্যদের পালিয়ে যাওয়ার আশা না থাকে। জাহাজগুলো ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পর তিনি সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

"তোমাদের সম্মুখে শত্রু এবং পেছনে সমুদ্র। এ দু'টির মধ্যে যেটি ইচ্ছা বেছে নাও।" তারেকের বাহিনী ও স্পেনের রাজার বাহিনীর মধ্যে কয়েকবার শক্তি পরীক্ষা হয়। তবে ৯২ হিজরীতে গোয়ালিয়া নদীর সন্নিকটে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেটিই ছিল সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে স্পেনের রাজা রডারিক নিজে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোকাবিলা করতে অগ্রসর হন। মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যায় নিতান্তই কম। কিন্তু তাদের মাত্র বার হাজার সৈন্য অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এক লাখ সৈন্যকে যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করে এবং পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। রাজা রডারিক নদীতে ডুবে মারা যান। এই যুদ্ধ স্পেনের ইতিহাসের পাতা উল্টে দেয় এবং আট দিনের যুদ্ধ আট শত বছরের জন্য স্পেনের ভাগ্যের ফায়সালা মুসলমানদের অনুকূলে করে দেয়।

তারেক তাঁর মনীব মূসা ইবনে নুসাইরকে এই সুসংবাদ শুনানোর জন্য কায়রোতে দূত প্রেরণ করেন। আরো অগ্রাভিযান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে মূসা লিখলেন যে, তুমি অপেক্ষা করো, আমি নিজেই সাহায্যের জন্য আসছি। অতএব মূসা একটি বিরাট সৈন্যদল নিয়ে যাত্রা করেন এবং স্পেনের রাজধানী টলেডো দখল করে নেন। ৯৫ হিজরীতে স্পেনকে উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রদেশ বানিয়ে মূসা তাঁর পুত্র আবদুল আযীয ইবনে মূসাকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করে নিজে কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন।

www.amarboi.org

স্পেনের পর তারেক সার্ডিনিয়া দ্বীপ অধিকার করেন। আরো অগ্রসর হয়ে তিনি সমগ্র ইউরোপ অধিকার করতে মনস্থ করেন। ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী কয়েকটি শহরও তিনি দখল করেন। ঠিক এই সময়ে খিলাফতের দরবার থেকে আরো অগ্রাভিযান না চালানোর নির্দেশ এসে পৌছে।

৯৬ হিজরীতে ওয়ালীদের দরবার থেকে মূসাকে ডেকে পাঠানো হয়। অঢেল গণীমাতের মাল এবং বন্দী ত্রিশ জন রাজ কুমারসহ স্পেন বিজয়ী মহাবীরের জমকালো কাফেলা দামেশকে উপনীত হয়। ওয়ালীদ মূসাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং খিলাত হিসেবে তাঁর বিশেষ পোশাকাদি তাকে দান করেন। অনেক পুরস্কার ও উপঢৌকন দান করেন। জুম'আর খুতবায় নিজের এই বিরাট বিজয়ের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

ওয়ালীদের শাসনকালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি উত্তর দক্ষিণে দুই শত দিনের দূরত্বে পৌছেছিল। আফ্রিকায় আটলাস পর্বত, এশিয়ায় মুলতান ও চীন পর্যন্ত এবং ইউরোপে পীরেনিজ পর্বত পর্যন্ত ইসলামের সূর্য জ্বল জ্বল করে দীপ্তি ছড়াতে থাকে।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

আবদুল মালেকের শাসনকালের উত্তরাধিকার বাই'আত অনুসারে ওয়ালীদের পরে ক্ষমতা লাভের কথা ছিল সুলায়মানের। কিন্তু আবদুল মালেক তাঁর পুত্র আবদুল আযীযের অনুকূলে সুলায়মানের ক্ষমতার উত্তরাধিকারিত্ব বাতিল করতে মনস্থ করেন। কিন্তু উমরাদের সবাই ঐ উদ্যোগ সমর্থন করেননি। তবে হাজ্জাজ ও কুতাইবা ওয়ালীদের সমর্থক হয়ে যান। ওয়ালীদ সুলায়মানকে ডেকে ক্ষমতার উত্তরাধিকার ত্যাগে বাধ্য করতে চান। কিন্তু মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত তার এই সংকল্প কার্যকরী করার পেছনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

হাজ্জাজের মৃত্যু

৯৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইরাকে আরব ও ইরাকে আজমের আমীর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ৫৩ বছর বয়সে মারা যায়। সে বিশ বছর পর্যন্ত খুন-খারাবী নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বনী উমাইয়াদের ক্ষমতার মসনদ অত্যন্ত মজবুত করে দেয়।

হাজ্জাজ ছিল অত্যন্ত হিংসা ও বিদ্বেষ পরায়ণ। তার জুলুম-নির্যাতনকে খোদায়ী আযাব মনে করা উচিত। তার উন্মুক্ত তরবারি বিশ বছর পর্যন্ত অসহায় ও মজলুমদের ওপর চলতে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, দুই লাখ

www.amarboi.org

মুসলমান তার নির্যাতনের শিকার। এসব লোকের মধ্যে এক লাখ বিশ হাজার নিহত ও আশি হাজার বন্দী হয়। এদের মধ্যে ত্রিশ হাজার ছিল মহিলা। সে তার জুলুমের পরাকাষ্ঠা দেখায় এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম হযরত আনাসকে (রা) ভরা দরবারে অপমাণিত করে এবং অপরাধীদের গর্দানে যে সীলমোহর লাগানো হতো তাঁর গর্দানে সেই সীলমোহর লাগিয়ে দেয়।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ কুফার জামে মসজিদে আমি হযরত আলীকে এভাবে বদদোয়া করতে শুনেছি ঃ

"হে আল্লাহ, আমি ইরাকীদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি তাদের কল্যাণ কামনা করেছি কিন্তু তারা আমার সাথে প্রতারণা করেছে। হে আল্লাহ, তুমি তাদের ওপর সাকীফ গোত্রের এমন কোন ছোকরাকে লেলিয়ে দাও, যে জালেমানা পন্থায় তাদের জান ও মালের ব্যাপারে ফায়সালা করবে।"

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! হযরত আলী (রা) সেই জালেমের যে বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় বর্ণনা করেছিলেন তার সবগুলোই হাজ্জাজের মধ্যে ছিল।[১] হাজ্জাজের নির্যাতনমূলক হত্যার সর্বশেষ শিকার বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাইদ ইবনে যুবায়ের (রা)। তাঁকে হত্যার পর হাজ্জাজ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ইমাম আবু হানীফার (র) উস্তাদের উস্তাদ ইবরাহীম নাখায়ী হাজ্জাজের মৃত্যুর খবর পেয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। সেই সময় তার চোখে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। হাজ্জাজের মৃত্যুতে হাসান বসরী (র) এই বলে দোয়া করেন ঃ "হে আল্লাহ, তুমি এই জালেমকে যেভাবে ধ্বংস করেছো সেভাবে তার জারীকৃতি নিয়ম-কানুনও ধ্বংস করে দাও।"[২] আল্লাহ তাঁর এই দোয়া কবুল করেন এবং উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসন যুগে জনগণ মতামত ও বাকস্বাধীনতা লাভ করে। হাজ্জাজের অপকর্মের কথা বলার সাথে সাথে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, পূর্বাঞ্চলে যেসব বিজয় অর্জিত হয়েছিলো তাতে তার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সে ছিল একজন সুদক্ষ সমরনায়ক এবং বাগ্মী বক্তা।

ওয়ালীদের মৃত্যু

৯৬ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে দীরে মারওয়ানে ওয়ালীদ মৃত্যুবরণ করেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁর জানাযার নামায পড়েন। মৃত্যুর সময় ওয়ালীদের বয়স ছিল বিয়াল্লিশ বছর ছয় মাস। তিনি ৯ বছর ছয় মাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

---

১. ইবনে আসীর।

২. আহকামুল কুরআন, জাসসাস।

www.amarboi.org

ওয়ালীদের কৃতিত্ব

বনী উমাইয়া বাদশাহদের মধ্যে ওয়ালীদের শাসনযুগ ছিল সর্বাপেক্ষা সফল। তার মেজাজে ছিল কঠোরতা। রাষ্ট্রীয় সমর্থনের জোরে হাজ্জাজের হাতের তরবারি ঝলসে উঠেছিল। আগে থেকেই আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার এর কাজ বন্ধ ছিল। সরকারের সমালোচকরা মুখ বন্ধ করে বসেছিল। এ কারণে ওয়ালীদের শাসনকালে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। তিনি এর সুফল পুরোপুরি ভোগ করেছেন। তিনি বিজয়ের ধারাকে এতটা সম্প্রসারিত করেন যে, হযরত উমর (রা)-এর পর আর কারো যুগে এত বেশী বিজয় অর্জিত হয়নি। ফলে চীন থেকে স্পেনের ভূখন্ড পর্যন্ত ইসলামের পতাকা সগৌরবে উড়তে থাকে। ওয়ালীদ আভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রতিও মনযোগ দেন। সুতরাং ঐ সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কাজে রোমান অথবা ইরানী ভাষা ব্যবহার করা হতো। ওয়ালীদ আরবীকে সরকারী কাজকর্মের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। সব রকম হিসাব-নিকাশও আরবী ভাষায় হতে থাকে।

ওয়ালীদ বহু জনকল্যানমূলক কাজ সম্পাদন করেন। অধীনস্থ সকল রাজ্যে সড়ক ও পুল নির্মাণ ও মাইল ফলক স্থাপন করেন। খাল ও কূপ খনন করান। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হাসপাতাল, মুসাফিরখানা ও অনাথাশ্রম চালু করেন। বিকলাঙ্গদের জন্য সেবক ও অন্ধদের জন্য সার্বক্ষণিক সাহায্যকারী নিয়োগ করেন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তারই আবিষ্কার। ওয়ালীদের শাসনকালে মক্কায় কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্পেনে লিনেন থেকে কাগজ উৎপন্ন হতে থাকে।

নির্মাণ কাজের প্রতি ওয়ালীদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি বহু সংখ্যক মসজিদ, দুর্গ এবং মহল নির্মাণ করান। বিশেষ করে ৮৮ হিজরীতে মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণে যে উদারতা দেখান ও শিল্পকর্মের পরিচয় দেন তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওয়ালীদ মসজিদে আকসারও সংস্কার সাধন করেন।

দীনদারীর প্রতিও ওয়ালীদের যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। তিনি ছিলেন কুরআন প্রেমিক। প্রতি তিন দিনে কুরআন মজীদ খতম করতেন। তাঁর শাসনযুগেই হযরত আলী (রা)-এর শাগরেদ আবুল আসওয়াদ দোয়েলী হাজ্জাজের ইংগিতে এ'রাব (আরবী স্বরচিহ্ন) প্রয়োগ করেন। ওয়ালীদ কুররা ও হাফেজদের প্রাত্যহিক ভাতা নির্ধারণ করে দেন এবং কুরআন হিফজের জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

মোটকথা ওয়ালীদের শাসনকাল ছিল সর্বোত্তম শাসনকাল। হাজ্জাজের জুলুম-নির্যাতন যদি এ যুগকে কলঙ্কিত না করতো তাহলে কতই না ভাল হতো !

www.amarboi.org

৪. সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক

৯৬ হিজরী থেকে ৯৯ হিজরী
৭১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭১৭ খৃষ্টাব্দ

ওয়ালীদের ইনতিকালের সময় তাঁর ভাই সুলায়মান রামলায় অবস্থান করছিলেন। এ কারণে পিতার অসীয়ত অনুসারে ৯৬ হিজরীর ১৫ই জমাদিউস সানী তাঁর অনুপস্থিতিতেই বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়। সাত দিন পর সংবাদ পেয়ে তিনি দামেশকে আসেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উমর ইবনে আবদুল আযীযকে উযীর নিয়োগ করেন।

সুলায়মান ৫৪ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নিকট থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাঁর রাজনীতি তাঁর ভাই ও পিতার রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তারা উভয়েই হাজ্জাজের মত লোকদের সাহায্যে দেশ চালিয়েছেন। কিন্তু সুলায়মান এই নীতির অবসান ঘটান এবং নতুন পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা শুরু করেন।

সুলায়মান সর্ব প্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, হাজ্জাজ কর্তৃক ভর্তি জেলখানাসমূহ খালি করা। তিনি সকল বন্দীদের মুক্ত করে দেন। কিন্তু হাজ্জাজের পরিবারের প্রতি কঠোর আচরণ করতে শুরু করেন। তাদের ওপর অর্থদন্ড আরোপ করেন এবং দেশান্তরিত করেন। হাজ্জাজের ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম সিন্ধু বিজয়ের পূর্ণতা সাধনে ব্যস্ত ছিলেন। সুলায়মান তাকে অপসারিত করে ইয়াযীদ ইবনে আবু কাবশাকে সিন্ধুর গভর্নর নিয়োগ করেন। ইয়াযীদ ইবনে আবু কাবশা মুহাম্মদ ইবনে কাসেমের মত দিগ্বিজয়ী বীরকে (যিনি তাঁর সদাচরণ দ্বারা সিন্ধুর মানুষের মন জয় করেছিলেন) নির্মমভাবে হত্যা করে। এর কিছুটা ছিল হাজ্জাজের নির্যাতনমূলক কাজের ফল এবং কিছুটা ছিল ওয়ালীদ কর্তৃক সুলায়মানের অপসারণে হাজ্জাজের সমর্থনের কারণে।

কুতাইবা ছিলেন খুরাসানের গভর্নর। কিন্তু তার চরিত্র হাজ্জাজের মত জুলুম-নির্যাতনের কালিমায় কলঙ্কিত ছিল না। কিন্তু সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণের ফলে তার মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কারণ, সে-ও হাজ্জাজের সুরে সুর মিলিয়ে সুলায়মানকে অপসারণের ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। এই ভয়ে ভীত হয়ে কুতাইবা সুলায়মানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। কিন্তু সে তার

www.amarboi.org

অধীনস্তদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় এবং ৯৬ হিজরীতে নিজের লোকদের হাতে নিহত হয়।

সুলায়মান আফ্রিকার গভর্নর মূসার প্রতিও অসন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ, ওয়ালীদ আর মাত্র কয়েকদিন বেঁচে থাকবে একথা জানা সত্ত্বেও সে সুলায়মানের ক্ষমতা লাভের জন্য অপেক্ষা না করে আফ্রিকার সমস্ত অর্থ-সম্পদ ওয়ালীদের হাতে তুলে দেয়। সুতরাং সুলায়মান মূসাকে অপসারণ করেন এবং কঠোরভাবে তার নিকট আফ্রিকার অবশিষ্ট অর্থ-সম্পদ দাবী করেন। মূসা এই দাবী পূরণ করতে ব্যর্থ হলে সুলায়মান তাকে বন্দী করেন। অতএব মূসা বন্দী অবস্থায় ৯৭ হিজরীতে মদীনায় ইনতিকাল করেন। তার পুত্র স্পেনের শাসক আবদুল আযীযকে তার নিজের সৈন্যরা ভ্রান্ত আচরণের কারণে হত্যা করে। যদিও তারেকের সাথে কোন কঠোর আচরণ করা হয়নি। কিন্তু আপন মনিবের পরিণতি দেখে তিনি প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং নিষ্ক্রিয় ও চুপচাপ থাকেন।

বিজয়সমূহ

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই সুলায়মান ইয়াযীদ ইবনে মাহলাবকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। পরে তাকে খুরাসানেরও গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ইতিপূর্বেও তিনি খুরাসানের গভর্নর ছিলেন। জুরজান ও তাবারিস্তানের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে বসে। ৯৮ হিজরীতে ইয়াযীদ সামরিক অভিযান চালিয়ে তা অধিকার করেন।

৯৮ হিজরীতে সুলায়মান তার ভাই মাসলামাকে এক লক্ষাধিক সৈন্য দিয়ে কনস্টান্টিনোপলের দিকে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে বিজয় প্রায় নিশ্চিত হওয়ার মত প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু মাসলামা লিভান পোল নামক এক খৃস্টান পোপের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে যার ফলে গোটা বাহিনীকে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। রসদ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সাহসিকতার সাথে এক বছর পর্যন্ত অবরোধ কায়েম রাখেন। সুলায়মানের মৃত্যুর পর এ বাহিনী ফিরে আসে।

পরবর্তী উত্তরাধিকারীর অনুকূলে বাই'আত

সুলায়মান শাহী ফরমানে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে তার চাচাত ভাই উমর ইবনে আবদুল আযীযের নাম লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু খোদ উমর ইবনে আবদুল আযীযকেও তা জানতে দেননি। ফরমান লেখার পর তিনি রাজ পরিবারের সকল সদস্যকে একত্র করেন এবং নাম প্রকাশ না করেই সীলমোহর করা ফরমানের অনুকূলে এই মর্মে সবার বাই'আত গ্রহণ করেন যে, এতে যার নাম আছে তিনিই হবেন পরবর্তী খলিফা। কারণ, সুলায়মান জানতেন উমর ইবনে আবদুল আযীযের তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার জন্য বনী মারওয়ান এত সহজে তা মেনে নিতে প্রস্তুত হবে না।

www.amarboi.org

সবাই সীলমোহরাঙ্কিত ফরমানে বাই'আত করে। এই ফরমানে উমর ইবনে আবদুল আযীযের পর ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেকের নাম ছিল।

সুলায়মানের ইনতিকাল

সুলায়মান অজীর্ণতা রোগে আক্রান্ত হয়ে ৯৯ হিজরীর ১০ই সফর জুম'আর দিন ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর। তিনি দুই বছর আট মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

সুলায়মানের চরিত্র

গুণাবলীর দিক দিয়ে সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক বনী উমাইয়া বাদশাহদের অধিকাংশের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা। দীনদারীর প্রতি ছিল তাঁর আকর্ষণ। ন্যায় ও সত্যানুসারীদের তিনি পসন্দ করতেন। কিতাব, সুন্নাত এবং শরীয়াতের বিধি-বিধান জারী করার খেয়ালও তাঁর ছিল। বনী উমাইয়া খান্দানের আমীর-উমরা নামাযের সময়ে পরিবর্তন সাধন করেছিলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ সময়ে এবং কোন কোন সময় অসময়ে নামায আদায় করতে শুরু করেছিল। আওয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করার জন্য তিনি নির্দেশ জারী করেন।

সুলায়মান হাজ্জাজের জুলুম-নির্যাতন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। তার বন্দী করা সকল কয়েদীকে তিনি মুক্ত করে দেন এবং জালেম ও স্বৈরাচারী কর্মকর্তাদের পদচ্যুত করেন। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করেন এবং উপহার উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে পরিতৃপ্ত করেন। তিনি ৯৭ হিজরীতে হজ্জ আদায় করেন। মক্কার অধিবাসীদেরকেও প্রচুর উপহার দেন এবং বদান্যতা প্রদর্শন করেন। শুধুমাত্র কুরাইশ খান্দানের মধ্যেই চার হাজার ভাতা বন্টন করেন। এ কারণে সুলায়মান মিফতাহুল খায়র (কল্যাণের চাবি) উপাধি লাভ করেন। যদিও সিন্ধু ও স্পেন বিজেতাদের সাথে সুলায়মানের আচরণ ভাল ছিল না। পরিস্থিতি তাকে এরূপ করতে বাধ্য করেছিল।

সুলায়মানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীযের মত সৎ ও পবিত্রাত্মা মানুষটিকে জীবদ্দশায় নিজের উজীর এবং মৃত্যুর পর নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন বলেন ঃ

"আল্লাহ সুলায়মানের ওপর তাঁর রহমত বর্ষণ করুন। তার সূচনা ও সমাপ্তি উভয়টি কল্যাণ দ্বারা সিক্ত। তার শাসন শুরু হয়েছিল যথাসময়ে নামায আদায়ের ব্যবস্থা দ্বারা এবং সমাপ্তি হয়েছিলো উমর ইবনে আবদুল আযীযকে পরবর্তী খলিফা বানানোর নির্দেশের মাধ্যমে।"

www.amarboi.org

৫. উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)

৯৯ হিজরী থেকে ১০১ হিজরী
৭১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭২০ খৃষ্টাব্দ

উমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন মারওয়ানের পৌত্র। কিন্তু তাঁর মা ছিলেন ফারূকে আযমের (রা) পৌত্রী উম্মে আসেম ইবনে আসেম। এ কারণে পূর্ণরূপে হযরত উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বৈশিষ্টে বৈশিষ্ট মন্ডিত ছিলেন।

উমর ইবনে আবদুল আযীয ৬১ হিজরীতে জন্মলাভ করেন। শৈশব থেকেই জ্ঞান ও তাকওয়ার প্রতি আকর্ষণ ছিল। মদীনার আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর ফাতেমা বিনতে আবদুল মালেকের সাথে বিয়ে হয়। ওয়ালীদ তাঁকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি চরম দীনদারী এবং ন্যায় ও ইনসাফের সাথে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তাঁর হাতেই মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ পূর্ণতা লাভ করে। ৯৯ হিজরীতে খলিফা হন এবং হযরত উমর ফারূকের (রা) শাসন যুগকে পুনর্জীবিত করেন।

সুলায়মানের ইনতিকালের পরে তাঁরই অসীয়ত অনুসারে রাজা' ইবনে হায়াত মহরকৃত ফরমানের জন্য পুনরায় বাই'আত গ্রহণ করেন। বাই'আত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ফরমানটি খোলা হলে তাতে উমর ইবনে আবদুল আযীযের নাম পাওয়া যায়। রাজা' তাঁর বাহু ধরে মিম্বরের দিকে নিয়ে যান। সে সময় তিনি খিলাফতের গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর পড়ায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েন। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়তে পড়তে সম্মুখে অগ্রসর হন। খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে সর্ব প্রথমে তিনি সুন্নাতে 'আদেলা'কে পুনর্জীবিত করতে চান। অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদার ভিত্তি প্রস্তর ছিল শূরা। পরামর্শহীন বংশগত উত্তরাধিকারী মনোনয়ন পদ্ধতি বৈধ নয়। তাই উমর ইবনে আবদুল আযীয মুসলিম সর্বসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

"হে জনগণ, আমার ইচ্ছা এবং মুসলমানদের মতামত ছাড়াই খিলাফতের যিম্মাদারী আমার উপর অর্পণ করা হয়েছে। তোমাদের গলায় আমার আনুগত্যের যে জবরদস্তিমূলক শৃঙ্খল পরানো হয়েছে আমি নিজেই তা খুলে দিচ্ছি। তোমরা যাকে ইচ্ছা খলিফা বানিয়ে নাও।" তাঁর এই বক্তৃতার পর সব দিক থেকে আওয়াজ উঠলো, আমরা আপনাকে খলিফা বানিয়েছি, আমরা আপনার খিলাফতে সন্তুষ্ট। অতপর তিনি খলিফা হিসেবে নিম্নোক্ত খুতবা দান করেন ঃ

www.amarboi.org

"ভাইয়েরা, মানবিক প্রবৃত্তির দুর্বলতা থেকে আমিও মুক্ত নই। আমার দেহপিঞ্জরের মধ্যেও লোভী মন আছে। এ মনের বৈশিষ্ট হচ্ছে, সে একটি জিনিস অর্জন করার পর তার চেয়েও উচ্চ পর্যায়ের জিনিস পাওয়ার চিন্তায় লেগে যায়। খিলাফতের আসন লাভের পর এখন সে তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদার জিনিস লাভের চিন্তায় মগ্ন আছে। আর সেই মনযিলটি হচ্ছে জান্নাত। আপনাদের কাছে আমার আবেদন হচ্ছে, এই আকাঙ্খা পূরণে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। ভাইসব, আমি হুকুমদাতা নই, বরং নির্দেশিত একটি পথের পথিক। আমি তোমাদের কারো চাইতে উত্তম নই। তবে তোমাদের চেয়ে অধিক দায়িত্বের গুরুভারে পিষ্ট। মনে রেখো, আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।"

মসজিদ থেকে বের হলে হৈ চৈ শুনতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন এ শোরগোল কিসের ? উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ বললেন ঃ খলিফাতুল মুসলিমীনের জন্য সওয়ারী আসছে। সিংহাসনে অধিষ্ঠানের আয়োজন চলছে। উমর ইবনে আবদুল আযীয বললেন ঃ এসবে আমার কি প্রয়োজন ? আমার নিজের ঘোড়া নিয়ে এসো। ঘোড়া আনা হলো। যখন বাড়ী ফিরলেন তখন অত্যন্ত বিমর্ষ ও দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট ছিলেন। খাদেম জিজ্ঞেস করলো ঃ জনাব আপনি এতো চিন্তিত কেন ? তিনি বললেন ঃ আমি অযথা চিন্তিত নই। মাশরেক থেকে মাগরিব পর্যন্ত গোটা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার এমন কোন ব্যক্তি নেই যার অধিকার আদায়ের যিম্মাদারী আমার ওপর বর্তায়নি, সে তা দাবী করুক বা নাই করুক।

অতপর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আমার জীবন যাপন প্রণালীর সাথে যদি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পার তাহলে সাথে থাকো। অন্যথায় তুমি স্বাধীন, ইচ্ছা করলে পিতার কাছে চলে যেতে পার। একথা শুনে পবিত্রাত্মা স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি সর্বাবস্থায় আপনার সাথে থাকবো। উমর ইবনে আবদুল আযীয অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া তাঁর নিজের ও স্ত্রীর সমস্ত জিনিস ও গহনাপত্র বায়তুলমালে জমা দিলেন এবং দৈনিক দুই দিরহাম ভাতা গ্রহণ করে হযরত উমর ফারূকের (রা) মত সহজ সরল জীবনযাপন শুরু করলেন। দ্বাররক্ষী এবং দেহরক্ষী বাহিনীও ভেঙে দিলেন।

সংস্কার কাজসমূহ

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনযুগ ছিল দীনি বিপ্লবের যুগ। দীর্ঘ দিন থেকে উমাইয়া শাসন ছিল জুলুম-নির্যাতন ও বিদ'আত প্রসারের যুগ। ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজের প্রতিরোধের

www.amarboi.org

দরজা ছিল বন্ধ। সত্যিকার আলেমদের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। উমর ইবনে আবদুল আযীয সমস্ত অকল্যাণ সম্পূর্ণরূপে শুধরানোর সংকল্প করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম খুতবাতেই একথা বলেছিলেন ঃ

لا طاعة للمخلوق فى معصية الله (ابن سعد)

"আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কেউ যেন আমার আনুগত্য না করে।"

এই ঘোষণার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ উমাইয়া যুগে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লাভ করে। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজেও স্বাধীনতা লাভ করে, যা থেকে তারা ইতিপূর্বে বঞ্চিত ছিল। মদীনার বিখ্যাত ইমাম কাসেম এ ঘোষণা শুনে বলেন ঃ

اليوم ينطق من كان لا ينطق -(ابن سعد)

"যারা কথা বলতে পারতো না এখন তারা কথা বলতে পারবে।"

উমর ইবনে আবদুল আযীয নিজেও ঘোষণা করেন ঃ "যদি আল্লাহ আমার হাতে সবগুলো বিদ'আতের মৃত্যু ঘটান প্রতিটি সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেন এবং এ পথে আমার দেহের এক একটি টুকরা কাজে লাগে এমনকি জীবন দেয়ার পালাও যদি আসে তাহলে তা হবে আল্লাহর পথে নিতান্ত মামুলি কুরবানী।

৪১ হিজরীতে অর্থাৎ হযরত হাসান কর্তৃক খিলাফতের দাবী পরিত্যাগ করার পরই উমাইয়া রাজা-বাদশা ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের স্বাভাবিক নীতিতে পরিণত হয়েছিলো মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা)-কে গালি দেয়া। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) শাসন কর্তৃত্ব হাতে নেয়া মাত্র প্রায় ষাট বছরের এই জঘন্য প্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা দেন। তাঁর অন্তরে আহলে বায়তের মর্যাদা ও ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। তিনি সমস্ত গভর্ণর ও শাসকদের কাছে এই মর্মে ফরমান পাঠান যে, গালিগালাজের পরিবর্তে কুরআন মজীদের এই আয়াতটি পড়তে হবে ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

"আল্লাহ ন্যায় বিচার ও ইহসানের, আত্মীয়-স্বজনদের দান করার আদেশ দেন। অশ্লীলতা এবং, খারাপ কাজ ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। তিনি এ উপদেশ দান করেন যাতে তোমরা তা স্মরণ করো।"

www.amarboi.org

ফাদাক ছিল খায়বারের একটি গ্রাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এর আয় আহলে বায়েতের প্রয়োজন পূরণে ব্যয়িত হতো। খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতকালেও এ নীতি বজায় রাখা হয়। আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকালে মারওয়ান ও তার সন্তানরা এটি হস্তগত করে এবং তারপর হতে এটি তাদের জায়গীরে পরিণত হয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর মারওয়ান খান্দানের লোকদের একত্র করে উক্ত ভূখন্ডের পূর্বতন মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এর আয় যে খাতে ব্যয়িত হতো সেটাই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে আহলে বায়েত পুনরায় এর আয় লাভ করতে থাকেন। অনুরূপ অন্য যেসব জায়গীর বনী মারওয়ানের জবরদখলে ছিল সেসবও ফিরিয়ে নেয়া হয়।

বায়তুলমাল সম্পর্কে উমর ইবনে আবদুল আযীয ঘোষণা করেন যে, তা মুসলমানদের সম্পদ। বায়তুল মালের সম্পদ বন্টিত হবে সাম্যনীতির ভিত্তিতে। বনী মারওয়ান এতদিন পর্যন্ত অন্য মুসলমানদের তুলনায় বায়তুলমাল থেকে বেশী ফায়দা লুটছিলো। ফলে তারা এ ঘোষণাকে পসন্দ করতে পারেনি। তারা হৈ চৈ শুরু করলে উমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ

"সম্ভবত আল্লাহর পক্ষ থেকে বনী মারওয়ানের জন্য চরম কোন রক্তপাতের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহর কসম ! এই রক্তপাত যদি আমাকেই করতে হয় তবুও আমি তা থেকে পিছপা হবো না।" (ইবনে সা'দ)

মারওয়ানীরা উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) অনড় সংকল্প সম্পর্কে অবহিত ছিল। তাই আপাতত তারা নিশ্চুপ রইলো। কিন্তু কিছুদিন পরে ছোট বড় সকল মারওয়ানী প্রতিনিধিদলের আকারে গিয়ে এ আবেদন পেশ করে ঃ

"তোমার পূর্বে আমাদের সাথে যে আচরণ করা হতো তুমি তা বাঞ্চাল করে আমাদেরকে অন্যদের সাথে সমান করে ফেলেছো।" হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) কঠোর সংকল্পের সাথে বললেন ঃ

لان عدتم لمثل هذا المجلس لا شدن ركابى ثم لاقد من المدينة ولا جعلنها شورى-(ابن سعد)

"যদি তোমরা পুনরায় কখনো আমার কাছে এসে এসব কথা বলো তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে মদীনায় চলে যাবো এবং শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের শূরার হাতে তুলে দেব।" (ইবনে সা'দ)

অর্থাৎ মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং বায়তুলমাল তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পুনরায় মুসলমানদের হাতে তুলে দেব। একথা শুনে সকল মারওয়ানী ও উমুবীরা নিশ্চুপ হয়ে যায়।

www.amarboi.org

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) নিজে শরীয়াতের পাবন্দ ছিলেন। তিনি চাইতেন সমস্ত মুসলমান শরীয়ত অনুসরণ করুক এবং ইসলামের প্রসার ঘটুক। তাই তিনি গভর্নর ও শাসকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে ত্রুটি আছে অবিলম্বে সেইসব ত্রুটি দূর করে সম্পূর্ণরূপে শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। জুলুম-নির্যাতনের নিয়ম-নীতি দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ এবং সৎকর্মকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হবে এবং দীনের প্রচার প্রসারের প্রতি সর্বাধিক মনযোগ দিতে হবে। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনে আবদুল আযীযের প্রতিটি ফরমানের দ্বারা

'হয় কোন জুলুমের অবসান নয় কোন সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ঘটতে অথবা কোন বিদ'আতের বিলুপ্তি, কারো জন্য ভাতা নির্ধারণ কিংবা কোন সৎকাজ সম্পাদিত হতো। যতদিন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় না নিয়েছেন ততদিনই এসব কাজ হয়েছে। (ইবনে সাদ)

তিনি শুধু নির্দেশ জারী করেই ক্ষান্ত হতেন না বরং শাসকদের দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির কঠোর পর্যালোচনা করতেন। তাঁর শাসনকালের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ যাচাই বাছাই করার পর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুলায়মানের অতি প্রিয় গভর্নর ছিলেন ইয়াযীদ ইবনে মাহলাব। তিনি বায়তুলমালের অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন। হিসেব নিকেশের পর বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাত ধরা পড়লে উমর ইবনে আবদুল আযীয তাকে গ্রেফতার করেন। ইয়াযীদের পুত্র মাখলাদ উমর ইবনে আবদুল আযীযের খেদমতে হাজির হয়ে বললো ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, আল্লাহ্ আপনাকে এই উম্মতের খলিফা বানিয়ে অত্যন্ত অনুগ্রহ করেছেন। আমরা আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকবো কেন?" তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারটা সব মুসলমানের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। আমার একার অধিকারের সাথে নয়। আমি একা তা কি করে ক্ষমা করতে পারি? বায়তুলমালের সমস্ত অর্থ পরিশোধ করতে হবে তারপর মুক্তি পাওয়া যাবে।"

উমর ইবনে আবদুল আযীযের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ীভাবে ভাতা দানের ব্যবস্থা শুধুমাত্র আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি আরবদের ন্যায় অনারব মুসলমানদের জন্যেও স্থায়ী ভাতা দানের ব্যবস্থা করেন এবং আইনগতভাবে আরব ও অনারব মুসলমানদের আর্থিক, রাজনৈতিক এবং তামাদ্দুনিক অধিকার সমান বলে ঘোষণা করেন।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের যুগে প্রজাসাধারণ সচ্ছল ও সুখী ছিল। মারওয়ান পরিবার ছাড়া আর কোন মুসলমানের তাঁর ব্যাপারে কোন অভিযোগ ছিল না।

www.amarboi.org

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল ইলমে হাদীস লিপিবদ্ধ করণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে ঐ সময় পর্যন্ত সাধারণত হাদীস লিপিবদ্ধ করার নিয়ম ছিল না। মানুষেরা নিজের বক্ষের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ সংরক্ষিত করে নিতো এবং তদনুযায়ী আমল করতো।

প্রথম শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর সাহাবা কিরামের (রা) যুগের পরিসমাপ্তি আসন্ন হয়ে আসলে এবং হাদীসের হাফেজগণ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে থাকলে সর্বপ্রথম উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) মনে হাদীস সংকলনের উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। তিনি চারদিকে উলামায়ে কিরামের নামে এই বলে ফরমান পাঠান যে,

انظروا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস অনুসন্ধান করে সেগুলোকে একত্রিত করো।"

আবু বকর ইবনে হাযমের নামে লিখিত পত্রে এর কারণ উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ

আমি হাদীসের জ্ঞান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। আলেমগণ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন।[২] এই ফরমান জারী হওয়ার সাথে সাথে ব্যাপকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করণের কাজ শুরু হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সর্বাধিক অগ্রগামী ছিলেন রাবী' ইবনে সাবাহ, সাইদ ইবনে আবী আরুবা এবং যুহরী। তাঁরা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী

রাষ্ট্রীয় সীমানা সম্প্রসারণের প্রতি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) দৃষ্টি ছিল না, বরং তিনি অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহ দূরীকরণের দিকে বেশী মনযোগী ছিলেন। এ কারণে তাঁর শাসনকালে উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জিত হয়নি। যে সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ৯৯ হিজরীতে তিনি তাদেরকে প্রত্যাহার করে আনেন। ঐ বছরই তুর্কীরা আজারবাইজানের ওপর আক্রমণ করে বসলে তিনি হাতেম ইবনে নু'মানের দ্বারা তাদের দমন করেন। তিনি ১০০ হিজরী সনে তুরমাযার মুসলিম জনবসতিকে লামতিয়ায় স্থানান্তরিত হতে আদেশ দেন।

১. আবু নাঈম।

২. বুখারী।

www.amarboi.org

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) নম্রতার সুযোগ নিয়ে ১০০ হিজরী সনে খারেজীরা ইরাকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। খিলাফতের দরবার থেকে কুফার গভর্নরের কাছে নির্দেশ আসে যে, খারেজীদেরকে নম্রতা ও দয়াদ্রতার সাথে বুঝাতে চেষ্টা করো এবং তারা যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তোমরাও যুদ্ধ করবে না। কিন্তু খারেজীরা যুদ্ধ করতেই অধিক আগ্রহ দেখায়। ফলে যুদ্ধ হয় এবং কুফার গভর্নর পরাজিত হন। এরপর এই ফিতনা দমন করার জন্য মাসলামা ইবনে আবদুল মালেককে নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি খারেজীদেরকে চরমভাবে পরাজিত করলেও একেবারে নির্মূল করতে পারেননি। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) খারেজীদের নেতা বুস্তামকে লিখেন যে, তোমরা বিনা কারণে কেন যুদ্ধ করতে উদ্যত হও ? যদি দীনের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারটি তোমাদেরকে এজন্য বাধ্য করে থাকে তবে কতিপয় ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার ফায়সালা করে নাও। বুস্তাম আলোচনার জন্য দুইজন প্রতিনিধি পাঠায়। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাদের সমস্ত প্রশ্নের এত সুন্দর ও যথোপযুক্ত জবাব দেন যে, তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সর্বশেষে তারা জিজ্ঞেস করে যে, আপনার পরে ইয়াযীদের ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে আপনার মত কি ? তিনি বলেন ঃ আমি তাকে পরবর্তী ক্ষমতাগ্রহণকারী যুবরাজ নিযুক্ত করিনি। প্রথম থেকেই সে যুবরাজ মনোনীত হয়ে আছে। বুস্তামের প্রতিনিধিরা বললো ঃ আপনি যদি তাকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর আমানত বহনের যোগ্য মনে না করেন তাহলে তা ঘোষণা করে দিন। বিষয়টি জনগণের নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিন। একথা শুনে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) নিশ্চুপ হয়ে যান এবং তিন দিনের অবকাশ চান। মারওয়ানীরা আশংকা করে যে, তিনি হয়তো এই খান্দানকে শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করবেন। কারণ, ইতিপূর্বে তিনি এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এ কারণে মারওয়ানীরা উমর ইবনে আবদুল আযীযের খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে এবং তিন দিন পূরণ হওয়ার পূর্বেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭)

ওফাত

১০১ হিজরীর ২৫শে রজব হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বিষক্রিয়ার ফলে দীর সাম'আন নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। এভাবে তিনি অপ্রকাশ্য শাহাদাত লাভ করেন। কথিত আছে যে, বিষক্রিয়াজনিত রোগ যন্ত্রণা অধিক বেড়ে গেলে লোকজন তাকে ঔষধ খেতে বলে। জবাবে তিনি বলেন ঃ যদি আমি নিশ্চিত হই যে, শুধু কান স্পর্শ করলেই সুস্থ হয়ে যাবো তাহলে এই কাজটুকুও আমি করবো না। আমার প্রভুর রহমত লাভের চেয়ে আর কোন জিনিস আমার কাছে প্রিয় নয়। আমি তারই অপেক্ষায় আছি।

www.amarboi.org

ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তিনি দুই বছর পাঁচ মাস চৌদ্দ দিন খিলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন।

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

উমর ইবনে আবুদল আযীয (র)-এর চরিত্র ও মর্যাদা

খিলাফতে রাশেদার পরে শাসন পরিচালনা, জ্ঞানগরিমা, আল্লাহভীতি ও কৃচ্ছ্রতা এবং ইবাদত ও সাধনা যদি পাশাপাশি দেখতে হয় তাহলে উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) জীবনে দেখা যেতে পারে।

মেধা ও বুদ্ধিমত্তা, আকাংখা ও শ্রম এবং জ্ঞানগত গুণাবলী মিলিত হয়ে তাঁকে এমন এক পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছিলো যে, যদি তিনি শাসন ক্ষমতা লাভ না করতেন তাহলে অবশ্যই জ্ঞানের সিংহাসনে সমাসীন হতেন।

খলিফা নির্বাচনের অধিকার ছিল জনগণের। উমাইয়ারা শক্তি প্রয়োগ করে জনগণের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিলো। ষাট বছর ধরে এ অবস্থা বিরাজ করছিলো। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তথাকথিত খলিফারা একজন নয়, একাধিক উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতো। উমর ইবনে আবদুল আযীয নিজেও এ ধরনের একজন উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু উমাইয়াদের শাসন যুগে তিনিই প্রথমবারের মত শূরা পদ্ধতির মৃত সুন্নাতে আদেলাকে জীবিত করেন। শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার পূর্বে জাতির সাধারণ অনুমোদন গ্রহণ করেন এবং কাউকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দেয়া এবং স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তে শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী গণতান্ত্রিক সরকারে রূপান্তরিত করা। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি।

উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার সাথে সাথে হযরত উমরের (রা) জীবনকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন স্পেন থেকে হিন্দুস্থান পর্যন্ত ভূখণ্ডের শাসক। কিন্তু তাঁর পরিধানে থাকতো ছেঁড়া জামা। তাঁর ঘরের দীপাধার ছিল বাঁশের তৈরী এবং তার ওপর জ্বালানো হতো মাটির প্রদীপ।

নিজের জন্য ভাতা হিসেবে বায়তুলমাল থেকে দৈনিক দুই দিরহাম (প্রায় দশ আনা) নির্ধারিত করেছিলেন। স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আবদুল মালেকের সমস্ত অলংকার এবং বাড়ীর অতিরিক্ত আসবাবপত্র এই বলে বায়তুলমালে জমা দিয়েছিলেন যে, তার (স্ত্রীর) পিতা ও ভাই সাধারণ মুসলমানের সম্পদ

www.amarboi.org

বায়তুলমালের অর্থ থেকে এগুলো দিয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকাকালীন গায়ের জামা ময়লা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সেটি পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় জামা ছিল না। এই ময়লা জামা পরিহিত অবস্থায়ই মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। মশুরের ডাল ছিল তাঁর খাদ্য। কারণ, এতে মনে কোমলতা সৃষ্টি হয়।

উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) সর্বপ্রথম তাঁর খান্দানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং তাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে দেন। তারা শক্তির দাপটে যেসব জায়গীর দখল করে রেখেছিলো সেগুলো সব প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেন। এ ব্যাপারে তাঁর ফুফু অভিযোগ করলে তিনি তাকে এই বলে জবাব দেন ঃ

"হে ফুফু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি এমন একটি ঝর্ণাধারা রেখে গিয়েছেন যা থেকে সবারই পরিতৃপ্ত হওয়ার অধিকার আছে। তাঁর তিরোধানের পর আবু বকর (রা) ও উমর ঐ ঝর্ণাধারাকে পূর্বাবস্থায়ই রেখে যান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইয়াযীদ, মারওয়ান, আবদুল মালেক এবং তাদের সন্তানেরা ঐ ঝর্ণাধারা থেকে নিজেরা পরিতৃপ্ত হয়েছে কিন্তু অন্যদের বঞ্চিত করেছে। আমি এই ঝর্ণাধারাকে তার প্রকৃত অবস্থানে নিয়ে যেতে চাই।"

ফুফু নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। খান্দানের লোকদের পরে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) আমীর-উমরা ও শাসকদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাদের পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টা চালান যার ফল দাঁড়ায় এই যে, ইসলামী দুনিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার লালন ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। ঘরে ঘরে দীনদারীর চর্চা হতে থাকে। প্রজারা সুখী ও সচ্ছল জীবন যাপন করতে থাকে। হাজার হাজার অমুসলিম দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। সিন্ধু ও ভারতবর্ষের কয়েকজন রাজাও ইসলাম গ্রহণ করে।

উমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুজার বান্দা। বিশেষত খিলাফতের মসনদে সমাসীন থাকার আড়াই বছর তাঁর নিয়ম ছিল ইশার নামাযের পর তিনি তাঁর নির্ধারিত কক্ষে চলে যেতেন এবং জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নফল নামায ও দোয়া কালামে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ঘুম পেলে সেখানে শুয়ে পড়তেন। চোখ খুলতেই পুনরায় আল্লাহর স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত করতেন। সকাল অবধি এভাবেই চলতে থাকতো। অধিক কান্নার ফলে অনেক সময় অশ্রু লালাভ বর্ণ ধারণ করতো। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সেই বিশেষ কক্ষে হয়তো সংরক্ষিত অর্থভাণ্ডার আছে মনে করে ইয়াযীদ তা খুললে একটা মোটা

www.amarboi.org

কম্বল ও একটি জিঞ্জির ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। ইবাদত করার সময় তিনি কম্বলটি গায়ে দিতেন এবং জিঞ্জিরটি গলায় পরতেন।

আল্লাহভীতি ও নম্রতা এবং অন্তরের কোমলতার অবস্থা ছিল এই যে, যখনই মৃত্যুর কথা আলোচনা হতো তখনই ভয়ে কম্পিত হতেন। কোন এক ব্যক্তি وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ (হাত ও পা বেঁধে যখন তাদেরকে তার [দোযখের] মধ্যে সংকীর্ণ জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে) আয়াতটি তিলাওয়াত করলে কাঁদতে কাঁদতে কণ্ঠ বন্ধ হয়ে এসেছিলো।

ইমাম আহমদ (র) প্রমূখের মতে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম সাওরী (র) মনে করেন যে, তিনি ছিলেন পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ।[১]

আব্বাসীয় দাওয়াতের সূচনা

ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসনকাল পর্যন্ত ইসলামী মিল্লাত উমাইয়া জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এই শাসন ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার জন্য গোটা জাতিই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা জানতেন অতি শীঘ্রই একদিন উমাইয়া শাসনের ইমারত ধ্বসে পড়বে। এরূপ পরিস্থিতিতে বনী উমাইয়াদের প্রতিদ্বন্দী বনী হাশেমদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই শাসন ক্ষমতা লাভের আকাংখা সৃষ্টি হয়েছিলো।

---

(১) মিশকাত, পৃষ্ঠা—২৬১ ঃ

عن النعمان بن بشير عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت قال حبيب فلما قام عمربن عبد العزيز (رحـ) كتبت اليه بهذا الحديث اذكر اياه وقلت ارجوان تكون امير المؤمنين بعد الملك النماص و الجبرية فسربه واعجبه يعني عمربن عبد العزيز (رضـ) – رواه احمد والبيهقي–

নু'মান ইবনে বাশীর হুযায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন তোমাদের মধ্যে নুবয়াত থাকবে। তারপর তিনি তা উঠিয়ে নিবেন। অতপর যতদিন চাইবেন নবুয়াত পদ্ধতির খিলাফত থাকবে। অতপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। (অঃ পৃঃ দ্রঃ)

www.amarboi.org

ফাতেমার (রা) খান্দান হযরত হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পর রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলো। কিন্তু বনী হাশেম গোত্রের অপর দু'টি পরিবার এই আকাংখা পোষণের ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। অর্থাৎ হযরত আলীর অন্য এক স্ত্রীর সন্তান মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া (র) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাসের (রা) পৌত্র আলী ইবনে আবদুল্লাহর পরিবার। এ দুটি পরিবারের প্রত্যেকটির সাথে ছিল একদল মুসলমান।

মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়ার (র) মৃত্যুর পর তাঁর দল[১] আবুল হাশেম ইবনে মুহাম্মাদকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু আবুল হাশেমও ৯৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে তাঁর প্রতিনিধিত্ব দান করেন। এভাবে উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) শাসনকালে বনী উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব মুহাম্মদ ইবনে আলী লাভ করেন। তিনি ছিলেন অতি দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সুচতুর ব্যক্তিত্ব। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) খলিফা হওয়ার পর তাঁর শাসনকালে ন্যায় ও ইনসাফ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকলেও সেই অবস্থা অব্যাহত থাকার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তাই তাঁর মত কোমল হৃদয় ও উদার খলিফার যুগকে মুহাম্মাদ ইবনে আলী বিরাট সুযোগ বলে মনে করেন এবং তাঁর জায়গীর হামীমা নামক গ্রামটিকে কেন্দ্র বানিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে গোপন সংগঠন কায়েম করেন যার উদ্দেশ্য ছিল আব্বাসীয় খান্দানের খিলাফতের অধিকারের সপক্ষে আন্দোলন করা। সুতরাং হিজরী ১০০ সালে সর্বত্র পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ১২৬ হিজরীতে বনী উমাইয়া খান্দানের শেষ শাসক মারওয়ানুল হিমারের যুগে এ আন্দোলন অধিক সফলতা লাভ করে।

এরপর হবে জুলুমবাজ রাজতন্ত্র এবং আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন তা তোমাদের মাঝে থাকবে। পরে আল্লাহ এটাকেও উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন তা তোমাদের মাঝে থাকবে। অতপর তিনি এটাকেও উঠিয়ে নেবেন। এরপর হবে নবুয়াত পদ্ধতির খেলাফত। অতপর তিনি চুপ থাকলেন। হাবীব বলেন ঃ উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ) খিলাফত লাভ করলে আমি তাকে তার নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ হাদীসটি লিখে পাঠালাম এবং বললাম ঃ আমি মনে করি জুলুমবাজ ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পরে আপনিই হচ্ছেন আমীরুল মু'মিনীন। এতে উমর উবনে আবদুল আযীয খুব খুশী ও আনন্দিত হলেন। (আহমদ ও বায়হাকী)

১. সাইয়েদেনা হযরত হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পর হযরত ফাতেমার (রা) খান্দান রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে অবস্থানের নীতি গ্রহণ করলে হযরত আলীর (রা) অনুসারীদের একটি দল মুখতারের নেতৃত্বে মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। যদিও মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়া আবদুল মালেকের বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন তবুও ঐ দলটি মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়াকেই তাদের ইমাম মনে করতো। এই দলটিকে কায়সানিয়া বলে আখ্যায়িত করা হতো।

www.amarboi.org

৬. ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালেক

১০১ হিজরী থেকে ১০৫ হিজরী

৭২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭২৩ খৃষ্টাব্দ

ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ৬৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ভাই সুলায়মানের মনোনয়ন অনুসারে উমর ইবনে আবদুল আযীযের পরে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসেন। ইয়াযীদ ছিলেন তরুণ বয়সী। তিনি সুরা ও পানপাত্র এবং বীণা ও বেহালার আসর বসিয়ে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার যুগ ফিরিয়ে আনেন। হাবাবা ও সালামা নাম্নী দুই দাসী ছিল তার সহচরী ও প্রিয়পাত্রী। ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সকল সংস্কার কর্ম বাতিল করে দেন। এভাবে তার দরবারের ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি পূর্ববর্তী উমাইয়া শাসকদের মত হয়ে যায়। সুতরাং সিংহাসনে বসেই গভর্নরদের নামে তিনি যে ফরমান জারী করেন তার কয়েকটি বাক্য ছিল এরূপ ঃ

اما بعد فان محمد كان مغرورا غرر تموه انتم واصحابكم فاذا اتاكم كتابى هذا فدعوا ماكنتم تعرفون من عهده واعيدو الناس الى طبقتهم الاولى اخصبوا اجدبوا اكرموا احيوا ام ماتوا والسلام - (عقد الفريد)

"উমর ইবনে আবদুল আযীয একজন প্রতারিত ব্যক্তি ছিলেন। তোমরা এবং তোমাদের সংগী-সাথীরা তাকে আচ্ছা মতো প্রতারণার ফাঁদে ফেলেছিলে। অতএব, এখন আমার এই ফরমান তোমাদের কাছে পৌঁছামাত্র উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) যুগের সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতি পরিত্যাগ করবে এবং মানুষদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। অনাবৃষ্টির বছর হোক কিংবা শস্য উৎপাদনের বছর হোক অথবা লোক তা পছন্দ করুক বা না করুক, বেঁচে থাকুক বা মৃত্যু মুখে পতিত হোক। ওয়াস সালাম।"

ইয়াযীদের পরবর্তী সব উমাইয়া বাদশাহ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) উত্তম আদর্শ পরিত্যাগ করে তাদের পূর্ববর্তী উমাইয়া ব্যক্তিবর্গের অনুসৃত আদর্শের আদলে শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন।

www.amarboi.org

বিজয়সমূহ

১০৪ হিজরীতে হাযর (আর্মেনিয়া প্রদেশ) বিজয়ের জন্য ইয়াযীদ শাবীব নাহরোয়ানির নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু এ অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। ইয়াযীদ জারাহ ইবনে আবদুল্লাহকে আর্মেনিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন। জারাহ হাযরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং কয়েকটি শহর দখল করে নেন। ইয়াযীদের শাসনকালে সামাহ ইবনে মালেক খাওলানীর নেতৃত্বে স্পেনের ইসলামী বাহিনী ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হয় এবং কয়েকটি শহর দখল করে পীরেনিজ পর্বত পর্যন্ত গিয়ে পৌছেন। কিন্তু সামাহর অকস্মাৎ মৃত্যু বিজয়ের এই ধারায় ছেদ টেনে দেয়।

বিদ্রোহ

উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) মৃত্যুর খবর শুনে ইয়াযীদ ইবনে মাহলাব জেলখানা থেকে পালিয়ে যায় এবং ইরাকে পৌছে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইয়াযীদ তাঁর ভাই মাসলামাকে ইবনে মাহলাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। সে ১০১ হিজরীতে পুরো মাহলাব খান্দানকে নির্মূল করে ফেলে। যেহেতু এই খান্দান বদান্যতা ও বীরত্বে খ্যাতিমান ছিল তাই তাদের ধ্বংস সম্পর্কে কবিরা শোকগাঁথা রচনা করেছিলো।

মাহলাব খান্দানের উপদ্রব মুক্ত হওয়ার পর মাসলামা ইরাক ও খুরাসানের গভর্নরী লাভ করেন। সাগাদের অধিবাসী এবং তুর্কীরা বিদ্রোহ করে বসলে মাসলামার জামাতা খুরাসানের গভর্নর সাঈদ তাদের পরাস্ত করেন। তুর্কীদের সাথে তাঁর বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি বিজয় লাভ করেন।

ইয়াযীদ ইবনে মুসলিম আফ্রিকার গভর্নর ছিল। সে হাজ্জাজের সুন্নাত পুনর্জীবিত করতে চাইলে তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আফ্রিকার অধিবাসীরা তাকে হত্যা করে এবং নিজেরাই প্রাক্তন গভর্নর মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদকে আমীর নির্বাচিত করে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেককে অবহিত করে। তিনি তাদের নির্বাচনকে মেনে নেন।

উত্তরাধিকারী নিয়োগ

ইয়াযীদ তাঁর ভাই হিশাম ও পুত্র ওয়ালীদ ইবনে ইয়াযীদকে যথাক্রমে সালতানাতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন।

www.amarboi.org

মৃত্যু

ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেক ১০৫ হিজরীর ২৫শে শাবান মৃত্যু বরণ করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর। তিনি চার বছর এক মাস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আব্বাসীয় দাওয়াত

১০৩ হিজরীতে আব্বাসীয় খান্দানের কতিপয় ইরাকী প্রচারক খুরাসানে গিয়ে উপনীত হয় এবং প্রচার-প্রোপাগান্ডায় আত্মনিয়োগ করে। ইয়াযীদের খুরাসানের গভর্নর তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ছেড়ে দেয়। এরপর বনী উমাইয়ার শেষ যুগ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। ১০৪ হিজরীতে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস জন্মগ্রহণ করেন যিনি পরবর্তী কালে আবুল আব্বাস সাফফাহ উপাধি নিয়ে প্রথম আব্বাসীয় বাদশাহ হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

www.amarboi.org

৭. হিশাম ইবনে আবদুল মালেক

১০৫ হিজরী থেকে ১২৫ হিজরী

৭২৩ খৃস্টাব্দ থেকে ৭৪৩ খৃস্টাব্দ

হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ইবনের মারওয়ান ৭২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাঁর নাম রাখেন মনসূর এবং মা নাম রাখেন হিশাম। মায়ের রাখা নামেই তিনি পরিচিত হন। ইয়াযীদের মৃত্যুর সময় তিনি রাসাফা নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। সেখানেই তাঁর বাই'আত অনুষ্ঠিত হয় এবং দামেশকে পৌছে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতা গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর। তিনি বিশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি বনী উমাইয়া খান্দানের সবচেয়ে সফল শাসক ছিলেন। তার সময়ে শাসন ব্যবস্থা উন্নতির চরম শিখরে পৌছে।

বিজয়সমূহ

স্পেনের গভর্নর আম্বাসা ইবনে শাহীম ১০৭ হিজরীতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালান এবং কারাকসুনা অধিকার করে নেন।

১১৪ হিজরীতে স্পেনের গভর্নর আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আল গাফেকী পুনরায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং পীরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সের দু'টি প্রদেশ একটিয়ানিয়া ও লোগোনিয়ায় প্রবেশ করে বোর্ডো অধিকার করেন। ফ্রান্সের সেনাপতি চার্লস মার্টেলকে পরাজিত করেন। এরপর শার্ল জার্মনী ও গাবসীনের সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। ইয়োডসের মধ্যবর্তী স্থানে আবদুর রহমানের সাথে মোকাবিলা হয়। আকস্মিকভাবে আবদুর রহমানের শহীদ হওয়ার কারণে ইসলামী বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অন্যথায় ইউরোপের বুকের ওপর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হতো। আবদুর রহমানের নাম শুনিয়ে ইউরোপের শিশুদেরকে ভয় দেখানো হতো।

১১৭ হিজরীতে হাবীব ইবনে আবী উবায়দার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং কোন রকম মোকাবিলা ছাড়াই সুদান এলাকা অধিকারে আসে। সিসিলী দ্বীপও এই সময় বিজিত হয়। এসব বিজয়ের ফলে মাগরিববাসীদের মনে সরকারের এতটা প্রভাব সৃষ্টি হয় যে, হিশামের নামে তারা শিউরে উঠতে থাকে।

www.amarboi.org

খুরাসানের গভর্নর মুসলিম ইবনে সাঈদ, আশরাস ইবনে জুনায়েদ, আসাদ এবং নাসর ইবনে সাইয়্যার কয়েকবার তুর্কী এলাকার ওপর আক্রমণ করেন। সর্বশেষে একটি সিদ্ধান্তকরী যুদ্ধ হয় এবং মুসলমানরা তাতে সফল হয়।

১১৯ হিজরীতে খাকান তুর্কীদের বাদশাহ নিহত হন। মুসলমানরা ফারগানা, খোকান্দ ও হিরাত অধিকার করে।

১২১ হিজরীতে জাযিরা এবং আর্মেনিয়ার গভর্নর মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ বিলাদুসসারের ওপর আক্রমণ করেন। জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই বছরে মাসলামা এশিয়া মাইনরে রোমানদের কয়েকটি দূর্গের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করেন। মাসলামার সাথে ছিলেন বিখ্যাত সমরনায়ক আবদুল্লাহ—যার নামে রোমানরা আতংকিত থাকতো। তিনি এশিয়া মাইনরের বহু এলাকা অধিকার করেন।

যায়েদ ইবনে যয়নুল আবেদীন ইবনে হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত

হিশাম তার পূর্বসূরী ইয়াযীদের চাইতে তুলনামূলকভাবে ভাল ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার ও দুর্নীতিমুক্ত। তা সত্ত্বেও তার অন্ধ বিদ্বেষ এতই প্রবল ছিল যে, তিনি ফাতেমা (রা)-এর বংশধরদের প্রশংসা সহ্য করতে পারতেন না। একবার হিশাম হজ্জ পালনের জন্য পবিত্র মক্কায় যান। সিরিয়ার আমীর-উমরাও তার সাথে ছিল। হযরত হুসাইন (রা)-এর পুত্র ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা)-ও হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। হিশাম হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য অগ্রসর হলে জনতার একজনও তাকে রাস্তা ছেড়ে দিল না। কিন্তু ইমাম যয়নুল আবেদীন যে সময় হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য অগ্রসর হলেন তখন আদব রক্ষার্থে লোকের ভিড় কমে গেল। হিশাম এবং সিরীয় আমীর-উমরা ও রাজ দরবারের কবি ফারাযদাক মসজিদের আঙিনায় বসে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলেন। একজন সিরীয় নেতা জিজ্ঞেস করলেন তিনি কে? হিশাম জেনেও না জানার ভান করে বললো ঃ আমি চিনি না। এ জবাব ফারাযদাকের ভাল লাগলো না। তিনি তৎক্ষণাৎ যয়নুল আবেদীন (রা)-এর প্রশস্তি গেয়ে একটি কাসীদা রচনা করে পড়লেন। এ কাসীদা কম বেশী আরবী সাহিত্যের সব গ্রন্থেই দেখা যায়। কাসীদাটি[১] আহলে বায়েতের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসার আবেগে পরিপূর্ণ। বনী উমাইয়াদের প্রতি তার মধ্যে

---

১. হামাসা গ্রন্থের মাদায়েহ অধ্যায়ে উক্ত কাসীদার কয়েকটি পংক্তি বর্ণিত হয়েছে যা শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته : والبيت يعرفه و الحل والحرم ·

ইনি সেই মহান ব্যক্তি "বাতহা উপত্যকা" (মক্কার কঙ্করময় ভূমি) যার প্রতিটি পদক্ষেপ জানে। তাছাড়া বায়তুল্লাহ হেল ও হারাম শরীফও তাকে জানে।

www.amarboi.org

কোন শ্লেষবাক্য বা কটূক্তি না থাকলেও হিশাম তা সহ্য করতে পারলো না। সে কবি ফারাযদাকের ভাতা বন্ধ করে তাকে জেলখানায় নিক্ষেপ করলো।

কারবালার বেদনাদায়ক ঘটনা ফাতেমার (রা) খান্দানকে রাজনৈতিক জীবন ও তৎপরতা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দিয়েছিল। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা) তাঁর গোটা জীবন ইবাদত ও সাধনায় অতিবাহিত করেন। নবীর (সা) আহলে বায়েত ঐ ঘটনায় এতটা নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিলেন যে, তারা হার্‌রার ঘটনায় একেবারেই নির্লিপ্ত থাকেন। অথচ এ ঘটনা প্রায় সম্পূর্ণটাই হযরত হুসাইনের (রা) শাহাদাতের সাথে সম্পর্কিত। লোকজন ইমাম যয়নুল আবেদীনের কাছে গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে শুধু সবর ও শোকরের উপদেশ দান করা হতো।

সৌভাগ্যবশত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (রা) বিপ্লবী শাসন যুগ আসে। মুসলমানরা ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে এবং খিলাফতে রাশেদার যুগ ফিরে আসে। কিন্তু মাত্র তিন বছর পর ঐ সোনালী যুগের অবসান ঘটে। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রা)-এর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ইয়াযীদ তাঁর সমস্ত সংস্কার কর্ম ধ্বংস করে দেয় এবং উমর ইবনে আবদুল আযীযের (রা) পূর্বে যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল তার পুনরাগমন ঘটে।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা)-এর সিন্ধি (বর্তমান পাকিস্তানী) স্ত্রীর গর্ভজাত এক সন্তান ছিলেন যায়েদ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও নেক চরিত্রের বুযর্গ। ইলম ও আমলে তিনি ছিলেন অনুপম ও অতুলনীয়। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ"আমি ইমাম যয়নুল আবেদীনকে দেখেছি। সেই যুগে তাঁর চেয়ে অধিক প্রত্যুৎপন্নমতি আর কাউকেই দেখিনি। সত্যি বলতে কি, তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি সেই যুগে ছিল না।" ইমাম শাবী (র) বলেন ঃ

"সেই যুগে আর কেউ-ই হয়তো যায়েদ ইবনে আলী (রা)-এর চেয়ে ভাল শিশু প্রসব করেনি। এমন দ্বিতীয় কোন ফকীহ, সাহসী, অল্পে তুষ্ট এবং আবেদ ও যাহেদ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তিনি শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে বৈষয়িক জ্ঞানবুদ্ধিও ভাল রাখেন।"

ইমাম জাফর সাদেক (র) বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! আমাদের মধ্যে আমার চাচাই সর্বাধিক কুরআন অধ্যয়নকারী, আল্লাহর দীনকে সর্বাধিক উপলব্ধিকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর আমাদের খান্দানে তিনি তাঁর মত আর কাউকে রেখে যেতে পারেননি।[১]

১. মাআরেফে ইবনে কুতাইবা।

www.amarboi.org

হযরত যায়েদ উম্মতের অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। তিনি কুরআন অধ্যয়নের জন্য তের বছর পর্যন্ত নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন। মুসলিম উম্মার দুরবস্থা ও অসহায়ত্ব দেখে তিনি আঘাত অনুভব করতে থাকেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) ইনতিকালের পর সাবেক পরিস্থিতির পুনরাগমনে শেষ আশাটুকুও মুছে যায়। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার এর যুগ পুনরায় তিরোহিত হয়। শহীদ হযরত যায়েদ (রা) বলেন ঃ

"আল্লাহর শপথ ! আমি এমন অবস্থায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করা অত্যন্ত অপসন্দ করি যদি আমি তাঁর উম্মতকে মারূফের আদেশ দিতে এবং মুনকার থেকে নিষেধ করতে না পারি।"

ঘটনাক্রমে হিশাম কোন ব্যাপারে জবাবদিহির জন্য হযরত যায়েদ (রা)-কে সিরিয়ায় ডেকে পাঠান এবং সন্তোষজনক জবাব লাভ সত্ত্বেও অত্যন্ত খারাপ আচরণ করেন। আরো কথাবার্তা বলার জন্য তাঁকে এখান থেকে ইরাকের আমীর ইউসুফ ইবনে উমরের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে বিনা কারণে কুফা যেতে হয়। হযরত হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পর থেকে এ পর্যন্ত ফাতেমা খান্দানের কেউ কুফায় যাননি।

ইমাম যায়েদ (রা) কুফায় পৌঁছলে লোকজন তাঁর চারপাশে সমবেত হয় এবং প্রায় চল্লিশ হাজার কুফাবাসী বনী উমাইয়ার জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে খিলাফতে রাশেদার পুনরুজ্জীবনের জন্য বাই'আত করে। মনসূর ইবনুল মু'তামির (র)-এর মত মুহাদ্দিসগণ ইমাম যায়েদের (রা) পক্ষে কাজ করতে থাকেন। ইমাম আবু হানীফা (র) ইমাম যায়েদ (রা)-কে সাহায্য-সহযোগিতা দানের ফতোয়া দান করেন। নিজেও বিপুল পরিমাণ আর্থিক খেদমত পেশ করেন। মোটকথা, সেখানে বনী উমাইয়াদের হাত থেকে মুক্তির আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। ইতিমধ্যে ইরাকের গভর্নর ইউসুফ ইবনে উমর এই আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য কুফার শাসককে কঠোর ভাষায় নির্দেশ দান করেন। সে ইবনে যিয়াদের ন্যায় নির্যাতন শুরু করে। ফল দাঁড়ায় এই যে, ইমাম যায়েদের (রা) অধিকাংশ সংগী-সাথী তাকে পরিত্যাগ করে। সর্বমোট দুইশ' আঠার ব্যক্তি তার সাথে থাকে। ইউসুফ ইবনে উমর নিজে সৈন্য নিয়ে কুফায় পৌঁছেন। ইমাম যায়েদ (র) এবং তাঁর ক্ষুদ্র দলটি জীবন বাজি রেখে মোকাবিলা করে। অবশেষে একটি তীর বিদ্ধ হয়ে ইমাম যায়েদ (রা) শহীদ হন। এটা ছিল ১২১ হিজরীর ঘটনা। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইউসুফ ইবনে উমর ইমাম যায়েদের (রা) মাথা কেটে হিশামের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং তাঁর দেহটাকে শূলিবিদ্ধ করে। কিন্তু তাতে হযরত ইমাম

www.amarboi.org

যায়েদের (রা) আন্দোলন অবদমিত হয় না। যায়েদের (রা) অনুসারীগণ কুফা থেকে ইয়ামানে চলে যায়। ইয়ামানই পরে তাদের ধর্মীয় কেন্দ্র হয় এবং এখন পর্যন্ত সেখানে যায়েদীরাই ক্ষমতাসীন আছে।

রাফেজীদের উদ্ভব

ইমাম যায়েদ (রা) শহীদের সাথে হযরত আলী (রা)-এর অনুসারী কুফাবাসীদের একটি দলও শরীক হয়েছিলো। কুফার গভর্নর তাঁদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে ঐ দলটি নিজেদের রক্ষা করার একটি বাহানা খুঁজে নেয়। যুদ্ধের সময় তারা যায়েদ শহীদ (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) সম্পর্কে তাঁর মত কি? জবাবে ইমাম যায়েদ (রা) বলেন ঃ আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ও মুরুব্বীদেরকে তাঁদের সম্পর্কে ভাল কথাই বলতে শুনেছি। আল্লাহ্ তাঁদেরকে তার রহমতের মধ্যে স্থান দিন। বড়জোর আমি এতটুকু বলতে পারি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বায়েত খিলাফত লাভের অধিক হকদার ছিলেন। কিন্তু ঐ সব শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণ নিজেদেরকে অগ্রাধিকার দান করেছেন। তা সত্ত্বেও এটা কুফর ও ইসলামের ব্যাপার নয়। হযরত আবু বরক (রা) ও উমর (রা) তাঁদের খিলাফতকালে ন্যায় ও ইনসাফের নীতিকে কাজে লাগিয়েছেন এবং কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছেন। কুফাবাসীরা বললো ঃ আমরা এখন বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো কেন? তারাও তো তাঁদের মতই। জবাবে ইমাম বললেন ঃ না, তাদের অবস্থা ভিন্ন রকম। এরা জুলুম করছে আর আমি কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি। একথা শুনে তারা একটা বাহানা খুঁজে পায় এবং সবাই তাকে পরিত্যাগ করে। এ কারণে ইমাম যায়েদ (র) তাদেরকে 'আর রাফেজা'[১] বলেন। তখন থেকেই তারা রাফেজী বলে আখ্যায়িত হয়।

আব্বাসীয় দাওয়াত

হযরত হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত মুয়াবিয়া খান্দানের শাসনের অবসানের কারণ হয়েছিলো। তাঁর পৌত্র হযরত যায়েদ (রা)-এর শাহাদাত অতিশীঘ্র মারওয়ানী খান্দানের শাসনের অবসান ঘটায়। হযরত যায়েদের (রা) শাহাদাতের পর আব্বাসীয় খান্দানের সমর্থকদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। খুরাসান এবং দেশের পূর্বাঞ্চলে তাদের কর্মতৎপরতা জোরদার হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তার দলের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বকর ইবনে হামান এবং অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সমর্থনও এ আন্দোলনকে অনেক শক্তিশালী করে তোলে। যদিও এই

১. যুদ্ধে নিজেদের নেতাকে পরিত্যাগকারী জামায়াতকে রাফেজী বলে।

www.amarboi.org

সময় উমাইয়া শাসকরা তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাতে শুরু করেছিলো। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোন কোন আব্বাসীয় সমর্থক কর্মীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই গোপন আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে না, বরং অতি শীঘ্র তারা আবু মুসলিমের মত সমর্থক ও কর্মী লাভ করতে সক্ষম হয়।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেক হিশামের পর তার পুত্র ওয়ালীদকে পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনয়ন দান করেছিলেন। কিন্তু হিশামের অভিপ্রায় ছিল ওয়ালীদকে বঞ্চিত করে তাঁর পুত্র মাসলামাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করা। কিন্তু তিনি তাতে সফল হতে পারেননি। কারণ, এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার আগেই তার মৃত্যু ঘটে। তবে হিশাম এবং ওয়ালীদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যার পরিণাম ভোগ করতে হয় হিশামের মৃতদেহ ও তার সন্তানদেরকে।

হিশামের মৃত্যু

১২৫ হিজরীর ৬ই রবিউস সানীতে রাসাফা নামক স্থানে হিশাম ইবনে আবদুল মালেক মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৫৫ বছর। শাসনকাল ছিল বিশ বছরের কিছু কম।

হিশামের চরিত্র

যে তিনজন বিশিষ্ট উমাইয়া বাদশাহ তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ছাপ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন হিশাম ইবনে আবদুল মালেক তাদের অন্যতম। তাঁদের মধ্যে আমীর মুয়াবিয়া ছিলেন প্রথম বাদশাহ যিনি উমাইয়া শাসনের গোড়া পত্তন করেছিলেন। আবদুল মালেক ছিলেন দ্বিতীয় বাদশাহ যিনি পতনোম্মুখ বনী উমাইয়া শাসনের প্রাচীরকে পুনরায় দাঁড় করিয়েছিলেন। হিশাম ছিলেন তৃতীয় বাদশাহ যিনি এই প্রাসাদের পূর্ণতা সাধন করেছিলেন।

হিশাম ছিলেন দূরদর্শী, মিতব্যয়ী, বুদ্ধিমান ও কৃশলী বাদশাহ। রাষ্ট্রের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও তার জ্ঞাতব্যের বাইরে থাকতো না। অফিসিয়াল কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আমি সব উমাইয়া শাসকের অফিসের খোঁজ-খবর নিয়েছি। তাদের মধ্যে হিশামের অফিস ব্যবস্থাপনা রাজা ও প্রজাদের জন্য সর্বাধিক উত্তম ছিল।

www.amarboi.org

হিশাম পুলিশ বিভাগকে খুব উন্নত করেছিলেন। তিনি তাঁর গভর্ণরদের খুব ভালভাবে তত্ত্বাবধান করতেন। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর নীতি ছিল অত্যন্ত কঠোর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অর্থলোভী। অপব্যয়ের চরম বিরোধী ছিলেন তিনি। বরং বলা যায় যে, বৈধ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তিনি কার্পণ্য করতেন। ফলে সাধারণত তাঁকে কৃপণ মনে করা হতো।

হিশামের জীবন যাপন ছিল সাদামাটা। নৈতিক চরিত্র এবং অভ্যাসের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সহজ-সরল মেজাজের অধিকারী। তিনি ছিলেন বিলাসী ও বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি কঠোর এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের অনুসারী। তাঁর শাসনকালেই সর্বপ্রথম খালকে কুরআন সম্পর্কিত সমস্যাটির সৃষ্টি হয়। অত্যন্ত কঠোরভাবে তিনি তা প্রতিরোধ করেন। যাজ্দ ইবনে দারহাম এই আকীদা প্রকাশ করলে তিনি তাকে হত্যা করান।

এক কথায় বনী উমাইয়া শাসকদের মধ্যে হিশাম ছিলেন খুবই সফল বাদশাহ। হযরত যায়েদ্ শহীদের (রা) রক্তের দায়দায়িত্ব তার ঘাড়ে না পড়লে এবং আহলে বায়েতের প্রতি তার বিদ্বেষ না থাকলে কতই না উত্তম হতো।

হিশামের এই সাফল্য ছিল উমাইয়া শাসনের ভোর রাতের নিবু নিবু প্রদীপের শেষ দীপ্তি যার জ্বালানী তেল ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিলো।

www.amarboi.org

৮. ওয়ালীদ (দ্বিতীয়) ইবনে ইয়াযীদ

১২৫ হিজরী থেকে ১২৬ হিজরী

পিতার অসীয়ত অনুসারে ওয়ালীদ ইবনে হিশামের পরে ১২০ হিজরীর রবিউস সানী মাসে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ওয়ালীদ ছিলেন একজন বিলাস প্রিয় ও লম্পট যুবক। গান গাওয়ার এবং শরাব পান করারও অভ্যাস ছিল তার।

সিংহাসনে আরোহণ করার পরই ওয়ালীদ হিশামের পরিবার-পরিজনের প্রতি নির্যাতন শুরু করেন। এমনকি উমাইয়া বংশের বা অন্যান্য যেসব আমীর-উমরা ওয়ালীদের বিরোধিতা করে হিশামকে সমর্থন করেছিলো তারাও অভিযুক্ত হন। তিনি তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন ও লাঞ্ছিত করতে শুরু করেন। হিশামের দুই মামা মুহাম্মাদ ও ইবরাহীমকে হত্যা করান, সুলায়মান ইবনে হিশামকে দেশান্তরিত করে ইয়াযীদ ইবনে হিশামকে বন্দী করেন এবং হিশামের সমর্থক ইরাকের প্রাক্তন গভর্নর খালেদ ইবনে কায়সারী ইয়ামানীকে হত্যা করান।

ইয়াহইয়া ইবনে যায়েদের শাহাদাত

১২৫ হিজরীতে ক্ষমতার বাগডোর হাতে নেয়া মাত্রই ওয়ালীদ হযরত যায়েদ শহীদের (রা) লাশ পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে ইমাম শহীদ নিম্নোক্তভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ

"আল্লাহর শপথ ! আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাতকে যখন আমি স্ব স্ব মর্যাদায় স্থাপন করতে পেরেছি তখন পৃথিবীতে আমার জন্য আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হলেও কোন পরোয়া নেই।

এ ঘটনায় ইমামের (রা) পুত্র ইমাম ইয়াহইয়া (রা) অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং খুরাসানে চলে যান। সেখানে বহু লোক তার বাই'আত হয়। ওয়ালীদ বিষয়টি জানতে পেরে খুরাসানের শাসক নাসর ইবনে সাইয়ারকে ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। নাসর তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। কিন্তু অকস্মাত একটি তীর এসে তাঁর কপালে বিদ্ধ হয় এবং তিনি শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর লাশও প্রকাশ্যে লটকিয়ে দেয়া হয়।

www.amarboi.org

ওয়ালীদের অবরুদ্ধ ও নিহত হওয়া

ওয়ালীদের জুলুম-নির্যাতনের ফলে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। রাজ পরিবারের সদস্যরাও তার বিরোধী হয়ে ওঠে। ওয়ালীদ উপহার-উপঢৌকনের সয়লাব দিয়ে বিরোধিতার এই আগুন নির্বাপিত করতে চাইলেন । তিনি সবার ভাতা দশগুণ বৃদ্ধি করলেন। অক্ষম ও পঙ্গুদের জন্য সাহায্য দাতা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। কিন্তু তাতে বিরোধিতা বন্ধ হলো না।

নিজ খান্দানের মধ্য থেকে ওয়ালীদের বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন প্রথম ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদ। ইয়ামানের অধিবাসীরা ছিল তাঁর সমর্থক। ইয়াযীদ গোপনে নিজের জন্য বাইয়াত নিতে শুরু করেন। তাঁর শক্তি যথেষ্ট মজবুত হলে তিনি দামেশকে পৌছে রাজধানী অধিকার করেন। ওয়ালীদ সে সময় আম্মানের উপকণ্ঠে অবস্থান করছিলেন। ইয়াযীদ আবদুল আযীয ইবনে হাজ্জাজ ইবনে আবদুল মালেককে তার মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। ওয়ালীদের কাছে তেমন কোন শক্তি ছিল না। ফলে তিনি নিহত হন। আবদুল আযীয ওয়ালীদের মাথা কেটে দামেশকে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ইয়াযীদ ওয়ালীদের মাথা বর্শাগ্রে বিদ্ধ করে গোটা দামেশকে প্রদক্ষিণ করায়। এ ছিল ১২৬ সনের ঘটনা। সেই সময় ওয়ালীদের বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তিনি এক বছর দুই মাস বাইশ দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

www.amarboi.org

৯. ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদ

১২৬ হিজরী থেকে ১২৭ হিজরী

দ্বিতীয় ওয়ালীদের হত্যার পর প্রথম ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দীনদারীর দিক দিয়ে ইয়াযীদ ওয়ালীদের চেয়ে অনেক গুণে ভাল ছিলেন। ওয়ালীদ ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু ইয়াযীদ তা হ্রাস করে হিশামের সময়ে যে পরিমাণ ছিল সেই পরিমাণ করে দেন। এভাবে ভাতার পরিমাণ হ্রাস করার কারণে সবাই তাকে ইয়াযীদে নাকেস অর্থাৎ ভাতা হ্রাসকারী ইয়াযীদ বলে আখ্যায়িত করতে থাকে।

বিদ্রোহ

হিশামের পর আপনা থেকেই বনী উমাইয়াদের ক্ষমতা দুর্বল হতে থাকে। কিন্তু ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদের শাসন যুগে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ অবশিষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিকেও নড়বড়ে করে দেয়।

ওয়ালীদ সুলায়মান ইবনে হিশামকে বন্দী করেছিলেন। কিন্তু ওয়ালীদ নিহত হলে সুলায়মান বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু ইয়াযীদ তাকে নিজের শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার ব্যাপার সম্মত করতে সক্ষম হয়। এভাবে সুলায়মান তার বাই'আত করে।

ওয়ালীদ নিহত হওয়া মাত্র হিমসবাসীরা বিদ্রোহ করে বসে এবং সম্মিলিত হয়ে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দামেশক অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু ইয়াযীদ তাদেরকেও নিজের অনুগত করে নিতে সক্ষম হন।

ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু ইয়াযীদের সেনাবাহিনী তাদেরকে অনুগত করে নেয়। মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান হাররানে অবস্থানরত ছিলেন। ওয়ালীদের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে তিনি ওয়ালীদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের বাহানা খাড়া করে ইয়াযীদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু আর্মেনিয়া, মুসেল এবং আজারবাইজানের গভর্নরী দিয়ে ইয়াযীদ তাকেও পক্ষে আনতে সমর্থ হন।

ইরাকেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। খুরাসানের গভর্নর নাসর ইবনে সাইয়ারকে পদচ্যুত করা হয়। কিন্তু তিনি তাঁর পদচ্যুতি মেনে নিতে অস্বীকৃতি

www.amarboi.org

জানিয়ে নতুন গভর্নর মনসূর ইবনে জামহানের কাছে খুরাসানের গভর্নরী ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন। সেখানে নাযারিয়া ও ইয়ামানিয়া গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ইয়ামামার অধিবাসী ও সেখানকার গভর্নরের মধ্যে সাংঘাতিক মতানৈক্য দেখা দেয়। এসব বিদ্রোহ আব্বাসীয় খিলাফতের প্রচারকদের জন্য খুরাসানে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে যা উমাইয়া শাসনের ভিত দুর্বল করে ফেলে এবং আব্বাসীয়দের সৌভাগ্য তারকাকে দীপ্তিমান করে তোলে।

আব্বাসীয় খিলাফতের আন্দোলন

এই বছরেই আব্বাসীয় আন্দোলনের নেতা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রা) ইনতিকাল করেন। ফলে তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রা) এই আন্দোলনের নেতৃত্ব লাভ করেন। ইবরাহীম আবু হাশেম ও বকর ইবনে মাহানকে উপদেশ ও দিকনির্দেশনার জন্য খুরাসানে প্রেরণ করেন। মার্ভে পৌছে তিনি নকীব ও আন্দোলন কর্মীদের একত্র করেন এবং মুহাম্মাদ ইবনে আলীর (রা) পর তার পুত্র ইবরাহীমের বাই'আত গ্রহণ করেন এবং তার ইমামতের ফরমান পড়ে শোনান।

ওফাত

১২৬ হিজরীতে ইয়াযীদ মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছেচল্লিশ বছর। তিনি ছয় মাস বার দিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

www.amarboi.org

১০. ইবরাহীম ইবনে ওয়ালীদ

১২৬ হিজরী থেকে ১২৭ হিজরী
৭৪৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮৪৪ খৃষ্টাব্দ

ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তার অসীয়ত অনুসারে ইবরাহীম ইবনে ওয়ালীদ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তার ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে রাজ পরিবারের সবাই একমত ছিল না। এ কারণে কখনো তাকে বলা হতো বাদশা, কখনো সাধারণ আমীর আবার কখনো এ দুটি মর্যাদা থেকেই তিনি বঞ্চিত থাকতেন।

ইবরাহীমের অপসারণ

মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবরাহীমকে শাসক হিসেবে মেনে নেননি। বরং তার বিরুদ্ধে দারুল ইমারা থেকে আশি হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেন। দামেশকের সন্নিকটে পৌছলে তার মোকাবিলার জন্য ইবরাহীম সুলায়মান ইবনে হিশামকে এক লাখ পঁচিশ হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। যুদ্ধে ইবরাহীমের সৈন্যরা পরাজিত হয়। এটা ১২৭ হিজরীর সফর মাসের ঘটনা।

দামেশকে পৌছে মারওয়ান নিজের জন্য বাই'আত গ্রহণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইবরাহীম সেখান থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু মারওয়ান তাঁকে নিরাপত্তা দান করে ফিরিয়ে আনেন। দামেশকে পৌছে ইবরাহীমও মারওয়ানের হাতে বাই'আত করেন।

মৃত্যু

শাসন ক্ষমতার দাবি পরিত্যাগ করার পর ইবরাহীম ৬ বছর জীবিত ছিলেন। ১৩৩ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.amarboi.org

১১. সিরিয়ার বনী উমাইয়ার সালতানাতের সর্বশেষ শাসক মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান

১২৭ হিজরী থেকে ১৩২ হিজরী

ইবরাহীম ইবনে ওয়ালীদের পরাজয়ের পর ১২৭ হিজরীতে মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। যেহেতু চরম বিপদের সময়ও দৃঢ়পদ থেকেছেন তাই তিনি জাদী এবং হিমার উপাধিতে আখ্যায়িত হন।

মারওয়ান অত্যন্ত সুদক্ষ প্রশাসক, দূরদর্শী, সঠিক সিদ্ধান্তদাতা এবং সাহসী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে সময় সিংহাসনে বসেন তখন বনী উমাইয়াদের সৌভাগ্য সূর্য ঢলে পড়েছিলো। একদিকে গোটা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিলো এবং অপর দিকে আব্বাসীয় আন্দোলনের কর্মীরা সর্বত্র তৎপর ছিল। মোটকথা বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তা সত্ত্বেও মারওয়ান দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হননি।

বিদ্রোহ

মারওয়ানের বাই'আত পূর্ণ হতে না হতেই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে লাগলো এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করে হিমসের অধিবাসীরা। এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে মারওয়ান নিজেই সেখানে যান এবং সেখানে পৌছে শহর অবরোধ করেন এবং শহর রক্ষা প্রাচীর ধ্বংস করে শহর দখল করে নেন। বিদ্রোহীদের একটি দলকে শূলিবিদ্ধ করে হত্যা করেন। এরপর সেখানকার অধিবাসীরা বাই'আত গ্রহণ করে। তিনি হিমসে থাকতেই খবর পান যে, গুতার অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে ইয়াযীদ ইবনে খালেদকে তাদের গভর্ণর বানিয়ে নিয়েছে এবং সে দামেশকের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তা অবরোধ করেছে। সুতরাং মারওয়ান দামেশকে সৈন্য প্রেরণ করে। গুতার অধিবাসীরা আনুগত্য গ্রহণ করে। এরপর ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে বসলে তাদেরকে দমন করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। উক্ত বাহিনী বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম হয়। অতপর সুলায়মান ইবনে হিশাম সত্তর হাজার সিরীয় সৈন্যের সহযোগিতায় মারওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মারওয়ান নিজেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন। তুমুল যুদ্ধ হয়। মারওয়ান সুলায়মানকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে বিশ হাজার সৈন্য

www.amarboi.org

নিহত হয়। সুলায়মান পরাজিত সৈন্যদের নিয়ে হিমসে পৌছেন এবং হিমসের শহর রক্ষা প্রাচীর সংস্কার করে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকেন। এ খবর জানতে পেরে মারওয়ান হিমসে পৌছে শহর অবরোধ করেন। প্রচন্ড পাথর বর্ষণের পর শহরবাসীরা আনুগত্য প্রকাশ করে এবং নিজেরাই সুলায়মানকে মারওয়ানের হাতে সোপর্দ করে।

ইরাকে দাহহাক ইবনে কায়েস শায়বানির নেতৃত্বে খারেজীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে কুফার গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আবদুল আযীয তাদের মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে পড়েন। খারেজীরা কুফা ও মুসেল অধিকার করে নেয়। ফলে মাওয়ান নিজেই দাহহাকের মোকাবিলায় এসে পৌছেন। তিনি শাবীব সহ অন্যান্য খারেজী নেতাদের হত্যা করে তার দলকে ছিন্নভিন্ন করে দেন। এরপর মুহাযিবী খারেজীরা বিদ্রোহ করলে তাদেরও মূলোৎপাটন করা হয়।

কুফায় আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবী তালিব হাশেমী মারওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে বহু লোক তাঁর পক্ষে যোগদান করে। কুফার গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয। তিনি কৌশলে তাদের শক্তিকে পরস্পর বিছিন্ন করে দেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়াকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া খুরাসান চলে যায়। সেখানে আব্বাসী দায়ী আবু মুসলিম খুরাসানির লোকেরা তাকে হত্যা করে।

আবু মুসলিম খুরাসানী ও আব্বাসীয় আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ

মারওয়ানের শাসনকালে খুরাসানের অবস্থা ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। সেখানে মুদেরী ও ইয়ামানী গোত্র পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত ছিল। খুরাসানের গভর্নর নাসর ইবনে সাইয়ার ছিলেন মুদেরী গোত্রের নেতা এবং জাদী, ইবনে শাবীব কিরমানী ছিলেন ইয়ামানী গোত্রের নেতা। ঠিক এই পরিস্থিতিতে অনারব পারসিক বংশোদ্ভূত যুবক আবু মুসলিম খুরাসানী খুরাসানের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

আবু মুসলিম খুরাসানী ছিলেন কুফার আব্বাসীয় প্রতিনিধি বুকাইর ইবনে মাহানের ক্রীতদাস। তাঁর যোগ্যতা দর্শনে বুকাইর তাকে আব্বাসীয় আন্দোলনের নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেন। তারপর হামীমায় অবস্থানরত তাঁর ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদের খেদমতে তাকে পেশ করেন। ইবরাহীম

www.amarboi.org

১২৮ হিজরীতে আবু মুসলিমকে খুরাসানের আমীরে জামায়াত বানিয়ে প্রেরণ করেন।

আবু মুসলিম সেখানে পৌছে তাঁর প্রভাবের গন্ডি বিস্তৃত করার জন্য এক বছর ব্যয় করেন। এ আন্দোলন যখন বিস্তৃত হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে তখন ১২৫ হিরজীর ২৫শে শাবান বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে সাফিদানজ জনপদে তিনি স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেন। আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত লোকজন কাল পোশাক পরিধান করে সমবেত হন। সারারাত আগুন জালিয়ে রাখা হয়। আবু মুসলিম أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ لَقَدِيرٌ ۝ ("যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তারা মজলুম এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন।") আয়াত পাঠ করে যিল (ظل) ও সাহাব (صحاب) নামক দু'টি আব্বাসীয় পতাকা উড্ডীন করেন। বিভিন্ন গোত্র এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। উক্ত জনপদকেই আব্বাসীয় সরকারের অস্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এরপর আবু মুসলিম সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং অগ্রসর হয়ে মার্ভ অধিকার করে নেন। তারপর অতি দ্রুত সমগ্র খুরাসান দখল করে নেন। বিজিত এলাকাসমূহে শৃঙ্খলা বিধানের পর কাহতাবা ইবনে শাবীব তাঈকে ইরাকে আজম অধিকার করার জন্য নির্দেশ দান করেন। ঐ সময়ই আব্বাসীয় ইমাম ইবরাহীম বন্দী এবং নিহত হন। তিনি তার ভাই আবুল আব্বাস সাফফাহকে তার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেন। ইরাকে আজম অধিকার করার পর কাহতাবা ইরাকে আরবের দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার গভর্নর ইবনে হুবায়রা তাঁর মোকাবিলা করে পরাজিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে কাহতাবা নিজেও নিরুদ্দেশ হন। তার স্থলে তার পুত্র হাসান প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন।

এবার কুফার ওপর আব্বাসীয় পতাকা উড়তে থাকে। ১৩২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে কুফার জামে মসজিদে আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে আলী সাফফার বাই'আত অনুষ্ঠিত হয় এবং আব্বাসীয় খিলাফতের সিংহাসনে প্রথম অধিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি খুতবা দান করেন।

সর্বশেষ যুদ্ধ এবং উমাইয়া শাসনের অবসান

এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে মারওয়ান এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল রাহিনী নিয়ে নিজেই মোকাবিলার জন্য বহির্গত হন এবং যাব নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন। অপর দিকে আবুল আব্বাস তাঁর চাচা আবদুল্লাহ ইবনে আলীকে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বাহিনী দিয়ে মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। ১৩২ হিজরীর ২রা জমাদিউস সানীতে দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। মারওয়ান চরমভাবে পরাস্ত হন। উমাইয়াগণ আব্বাসীয়দের হাতে ব্যাপকভাবে নিহত হন।

www.amarboi.org

এ যুদ্ধের ফলাফল উমাইয়া শাসনের প্রতিকূলে চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়ে দেয়। মারওয়ান পালিয়ে মুসেল চলে যান এবং সেখান থেকে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন। প্রত্যেক জায়গাতেই আব্বাসীয় সৈন্য তার পিছু ধাওয়া করে পৌঁছে যাচ্ছিলো এবং তাকে সামলে ওঠার অবকাশ দিচ্ছিল না। অবশেষে মিসরের বুসাইর গ্রামের এক গীর্জায় তিনি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং আব্বাসীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে নিহত হন। এটা ছিল ১৩২ হিজরীর ২৮শে যুলহাজ্জার ঘটনা।

মৃত্যুর সময় মারওয়ানের বয়স ছিল বাষট্টি বছর। তিনি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে পাঁচ বছর দশ মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তার নিহত হওয়ার সাথে সাথে সিরিয়ার উমাইয়া শাসনের নিভু নিভু প্রদীপ চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হয়ে যায়।

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ - اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

বলো, হে আল্লাহ 'বাদশাহীর অধিপতি' যাকে ইচ্ছা তুমি শাসন ক্ষমতা দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো। সকল কল্যাণ তোমরাই হাতে। তুমি সবকিছু করতে সক্ষম।

বনী উমাইয়া শাসনের বৈশিষ্টসমূহ

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের সাথে যদি বনী উমাইয়া শাসকদের তুলনা করা হয় তাহলে খুলাফায়ে রাশেদীনের মোকাবিলায় তাদের কোন মর্যাদাই থাকে না। কিন্তু এভাবে তুলনা করা ঠিক নয়। এই পবিত্র যুগের সাথে উমাইয়া যুগের কোন তুলনাই চলে না। বনী উমাইয়ার বাদশাহরা খুলাফায়ে রাশেদীনের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন না।[১] তাদের মধ্যে খিলাফতে রাশেদার স্পিরিট ছিল না এবং তাদের শাসন ব্যবস্থা ইসলামী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও ছিল না। বরং তাদের শাসন ছিল ব্যক্তি ও পারিবারিক শাসন। তবে পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের কাতারে দাঁড় করালে বনী উমাইয়া বাদশাহগণ লক্ষণীয় বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন।

১. খিলাফতে রাশেদার সময়ে মুসলিম উম্মাহ তার ইচ্ছামত খলীফা নিয়োগ করতো। বনী উমাইয়া শাসনাধীনে ভাবী উত্তরাধিকারী নিয়োগ নীতির মাধ্যমে জবরদস্তিমূলক নিয়োগ চলতে থাকে।

www.amarboi.org

উমাইয়া শাসনামল ছিল আরবদের সমস্ত বৈশিষ্টের ধারক। তাদের মধ্যে আরব গোত্রপ্রীতি পুরোদমে বিদ্যমান ছিল। বনী উমাইয়া বাদশাহদের বড় বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তারা নিজেদের সংস্কৃতি হিসেবে নির্ভেজাল আরবী সংস্কৃতিকেই অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। ইরানী, গ্রীক, তুর্কী, তাতারী, ভারতীয় এবং চীনা এক কথায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকজন মুসলমান হয়ে আরবদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে শুরু করেছিলো। আরব সংস্কৃতিই নওমুসলিম জাতিসমূহকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তাদের সংস্কৃতি দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয়নি। এ কারণেই বিজয় অর্জনের সাথে সাথে ইসলামী জীবন যাপন পদ্ধতিও বিশ্বজনীনতা লাভ করতে থাকে এবং মুসলমানরা যেখানেই বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছে সেখানেই মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সেখানকার সকল মানুষ ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। কুরআনের ভাষা আরবী প্রসার লাভ করেছে। অধীনস্থ সব দেশে কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খিলাফতে রাশেদার সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানের পূর্ণতার প্রতিফলন ছিল যোগ্যতা ও খিলাফতের মাপকাঠি। কিন্তু বনী উমাইয়া শাসন যুগে শাসকের সন্তান অথবা নিকটাত্মীয় হওয়াই যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারিত হয়।

খিলাফতে রাশেদার সময়ে শাসন ক্ষমতা কোন খান্দানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। বনী উমাইয়া শাসকগণ নিজেদের খান্দানের সাথে তা নির্দিষ্ট করে নেয়।

খিলাফতে রাশেদার সময়ে জাহেলী গোত্রপ্রীতির মৃত্যু হয়েছিলো। বনী উমাইয়া শাসনযুগে তাকে পুনর্জীবন দান করা হয়।

খিলাফতের রাশেদার সময়ে শাসন কর্তৃত্ব ছিল আল্লাহ প্রদত্ত এবং গণতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উমাইয়া শাসন যুগে তা পার্থিব ও ব্যক্তি শাসনে রূপান্তরিত হয়।

খিলাফতে রাশেদার রাজনীতি ছিল কিতাব ও সুন্নাতের ব্যাখ্যা বা বাস্তব প্রতিফলন। কিন্তু উমাইয়া যুগে তা বিজয়ী শক্তি ও দমনমূলক শাসনে রূপান্তরিত হয়।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বায়তুলমাল ছিল মুসলমানদের সবার মালিকানা। কিন্তু বনী উমাইয়া শাসনযুগে তা শাহী মালিকানায় রূপ নেয়।

খুলাফায়ে রাশেদীন উম্মাহর সাধারণ সদস্যদের ন্যায় জীবন যাপন করতেন। কিন্তু উমাইয়া শাসকগণ শাহী শান-শওকত ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন গ্রহণ করেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রত্যেক ব্যক্তি খলীফার সাথে সাক্ষাত করে নিজের অবস্থা ও অভিযোগ পেশ করতে পারতো। কিন্তু উমাইয়া শাসননামলে এ ধরনের সাক্ষাতের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং দ্বাররক্ষী ও দেহরক্ষী নিয়োগ করা হয়।

খুলাফায়ে রাশেদীন রাজ দরবারের দরবারি আড়ম্বর থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু উমাইয়া শাসননামলে সব ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ দরবারি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

www.amarboi.org

উমাইয়া বাদশাহদের শাসন ছিল ব্যক্তি ও পারিবারিক শাসন। তাদের শাসনের ভিত্তি রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি ছিল না। বরং তার ভিত্তি ছিল, শক্তি, সাহস ও আরবী শৌর্য বীর্য। যদিও দু' একজন ছাড়া সব উমাইয়া শাসকই ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করেছেন। নিজের শাসনের প্রতাপ ও প্রভাব কায়েম করার জন্য রক্তপাত ও খুন-খারাবির আশ্রয় নিয়েছেন। ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছেন, যা ছিল ইসলামী আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু সেই যুগে ইসলামী বিজয়ের যে পরিমাণ বিস্তার ঘটেছে ইসলামের ইতিহাসে তার কোন নজীর দেখা যায় না। জলে ও স্থলে অন্য জাতির মধ্য থেকে কেউ-ই তাদের সমকক্ষ ছিল না। তারা সবাই যদি সঠিক পথে থাকতেন। নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ না হতো তাহলে তাদের জন্য গোটা পৃথিবীর ওপর ছেয়ে যাওয়া বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

বিজয়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রের শৃঙ্খলাবিধান[১], প্রতিরক্ষা, জনকল্যাণ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রচার এবং প্রসারের দিকেও উমাইয়া শাসকদের বিশেষ লক্ষ ছিল। তাদের মধ্যে উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) মত খলীফা রাশেদও জন্মগ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ বনী উমাইয়া বাদশাহ শরীয়ার রীতিনীতি যেমনঃ ইমামত প্রভৃতির অনুসারী ছিলেন।

বনী উমাইয়া শাসনের অবসান

বনী উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল পারিবারিক শত্রুতা। ফলে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল বিরাট শক্তির। সুতরাং এই বিদ্বেষ ও শক্তির সাহায্যে তারা রাষ্ট্র কায়েম করেছিলো। এরপর তা টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তি ও গোষ্ঠীপ্রীতির প্রয়োজন ছিল। বনী উমাইয়া বাদশাহদেরকে অধিকাংশ সময়ই অন্যসব বিরোধী মুসলিম শক্তির সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে

---

১. উমাইয়া শাসনামলে ইসলামী সালতানাতের কর্মক্ষেত্র ছিল ব্যাপক। এ জন্য পাঁচটি বড় বড় প্রদেশ গঠন করা হয়েছিলো। (১) হিজাজ (ইয়ামান ও মধ্য আরব), (২) মিসর এবং মিসরের সমস্ত উচ্চ ও নিম্নভূমি অঞ্চল, (৩) ইরাকে আরব (বাবেল অঞ্চল, প্রাচীন আসিরিয়া) ও ইরাকে আজম, (ফারেস অঞ্চল) আম্মান, বাহরাইন, কিরমান, সিজিস্তান, কাবুল, খুরাসান, বাদ, মাওয়ারাউন নাহার, সিন্ধু ও পাঞ্জাব এলাকা (একটি বড় প্রদেশ ঘোষণা করে ইরাকের গভর্ণরের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। এর সদর মোকাম ছিল কূফা) (৪) বিলাদুল জাযিরা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং এশিয়া মাইনর। (৫) উত্তর আফ্রিকা এবং তার সীমা পশ্চিম মিসর, স্পেন, সিসিলি দ্বীপ, সার্ডিনিয়া বালিয়া, রোমান দ্বীপপুঞ্জ। এই প্রদেশের সদর মোকাম ছিল কায়রোয়ান। বনী উমাইয়া শাসনামলে সরকার ব্যবস্থা চারটি বড় বিভাগে বিভক্ত ছিল। দিওয়ানুল খারাজ (ভূমি রাজস্ব বিভাগ)। দিওয়ানে রিসল ও রাসায়েল, খাদ্য শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং দিওয়ানে খাতেম। বনী উমাইয়া শাসনামলের আর্থিক সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

www.amarboi.org

হয়েছে। যতদিন পারিবারিক সংহতি ও শক্তি বর্তমান ছিল ততদিন তারা অবলীলাক্রমে তাদের বিরোধী শক্তিসমূহকে নির্মূল করেছে। অবশেষে যখন সিংহাসন নিয়ে শাহী খান্দানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন পারিবারিক সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পারিবারিক সংঘাতের কারণে শক্তি দুর্বল ও নিঃশেষ হতে থাকে। এই সময় বিরোধী শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠার সুযোগ পায়।

উমাইয়াদের মধ্যে এ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তাদের প্রতিদ্বন্দী হাশেমী-আব্বাসীয়রা তা কাজে লাগায়। অনারবদের সহযোগিতা গ্রহণ করে তারা সিংহাসন অধিকার করে বসে। দীর্ঘ ৯১ বছরের শাসনের পর উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটে। অবশিষ্ট থাকে কেবল মহান আল্লাহর পবিত্র নাম।

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○ (اعراف)

সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করে দেন। পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই ভাল। (আ'রাফ)

সমাপ্ত

www.amarboi.org

প্রধান কার্যালয়	বিক্রয় কেন্দ্রঃ
আধুনিক প্রকাশনী ২৫, শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	□ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী বায়তুল মোকাররম, ঢাকা □ ৫৫, খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা □ ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন দেওয়ান বাজার চট্টগ্রাম